সুলতান মাহমুদ গজনবীর ঐতিহাসিক সিরিজ উপন্যাস

ভারত অভিযান
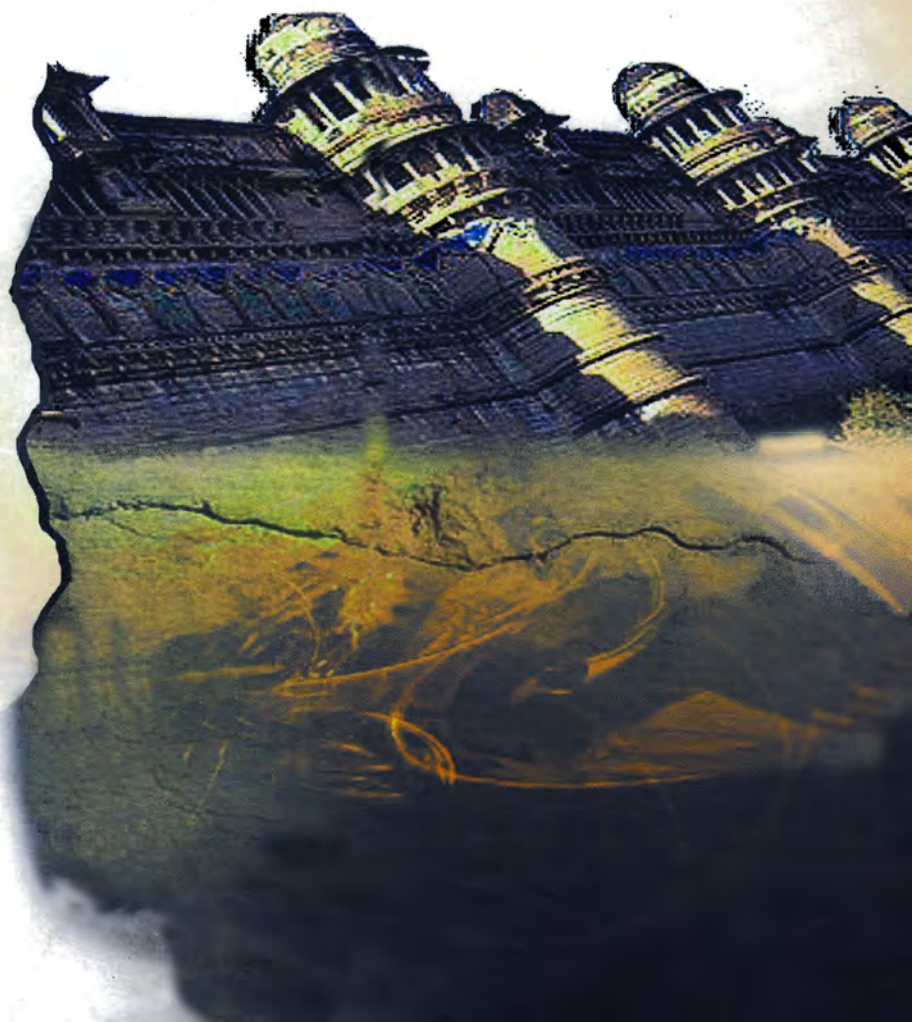
ভারত অভিযান - ২

ভারত অভিযান

(দ্বিতীয় খণ্ড)

এনায়েতুল্লাহ

অনুবাদ
শহীদুল ইসলাম

এদারায়ে কোরআন
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা -১১০০

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর — ২০০৭

প্রকাশক ▮ আরিফ বিল্লাহ্‌, এদারায়ে কুরআন, ৫০, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০, স্বত্ব ▮ সংরক্ষিত, প্রচ্ছদ ▮ নাজমুল হায়দার
কম্পিউটার কম্পোজ ▮ এম. হক কম্পিউটার্স, মুদ্রণ ▮ আল-আরাফা প্রিন্টার্স
মোবাইল ঃ ০১৭১৫-৭৩০৬১৬

মূল্য ঃ একশত ষাট টাকা মাত্র

BHAROT OVIJAN-1 : Writer Enayatullah, Translated by Shahidul Islam, Published by Edara-e- Quran, 50 Banglabazar, Dhaka-1100, Printed by Al-Arafa Printers Date of Publication September 2007.

PRICE TAKA ONE HUNDRED SIXTY ONLY

ISBN 984-70109-0000-3 SET

উৎসর্গ

গর্বিনী মা রেখে যাবে বীরপ্রসবিনী, এই তো সকল মায়ের চিরন্তন চাওয়া। কিন্তু মাত্র সাত মাস বয়সেই 'ঈশাত নাশরা' মা বাবার কোল খালি করে চলে গেলো। রেখে গেলো রাজ্যের শূন্যতা।

অসীম দয়াময় আল্লাহ্র কৃপাধন্য ছোট মনিদের ছোটাছুটিতে ভরে ওঠুক মায়ের বিরহী কোল।

হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নগুলোর ছোটাছুটি আর জীবন্ত কোলাহলে উদ্ভাসিতহোক মায়ের উজাড় আঙিনা—এই আমাদের প্রত্যাশা।

—অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ্। বর্তমানে এদেশে উর্দুভাষী ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ্'র পরিচয় দেয়ার নিষ্প্রয়োজন, তদ্রূপ বিশিষ্ট লেখক গবেষক ও অনুবাদক শহীদুল ইসলাম-এরও বিশেষ পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন নেই।

ইসলামী উপন্যাসের রুচিবান পাঠক মাত্রই তাঁর অনুবাদ ও লেখার সাথে পরিচিত। কালজয়ী ঔপন্যাসিক এনায়েতুল্লাহ্-এর অন্যতম কীর্তি সুলতান মাহমূদ গজনবীর ভারত অভিযান সিরিজ এর এটি দ্বিতীয় খণ্ড। পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

নানাবিধ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও আমরা এটিকে সার্বিক সুন্দর করার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। পাঠক পাঠিকা মহলে এ সিরিজ আদৃত হলেই আমাদের প্রয়াস স্বার্থক হবে বলে আমি মনে করছি।

—প্রকাশক

লেখকের কথা

"মাহমূদ গজনবীর ভারত অভিযান" সিরিজের এটি দ্বিতীয় খণ্ড। উপমহাদেশের ইতিহাসে সুলতান মাহমূদ গজনবী সতের বার ভারত অভিযান পরিচালনাকারী মহানায়ক হিসেবে খ্যাত। সুলতান মাহমূদকে আরো খ্যাতি দিয়েছে পৌত্তলিক ভারতের অন্যতম দু' ঐতিহাসিক মন্দির সোমনাথ ও থানেশ্বরীতে আক্রমণকারী হিসেবে। ঐসব মন্দিরের মূর্তিগুলোকে টুকরো টুকরো করে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন মাহমূদ। কিন্তু উপমহাদেশের পাঠ্যপুস্তকে এবং ইতিহাসে মাহমূদের কীর্তির চেয়ে দুষ্কৃতির চিত্রই বেশী লিখিত হয়েছে। হিন্দু ও ইংরেজদের রচিত এসব ইতিহাসে এই মহানায়কের চরিত্র যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তাতে তাঁর সুখ্যাতি চাপা পড়ে গেছে। মুসলিম বিদ্বেষের ভাবাদর্শে রচিত ইতিহাস এবং পরবর্তীতে সেইসব অপইতিহাসের ভিত্তিতে প্রণীত মুসলিম লেখকরাও মাহমূদের জীবনকর্ম যেভাবে উল্লেখ করেছেন তা থেকে বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের বোঝার উপায় নেই, তিনি যে প্রকৃতই একজন নিবেদিতপ্রাণ ইসলামের সৈনিক ছিলেন, ইসলামের বিধি-বিধান তিনি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন। জাতিশত্রুদের প্রতিহত করে খাঁটি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও দৃঢ় করণের জন্যেই নিবেদিত ছিল তার সকল প্রয়াস। অপলেখকদের রচিত ইতিহাস পড়লে মনে হয়, সুলতান মাহমূদ ছিলেন লুটেরা, আগ্রাসী ও হিংস্র। বারবার তিনি ভারতের মন্দিরগুলোতে আক্রমণ করে সোনা-দানা, মণি-মুক্তা লুট করে গজনী নিয়ে যেতেন। ভারতের মানুষের উন্নতি কিংবা ভারত কেন্দ্রিক মুসলিম সালতানাত প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা তার কখনো ছিলো না। যদি তৎকালীন ভারতের নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্য করা এবং পৌত্তলিকতা দূর করে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দেয়ার একান্তই ইচ্ছা তাঁর থাকতো, তবে তিনি কেন মোগলদের মতো ভারতে বসতি গেড়ে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতেন না? ইত্যাকার বহু কলঙ্ক এঁটে তার চরিত্রকে কলুষিত করা হয়েছে।

মাহমূদ কেন বার বার ভারতে অভিযান চালাতেন? মন্দিরগুলো কেন তার টার্গেট ছিল? সফল বিজয়ের পড়ও কেন তাকে বার বার ফিরে যেতে হতো গজনী? ইত্যাদি বহু প্রশ্নের জবাব; ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ সৈনিক সুলতান মাহমূদকে তুলে ধরার জন্যে আমার এই প্রয়াস। নির্ভরযোগ্য দলিলাদি ও বিশুদ্ধ ইতিহাস ঘেটে আমি এই বইয়ে মাহমূদের

প্রকৃত জীবন চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। প্রকৃত পক্ষে সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবীর মতোই মাহমূদকেও স্বজাতির গাদ্দার এবং বিধর্মী পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে একই সাথে লড়াই করতে হয়েছে। যতো বার তিনি ভারত অভিযান চালিয়েছেন, অভিযান শেষ হতে না হতেই খবর আসতো, সুযোগ সন্ধানী সাম্রাজ্যলোভী প্রতিবেশী মুসলিম শাসকরা গজনী আক্রমণ করছে। কেন্দ্রের অস্তিত্ব রক্ষার্থে বাধ্য হয়েই মাহমূদকে গজনী ফিরে যেতে হতো। একপেশে ইতিহাসে লেখা হয়েছে, সুলতান মাহমূদ সতের বার ভারত অভিযান চালিয়েছিলেন, কিন্তু একথা বলা হয়নি, হিন্দু রাজা-মহারাজারা মাহমূদকে উৎখাত করার জন্যে কতো শত বার গজনীর দিকে আগ্রাসন চালিয়ে ছিল।

সুলতান মাহমূদের বারবার ভারত অভিযান ছিল মূলত শত্রুদের দমিয়ে রাখার এক কৌশল। তিনি যদি এদের দমিয়ে রাখতে ব্যর্থ হতেন, তবে হিন্দুস্তানের পৌত্তলিকতাবাদ সাগর পাড়ি দিয়ে আরব পর্যন্ত বিস্তৃত হতো।

মাহমূদের পিতা সুবক্তগীন তাকে অসীয়ত করে গিয়েছিলেন, "বেটা! ভারতের রাজাদের কখনও স্বস্তিতে থাকতে দিবে না। এরা গজনী সালাতানাতকে উৎখাত করে পৌত্তলিকতার সয়লাবে কাবাকেও ভাসাতে চায়। মুহাম্মদ বিন কাসিমের সময়ের মত ভারতীয় মুসলমানদেরকে হিন্দুরা জোর জবরদস্তি হিন্দু বানাচ্ছে। এদের ঈমান রক্ষার্থে তোমাকে পৌত্তলিকতার দুর্গ গুড়িয়ে দিতে হবে। ভারতের অগণিত নির্যাতিত বনি আদমকে আযাদ করতে হবে, তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছাতে হবে।"

আলবিরুনী, ফিরিশ্‌তা, গারদিজী, উতবী, বাইহাকীর মতো বিখ্যাত ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবিদগণ লিখেছেন, সুলতান মাহমূদ তৎকালীন সবচেয়ে বড় বুযুর্গ ও ওলী শাইখ আবুল হাসান কিরখানীর মুরীদ ছিলেন। তিনি বিজয়ী এলাকায় তার হেদায়েত মতো পুরোপুরি ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তিনি নিজে কিরখানীর দরবারে যেতেন। কখনও তিনি তাঁর পীরকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠাননি। উপরন্তু তিনি ছদ্মবেশে পীর সাহেবের দরবারে গিয়ে ইসলাহ ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তিনি আত্মপরিচয় গোপন করে কখনও নিজেকে সুলতানের দূত হিসেবে পরিচয় দিতেন। একবার তো আবুল হাসান কিরখানী মজলিসে বলেই ফেললেন, "আমার একথা ভাবতে ভালো লাগে যে, গজনীর সুলতানের দূত সুলতান নিজেই হয়ে থাকেন। এটা প্রকৃতই মুসলমানের আলামত।"

মাহমূদ কুরআন, হাদীস ও দীনি ইলম প্রচারে খুবই যত্নবান ছিলেন। তাঁর দরবারে আলেমদের যথাযথ মর্যাদা ছিল। সব সময় তার বাহিনীতে শত্রু পক্ষের চেয়ে সৈন্যবল কম হতো কিন্তু তিনি সব সময়ই বিজয়ী হতেন। বহুবার এমন হয়েছে যে, তার পরাজয় প্রায় নিশ্চিত। তখন তিনি ঘোড়া থেকে নেমে ময়দানে দু'রাকাত নামায আদায় করে মোনাজাত করতেন এবং চিৎকার করে বলতেন, "আমি বিজয়ের আশ্বাস পেয়েছি, বিজয় আমাদেরই হবে।" বাস্তবেও তাই হয়েছে।

অনেকেই সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবী আর সুলতান মাহমূদকে একই চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের বীর সেনানী মনে করেন। অবশ্য তাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য একই ছিল। তাদের মাঝে শুধু ক্ষেত্র ও প্রতিপক্ষের পার্থক্য ছিল। আইয়ুবীর প্রতিপক্ষ ছিল ইহুদী ও খৃস্টশক্তি আর মাহমূদের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল হিন্দু পৌত্তলিক রাজন্যবর্গ। ইহুদী ও খৃস্টানরা সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবীর সেনাদের ঘায়েল করতো প্রশিক্ষিত সুন্দরী রমণী ব্যবহার করে নারী গোয়েন্দা দিয়ে আর এর বিপরীতে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে এরা ব্যবহার করতো শয়তানী যাদু। তবে ইহুদী-খৃস্টানদের চেয়ে হিন্দুদের গোয়েন্দা তৎপরতা ছিল দুর্বল কিন্তু সুলতানের গোয়েন্দারা ছিল তৎপর ও চৌকস।

তবে একথা বলতেই হবে, সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবীর গোয়েন্দারা যেমন দৃঢ়চিত্ত ও লক্ষ্য অর্জনে অবিচল ছিল, মাহমূদের গোয়েন্দারা ছিল নৈতিক দিক দিয়ে ততোটাই দুর্বল। এদের অনেকেই হিন্দু নারী ও যাদুর ফাঁদে আটতে তা। অথবা হিন্দুস্তানের মুসলিম নামের কুলাঙ্গররা এদের ধরিয়ে দিতো। তারপরও সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবীর চেয়ে সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দা কার্যক্রম ছিল বেশি ফলদায়ক।

ইতিহাসকে পাঠকের কাছে সুখপাঠ্য, বিশেষ করে তরুণদের কাছে হৃদয়গ্রাহী করে পরিবেশনের জন্যে গল্পের মতো করে রচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থ। বাস্তবে এর সবটুকুই সত্যিকার ইতিহাসের নির্যাস। আশা করি আমাদের নতুন প্রজন্ম ও তরুণরা এই সিরিজ পড়ে শত্রু-মিত্রের পার্থক্য, এদের আচরণ ও স্বভাব জেনে এবং আত্মপরিচয়ে বলীয়ান হয়ে পূর্বসূরীদের পথে চলার দিশা পাবে।

এনায়েতুল্লাহ
লাহোর।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বিজিত রাজ্য পেশোয়ারে সুলতান মাহমূদ অধীরভাবে অপেক্ষা করছেন দূত আসেমের আগমন প্রত্যাশায়। কিন্তু দু'সপ্তাহ কেটে গেল আসেমের কোন খবর পাচ্ছেন না। প্রত্যাশা এখন হতাশায় রূপান্তরিত হল সুলতানের, আশংকাও দেখা দিল তার মনে— আসেম সাথীদের নিয়ে শত্রুসেনাদের হাতে বন্দী হয়নি তো! দরবারীদের কাছে তিনি আশংকার কথা বারকয়েক ব্যক্ত করেছেন। তিনি শীর্ষ কর্মকর্তাদের কাছে এ ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন, "যদি শুনি আসেম ও তার সাথীদের ওরা বন্দী করেছে তাহলে আমি মুলতানের রাজপ্রাসাদের প্রতিটি ইট খুলে ফেলবো। ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া কাউকে জ্যান্ত রাখবো না।"

এর দু'দিন পর সুলতানকে সংবাদ দেয়া হলো, আসেমের এক সাথী এক যুবতী মহিলাকে নিয়ে গজনী ফিরেছে। দীর্ঘ সফর, ক্ষুধা পিপাসা আর কষ্ট যাতনায় ওদের অবস্থা খুবই করুণ।

"ওদেরকে এক্ষুণি আমার এখানে নিয়ে এসো।" কিছুটা বিস্ময়মাখা কণ্ঠে নির্দেশ করলেন সুলতান। "কোন অঘটন ঘটেনি তো?"

সৈনিক সুলতানের কক্ষে প্রবেশ করল। মুখ ব্যাদান। তার দু'চোখ কোটরাগত। শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে ঘন ঘন। যুবতীর অবস্থা ওর চেয়েও করুণ। সুলতান ওদের পানি দিতে নির্দেশ করলেন। পানি নিয়ে এলে উভয়ে কয়েক ঢোক পান করল।

"সুলতানে আলী মাকাম! ঘোড়াকে বিশ্রাম দেয়া ছাড়া আমরা পথে কোথাও এক মুহূর্ত দেরী করিনি। কমান্ডার আসেমের এখানে পৌছার আগেই আপনার সাথে সাক্ষাৎ করা ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। সম্ভবত সে এখনও পৌছেনি।" বলল সৈনিক।

"জাঁহাপনা! আসেম আপনার পয়গামের যে জবাব নিয়ে আসছে তা সম্পূর্ণ প্রতারণা। মুলতানের শাসক দাউদ বিন নসর হিন্দুদের চেয়ে আরো বেশি ভয়ংকর শত্রু আপনার। সে হিন্দুদের পক্ষ থেকে আপনাকে হত্যা করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়েছে। সেই সাথে আমাদের সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার জন্যে মারাত্মক চক্রান্তের জাল বিছিয়েছে। সে আনন্দ পাল ও বিজি

রায়ের পক্ষে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে নীলনক্শা এঁকেছে। সেই নীলনক্শার অংশ হিসেবেই ওরা আসেমকে হাত করে নিয়েছে। আসেম আপনার কাছে যে মানচিত্র নিয়ে আসছে, সেটি হিন্দুদের সরবরাহকৃত। বিজি রায় ও আনন্দ পালের সৈন্যরা দাউদের হয়ে ওৎ পেতে থাকবে আমাদের গমন পথে নিরাপত্তা দেয়ার কৌশল করে। কিন্তু সুযোগ মতো ওরা আপনার উপর হামলা করবে এবং আমাদের সেনাবাহিনীকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করবে। আসেম তার অধীনস্থ সৈনিকদের নিয়ে ওদের ক্রীড়নক হিসেবে আত্মসমর্পণে প্ররোচনা দিবে।"

"দাউদ যে এই নীলনক্শা এঁকেছে, আসেম কি তা বুঝতে পারেনি?"

"সে নিজেই তো বিক্রি হয়ে গেছে। সে এখন দাউদের ক্রীড়নক।"

সৈনিক যুবতী সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত করল সুলতানকে। কিভাবে ভাগ্য বিড়ম্বিতা এই যুবতী ইসলামের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছে এবং তার সাথে পালিয়ে এসেছে। সুলতান এক দোভাষীর মাধ্যমে যুবতীর কাছ থেকে জানলেন দাউদের অভ্যন্তরীণ হালত। এও জানলেন, আসেমের এতদিন ওখানে কিভাবে কেটেছে, কি করেছে, কি কি কথা হয়েছে দাউদ ও আসেমের মধ্যে। যুবতী দাউদ বিন নসরের কার্যক্রম, ওদের ধর্মীয় আচার ও আকীদা বিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানাল সুলতানকে। সে এ কথাও বলল, "আমি নিজের কানে এসব শুনেছি এবং নিজের চোখে দেখেছি ও নিজের হাতে আসেমকে মদ খেতে দিয়েছি।"

"এই মেয়েটিকে অন্দর মহলে পাঠিয়ে দাও। এর সেবা-যত্নে কোন ত্রুটি হয় না যেন। আর এই সৈনিকেরও খানা-দানা ও বিশ্রামের সুব্যবস্থা কর। ওকে শাহী মেহমানখানায় থাকতে দাও। এরা যে আসেমের আগেই পৌঁছে গেছে সে কথা প্রকাশ হয় না যেন।"

ওদের পৌঁছার চার পাঁচদিন পর আসেম ওমর সুলতানের দরবারে পৌঁছাল। আসেম সুলতানকে বলল, "দাউদ বিন নসর আপনার জন্যে দামী দামী উপঢৌকন পাঠিয়েছে এবং অধীর আগ্রহে আপনার আগমন প্রত্যাশা করছে। সে আপনাকে মুলতানে স্বাগত জানাতে উদগ্রীব। দাউদের দেয়া ষড়যন্ত্রের মানচিত্র সুলতানের কাছে মেলে ধরে সে বলল, এটা দাউদের বলে দেয়া পথ। এ পথে আমাদের সৈন্যরা অতিক্রম করলে সে সব ধরনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। আসেম আরো বলল, দাউদ বিন নসর আমাদের খুব নির্ভরযোগ্য দোস্ত।"

"মুলতান পর্যন্ত সৈন্য নিয়ে যাওয়ার পথ আমি দেখে ফেলেছি। তবে তুমি আমাকে বল, বিজি রায় ও আনন্দ পালের সৈন্যরা কোন কোন জায়গায় ওঁৎ পেতে থাকবে এবং রাতের আঁধারে কীভাবে গুপ্ত হামলা করবে?"

“বিস্ময়ভরা চোখে সুলতানের দিকে তাকাল আসেম। নির্দেশ দিলেন সুলতান, “ওদের দু'জনকে নিয়ে এসো।”

একটু পরই আসেম ওমরের হারিয়ে যাওয়া নিরাপত্তারক্ষী আর সেই তরুণী এসে দাঁড়াল তার সামনে।

“এই যুবতীকে চেনো?” গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন সুলতান। “তোমার কি মনে আছে, দাউদের প্রাসাদে বসে যখন তুমি তোমার ঈমান আর আমার জীবন বেচাকেনা করছিলে তখন এই যুবতী তোমাদের মদ পরিবেশন করছিল? তুমি কি আমার মুখেই তোমার কৃতকর্মের বিস্তারিত শুনতে চাও, না ওর মুখে শুনবে? এর চেয়ে কি এটাই ভাল নয় যে, কৃতকর্মের বর্ণনা তুমি নিজের মুখেই দাও।”

উঠে দাঁড়াল আসেম ওমর। কৃত অপরাধ আর পাপাচারের বোঝা ওর ঈমানী শক্তিকে বিলীন করে দিয়েছে। সত্যের মুখোমুখি হতে সাহস হলো না তার। আস্তে করে তরবারীটা কোষমুক্ত করে আগাটা বসিয়ে দিল পেটে এবং দু'হাতে তরবারীর বাট ধরে এমন জোরে চাপ দিল যে পিঠ ফুরে বেরিয়ে গেল। একটা চাপা চিৎকার দিয়ে পড়ে গেল মেঝের ওপর। তড়পাতে লাগল ওর দেহ।

প্রহরীদের নির্দেশ দিলেন সুলতান। “ওর দেহকে শহরের বাইরে খোলা জায়গায় ফেলে এসো। ঈমান সওদাকারী দাফন কাফনের হকদার নয়।”

সেনাপতিদের ডেকে পাঠালেন সুলতান। নির্দেশ দিলেন, “এখনই সেনাদের তৈরি হতে বলুন। আমি আজই মুলতানের উদ্দেশে রওয়ানা হবো। ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে হবে। পথে কয়েক জায়গায় যুদ্ধ করতে হবে আমাদের। পৌত্তলিকদের পাশাপাশি কারামাতী চক্রান্তও এবার খতম করব ইনশাআল্লাহ।”

জনকের প্রায়শ্চিত্ত

নিজের তরবারী নিজের পেটে ঢুকিয়ে দিয়ে কৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করল আসেম ওমর। তরবারী বিদ্ধ আত্মঘাতক আসেমকে শহর প্রাচীরের বাইরে ফেলে আসতে নির্দেশ দিলেন সুলতান। প্রখর রৌদ্রতাপে তড়পাতে তড়পাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল সে। কারো অনুমতি ছিল না যে আসেমের মুখে এক কাতরা পানি দেবে। অতীত কৃতিত্বের জন্যে অনুগ্রহ করে সুলতান আসেমের উত্তরসূরীদেরকে অনুমতি দিলেন মরদেহ তুলে নিয়ে যথারীতি দাফন করতে।

সুলতান মাহমূদের সেনাবাহিনীর শীর্ষস্থানীয় একজন অধিনায়ক ছিল আসেম ওমর। যুদ্ধবিদ্যায় সে ছিল খুবই দক্ষ, সাহসী এবং বিচক্ষণ। কিন্তু জীবনের এই

যুগসন্ধিক্ষণে এসে নারীদেহ, মদের নেশা আর সামান্য জমিদারীর লোভ তাকে এমনই আদর্শচ্যুত করল যে, দূরতিক্রম্য শত্রু দুর্গ বিজয়ী আসেম, হাজারো শত্রু নিধনকারী বাহাদুর আসেম, সেনাধিনায়ক, বিচক্ষণ কূটনীতিক আসেম জবাবদিহির মুখোমুখি হতে না পেরে নিজের তরবারী পেটে ঢুকিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা করল। অথচ আসেম ছিল সুলতান মাহমূদের সেনাবাহিনীর একজন আদর্শ সৈনিক। তার খ্যাতি ও যশ ছিল সর্বত্র আলোচিত। প্রধান সেনাপতি আসেমের কার্যক্রমের উপর ছিলেন আস্থাবান। তার প্রতি প্রধান সেনাপতির প্রশ্নাতীত আস্থা ও বিশ্বাসই সুলতানের ভিন্নমত থাকা সত্ত্বেও এতো গুরুত্বপূর্ণ মিশনে তাকে সুলতানের বিশেষ দূত হিসেবে গুরু দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল।

কাসেম ওমর। টগবগে যুবক। সুলতানের সেনাবাহিনীর ইউনিট কমান্ডার, দুর্ধর্ষ, বিচক্ষণ, সিদ্ধান্তে অবিচল, লক্ষ্যে স্থির। ছোট বেলা থেকেই পিতার কাছে কাসেম শুনতো যুদ্ধের কাহিনী। অল্প বয়সেই পুত্র কাসেমকে ভর্তি করে দিয়েছিল সুলতানের সেনাবাহিনীতে। রণাঙ্গনে সে ছিল বাবার যোগ্য উত্তরসূরী। আসেমের মৃত্যুকালে পুত্র কাসেম পূর্ণ যুবক। সেনাবাহিনীতে সে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান করে নিয়েছে নিজের যোগ্যতা বলে।

বাবার মৃত্যুসংবাদ যখন কাসেমের কাছে পৌছাল তখন সে এই ভেবে অনুতাপ করল যে, সেনাবাহিনীর একজন কৃতি অধিনায়কের পদে শূন্যতা সৃষ্টি হলো। দুঃখ পেল কাসেম এই ভেবে যে, তার বাবা বিশেষ দূত হিসেবে মুলতান গিয়েছিলেন; হিন্দুরা হয়তো তাকে শহীদ করেছে। বাবা হিসেবে শুধু নয়, সেনাবাহিনীর জন্য একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির শূন্যতা তাকে খুবই পীড়া দিচ্ছিল। তার বিশ্বাস ছিল, তার বাবার মরদেহ হয়তো মুলতান থেকে নীত হয়েছে।

মৃত্যু সংবাদবাহক কাসেমকে সাথে করে নিয়ে এলো আসেমের লাশের পাশে। উন্মুক্ত আকাশের নীচে, বালির মধ্যে, রক্তাক্ত পিতার লাশ দেখে কাসেম হতবাক। একি! তার পিতার মরদেহ তরবারী বিদ্ধ!

কাছের একটি ইমারতের বহিরাঙ্গণে সুলতান মাহমূদের প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ আত্তায়ী দাঁড়ানো। কাসেম বিন ওমরকে পিতার লাশের পাশে বিষণ্ন মনে দাঁড়ানো দেখে আব্দুল্লাহ্ পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন। যুবক কাসেমের প্রতি তার ভীষণ মায়া হলো। তিনি তার কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে নিজের দিকে ফেরালেন। বললেন, তোমার বাবার কাহিনী শুনলে তা তোমাকে এই করুণ দৃশ্য থেকে আরো বেশি দুঃখ দেবে। পিতার মায়া-মমতা,

তার কৃতিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা মন থেকে দূর করে দাও। বরং এর জায়গায় তোমার দীন, ঈমান, কর্তব্য ও দেশপ্রেমকে স্থান দাও।

"তাজা রক্ত দেখে মনে হচ্ছে, তাকে এখানেই কিছু আগে হয়তো হত্যা করা হয়েছে।" বলল কাসেম বিন ওমর। "কি অপরাধে তাকে এমন নির্মম হত্যার শিকার হতে হলো। আমি জানি, তিনি সুলতানের বিশেষ দূত হিসেবে মুলতান গিয়েছিলেন। কিন্তু তার এমন অবস্থা হলো কেন?"

"তোমার পিতা আত্মহত্যা করেছে। তাকে কেউ হত্যা করেনি। এখানে তার কোন শত্রু নেই, ছিলও না। সে নিজেই নিজের সাথে দুশমনি করেছে। সে তার দীন-ঈমান, দেশ, জাতি ও সেনাবাহিনীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আর সেই বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতিতে আত্মহত্যা করে প্রায়শ্চিত্ত করেছে তোমার পিতা।" বললেন আবু আব্দুল্লাহ্।

আবু আব্দুল্লাহ্ কাসেম বিন ওমরের উদ্বেগ নিরসনের জন্যে তার পিতার পূর্বাপর ইতিবৃত্ত সবিস্তারে জানালেন। বললেন, কি কারণে কোন্ প্রেক্ষিতে সে আত্মহত্যার পথ অবলম্বন করেছে।

"পিতার অপরাধের শাস্তি কি আমাকেও ভোগ করতে হবে, মাননীয় সেনাপতি!" বিনীতভাবে জানতে চাইল কাসেম। "আমাকে কি সেনাবাহিনী থেকে অপসারণ করা হবে?"

"এখনও পর্যন্ত সুলতান এমন কোন নির্দেশ দেননি। সুলতানের পরে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব আমার হাতে। আমিও এমন কোন সিদ্ধান্ত নেইনি। আমার দৃষ্টিতে তুমি সাহসী ও কর্তব্যপরায়ণ কমান্ডার। আমি আশা করি, দায়িত্বের প্রতিক্ষেত্রে কর্তব্যনিষ্ঠায় তুমি আমার পদ পর্যন্ত পৌঁছবে। সবেমাত্র শুরু। এখনও গোটা জীবন তোমার সামনে রয়েছে। আমি আশা করি, তুমি তোমার পিতার ভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিবে। বুঝতে চেষ্টা করবে, পাপের কতো আকর্ষণ, কীভাবে অপরাধ একজন নিষ্ঠাবান সেনাধ্যক্ষকে পথভ্রষ্ট করে!

ভাবতে পারো, ভোগ আর জাগতিক লিপ্সা আসেম ওমরের মতো কর্তব্যনিষ্ঠ সেনাধ্যক্ষকেও নিজের দেশ, সেনাবাহিনী আর দীন-ধর্ম থেকে কিভাবে বিচ্যুত করেছে! সুলতান মাহমূদের মতো ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে পরাজিত করতে, নিজের গড়া মুসলিম মুজাহিদদেরকে বেঈমানদের হাতে পরাজিত করে গোলাম বানানোর কি ভয়ংকর জালে পা দিতে পারে! সেই চিন্তা করো, অপরাধ যখন মানুষকে তাড়া করে তখন আসেম ওমরের মতো বীর বাহাদুর যোদ্ধাও কাপুরুষের মতো আত্মহত্যার পথ অবলম্বন করে। তুমি যুবক। যুবকদের জীবনে

সবচেয়ে আশংকার বিষয় হচ্ছে, গুনাহর আহ্বান তাদের পক্ষে প্রত্যাখ্যান করা কঠিন হয়ে পড়ে। যৌবনের যন্ত্রণায় অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।"

"মাননীয় সেনাপতি! আমাকে কি পিতার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ দেয়া হবে?"

"তোমাকে অবারিত সুযোগ দেয়া হচ্ছে। চল। লাশের পেট থেকে তরবারী বের করে আনো। তোমার বাবার মৃতদেহ সমাধিস্থ কর। কাফন-দাফনের ব্যবস্থা কর।"

"আমি কি সেই মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবো, যিনি মুলতান থেকে এসেছেন এবং যে আমার পিতার অপরাধের প্রত্যক্ষ সাক্ষী?"

"তুমি লাশ বাড়িতে নিয়ে যাও। সেই মহিলাকে আমি তোমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে তোমার আম্মুকেও সব ঘটনা বলবে। তুমি ইচ্ছে করলে, সেই সৈনিকের সাথে কথা বলতে পারবে যে সৈনিক এই মহিলাকে সাথে করে নিয়ে এসেছে।" বললেন প্রধান সেনাপতি।

পিতার দেহ থেকে তরবারী বের করে আনলেন কাসেম বিন ওমর। প্রধান সেনাপতি আসেমের লাশ বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।

স্ত্রীকে নিজের সাথে পেশোয়ার নিয়ে এসেছিল আসেম। আসেমের স্ত্রী ছিল পেশোয়ারেরই মেয়ে। ৯৭৭ খৃস্টাব্দে রাজা জয়পাল যখন প্রথম সুলতান সুবক্তগীনের বিরুদ্ধে সেনাভিযান চালায় তখন সম্মুখ সমরে পরাজিত হয়ে জয়পাল পালিয়ে যায়। তার সাথে ছিল অনেক মুসলিম বন্দী নারী ও বেসামরিক লোক। এরা সুবক্তগীনের সৈন্যদের হাতে বন্দী হয়। সেই বন্দিনীদেরই একজন আসেমের স্ত্রী কাসেমের মা। এর পূর্বে রাজা জয়পালের বাহিনী পেশোয়ার অঞ্চলের অধিবাসীদের বাড়িঘর লুটপাট ও তরুণীদের অপহরণ করে সেনাবাহিনীর সেবিকা হিসেবে নিয়ে এসেছিল। এদেরই একজনকে বিয়ে করেছিল আসেম। আসেমের স্ত্রী পেশোয়ারের আঞ্চলিক ভাষা জানতো। তাই আসেম যখন পেশোয়ার যাওয়ার নির্দেশ পেল তখন আঞ্চলিক ভাষাভাষী হিসেবে স্ত্রীকেও সাথে নিয়ে গিয়েছিল সহযোগিতার প্রয়োজনবোধে। সেই পৌত্তলিক বাহিনীর হাতে অত্যাচারিতা মহিলার উদরে জন্ম নিয়েছে কাসেম। সৈনিক বাবার ঔরসজাত আর অত্যাচারিতা মায়ের উদরজাত কাসেম স্বভাবগতভাবেই পৌত্তলিকতা বিরোধী এক দ্রোহ। ইসলামী চেতনার এক জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি। কাসেম মায়ের কাছেই শিখেছিল তার মাতৃভাষা। আর অবস্থানগত কারণে গজনীর ভাষা তো জানতই।

আসেমের লাশ দেখে তার বিধবা স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়ল। কিন্তু কাসেমের হাতে রক্তমাখা তরবারী দেখে কান্না থেমে গেল তার মায়ের। বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল ছেলের দিকে।

"মা! আপনি যেভাবে রোদন করছেন, আপনার মতো মহিলার পক্ষে তার জন্যে শোক-তাপ করা খুবই বেমানান। হাতের তরবারীটা ছুঁড়ে মেরে কাসেম মায়ের উদ্দেশে বলল, তাকে কেউ হত্যা করেনি। নিজের তরবারী দিয়েই সে আত্মহত্যা করেছে।"

কাসেম উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করল— "মা! সত্যি করে বলুন তো, আমি কি প্রকৃতপক্ষে তারই সন্তান? আপনি কি আগে হিন্দু ছিলেন? আমি কোন হিন্দুর ঔরসজাত নই তো? আমি কি লালিত পালিত হয়েছি কোন গাদ্দারের ঘরে?"

"কাসেম!" আর্তচিৎকার করে ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন মা। "এসব তুমি কি বলছো? কি ঘটেছে! কি দেখছি আমি! তুমি কাকে গাদ্দার বলছো! বোখারা বলখের বিদ্রোহীদের পরাভূতকারী কমান্ডার, আজীবন পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে জিহাদকারী অকুতোভয় সৈনিক, যুদ্ধের ময়দানে পাহাড়ের মতো অবিচল যোদ্ধা, দীনের সেবক মুজাহিদ বাবাকে তুমি গাদ্দার বলছো! তিনি তো সুলতানের দূত হয়ে মুলতান গিয়েছিলেন। কবে ফিরেছেন? তিনি গাদ্দার হবেন কি করে? কি হয়েছে বাবা, বল! আমাকে খুলে বল!"

"আমি বলতে পারবো না মা! আপনাকে মুলতানের এক মহিলা সব বলবে। সে আসছে। এছাড়াও দূতের দেহরক্ষী হিসেবে যে কয়জন সৈনিক আব্বুর সহযাত্রী হয়েছিল তাদের একজনও আসছে। তার কাছ থেকেই আপনি সব জানতে পারবেন। এই তো এসেছে তারা!"

প্রথমেই ঘরে প্রবেশ করল মুলতানের মহিলা। প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ্ তাকে কাসেমদের বাড়িতে পাঠিয়েছেন। কাসেম খেয়াল করল, মহিলাটির বয়স বেশি নয়, যুবতী। কিন্তু যৌবনের কান্তি-কোমনীয়তা নেই তার চেহারায়। নির্যাতন, নিপীড়নের ছাপ স্পষ্ট তার চোখে-মুখে। চেহারা দেখেই বোঝা যায়, বহু ঝড়-ঝাপটা গেছে এই মেয়ের জীবনে। তারপরও মেয়েটির চেহারায় একটা মোহনীয় ভাব, বিচক্ষণতা ও দীপ্তিময়তা বিদ্যমান— যা যে কোন পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম।

মেয়েটি কাসেমদের ঘরে প্রবেশ করেই নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, "আমার নাম রাবেয়া, আমাকে আপনাদের ঘরে পাঠানো হয়েছে।"

“আমার স্বামী মুলতানে কি করেছিলেন?” জিজ্ঞেস করল আসেম ওমরের স্ত্রী।

“ওই ধরনের পরিবেশে শরীফ ধরনের লোকেরা যা করে থাকে, তিনিও তাই করেছেন।” জবাব দিল রাবেয়া। রাবেয়া বলে চলল, “আসেম ওমরকে দাউদ বিন নসর কীভাবে মদ নারী আর সুরা নর্তকীর মায়াজাল এবং ক্ষমতার মোহ দিয়ে ফাঁদে আটকে ফেলেছিল। রাবেয়া সবিস্তারে বলল— “মদ, নারী, গান-বাজনা, আয়েশ-উপভোগ ছাড়া দাউদের ওখানে নীতি-নৈতিকতার কী আছে? আপনার স্বামীর প্রতি আমার বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিল না। তিনি কে তা আমি আগে জানতামও না। কিন্তু দাউদ বিন নসর সুলতান মাহমূদের সেনাবাহিনীকে সহযোগিতার ধোঁকা দিয়ে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র করেছিল। সেই ষড়যন্ত্রের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছিলেন আপনার স্বামী। আমি তখন তাকে জানতে পারি, যখন আমাকে তাদের মদ আপ্যায়নের নির্দেশ দেয়া হলো। আমি নিজ হাতে উভয়কে মদ ঢেলে দিয়েছি। তারা উভয়ে আকণ্ঠ পান করেছেন। তাদের বৈঠকে আমাকে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। আমি তাদের কথোপকথনের সময় উপস্থিত ছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত আমিও এই চক্রান্তের অংশে পরিণত হয়েছিলাম। আমার বাবা এক কাপুরুষের সাথে আমাকে বিয়ে দিয়েছিল। সেই ব্যক্তি আমাকে দাউদ বিন নসরের কাছে উপহার হিসেবে রেখে যায়।

করুণ পরিণতির শিকার হয়ে মানসিকভাবে আমি ভেঙে পড়েছিলাম। গুনাহ্ আর পাপক্লিষ্ট জীবন-যাপনে বাধ্য হওয়ায় মনের দিক থেকে আমি মরেই গিয়েছিলাম। বেঁচে থাকা আমার কাছে অভিশাপ মনে হতো। কিন্তু একজন জ্ঞানী ও সাধক ব্যক্তি আমার মৃতপ্রায় হৃদয়টিকে সজীব করে তুলেছেন। তিনি আমার এক বাল্যবান্ধবীর পিতা। তিনি আমাকে বোঝালেন, দাউদ বিন নসর ইসলামের দুশমন। তুমি ওর হেরেমের অভ্যন্তরের ঘটনাবলী গভীরভাবে জেনে ওর চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করে দীন ও মিল্লাতের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পার। বাহ্যত তোমার জীবন কষ্টকর হলেও আল্লাহ্ হয়তো তোমার অসহায়তাকে ক্ষমা করে দীন ও ইসলামের জন্য তোমার খেদমতে সন্তুষ্ট হবেন। তাঁর কথায় আমি সান্ত্বনা পেলাম। অল্প দিনের মধ্যে দাউদের হারেমে সবচেয়ে আস্থাভাজন ও কর্তব্যপরায়ণ সেবিকা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে আমি সক্ষম হলাম। আর বান্ধবীর পিতাকে দাউদের কার্যক্রম সম্পর্কে যথারীতি অবহিত করার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে নিলাম।”

রাবেয়া বলল, "কারামাতী গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য সীমাহীন জঘন্য। তেমনি ওদের কাজকর্ম ও চালচলন। কারামাতীরা নিজেদের মুসলমান দাবী করে বটে কিন্তু এমন কোন গুনাহর কর্ম নেই যা ওরা বৈধ মনে করে না। মুলতান কারামাতীদের প্রধান কেন্দ্র। ওই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ ওদের বিভ্রান্তির শিকার হয়ে দলে দলে কারামাতী হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য কারামাতীদের বিরুদ্ধেও কিছু সংখ্যক লোক সক্রিয় রয়েছে কিন্তু তারা প্রকাশ্যে নয় অতি গোপনে। ওখানে কারো পক্ষে কারামাতীদের বিরুদ্ধাচরণ করে টিকে থাকা অসম্ভব। আমার বান্ধবীর পিতা কারামাতী বিরোধী দলের নেতৃত্বে রয়েছেন। তিনি বিশুদ্ধ আকীদায় বিশ্বাসী, আমলদার খাঁটি মুমিন ব্যক্তি। তিনি সব সময় বলেন, তাঁর সামর্থ নেই— এজন্যে তিনি গজনী আসতে পারছেন না। তিনি বলেন, সাক্ষাৎ হলে সুলতান মাহমূদকে তিনি মুলতান অভিযানের জন্যে অনুরোধ করতেন, কারণ, কারামাতীরা মুসলমানদের জন্য হিন্দুদের চেয়েও ভয়ংকর ও বিপজ্জনক।...

তাঁর কাছে নিয়মিত যাতায়াত ছিল আমার। দাউদের ওখানে যা কিছু ঘটতো, যেসব চক্রান্ত করা হতো, সব কিছুই হতো আমার জ্ঞাতসারে। এসবের খবর আমি যথারীতি তাকে জানিয়ে দিতাম। দাউদের হারেমেই আমি সুলতান মাহমূদ সম্পর্কে জেনেছি। দাউদের কাছে রাজা আনন্দ পাল ও বিজি রায় ক'দিন পরপর আসতো। ওরা সুলতান মাহমূদকে পরাজিত করতে এবং তার সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে নিয়মিত শলা-পরামর্শ করতো।

আপনার স্বামী সম্পর্কে আমি জানতে পেরেছিলাম যে, তিনি সুলতানের সেনাবাহিনীর এক শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তা। এজন্যে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু দাউদের হারেমের সুন্দরী কিশোরী আর মদ সুরার ফাঁদে পড়ে নিজের কর্তব্য ভুলে গেলেন। এমন কি নিজের বাহিনীকে ধ্বংস করার চক্রান্তে নিজেই জড়িয়ে পড়লেন।

একথা আমি বান্ধবীর পিতাকে জানানোর পর তিনি আপনার স্বামীর একজন দেহরক্ষীকে ডেকে তাকে সব কথা বুঝালেন এবং হারেম থেকে আমাকে পালানোর ব্যবস্থা করে দিলেন। সেই রক্ষীর সাথে আমি গজনী এসেছি। আমরা আপনার স্বামীকে ভ্রান্তিতে রেখে তার আগেই গজনী পৌঁছে সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করি। কয়েকদিন পর দেহরক্ষীদের নিয়ে আপনার স্বামী গজনী পৌঁছে দাউদের চক্রান্ত বাস্তবায়নের জন্যে সম্পূর্ণ প্রতারণাপূর্ণ তথ্য সুলতানকে অবহিত করেন। সুলতান তার প্রতারণা প্রমাণের জন্যে আমাকে ও সেই দেহরক্ষীকে তার সামনে হাজির করেন। আমি আপনার স্বামীর প্রতারণা ফাঁস করে দিলে তিনি

নিজের পরিণতি বুঝতে পেরে কোমর থেকে তরবারী বের করে আচমকা পেটে বিদ্ধ করেন।"

কাসেম ও তার মা নীরবে রাবেয়ার কথা শুনছিল। রাবেয়ার কথা শেষ হলে তার মা উঠে আসেমের তরবারীটি হাতে নিয়ে কাসেমের দিকে বাড়িয়ে বললেন— "আমি তোমার পেটে শত্রুবাহিনীর তরবারী বিদ্ধ দেখতে চাই। তবে এর আগে ঐ তরবারী দিয়ে অন্তত্ব একশ' শত্রু তোমাকে নিধন করা চাই।"

"এ তরবারী আমাকে দিয়ো না। এ তরবারীতে যে রক্ত লেগে আছে তাতে শরাবের প্রভাব রয়েছে, এ তরবারী নাপাক; এ নাপাক তরবারী দিয়ে কি জিহাদ করা যায়?" বলল কাসেম।

আসেম ওমরকে অতি সাধারণ মানুষের মতো দাফন করা হলো। তার স্ত্রী আসেমের মৃত্যুতে অনুতাপ করল বটে কিন্তু মোটেও আর কান্নাকাটি করল না, যেমনটি একজন কৃতি সেনাপতির মৃত্যুতে তার প্রেয়সী স্ত্রী করে থাকে। আসেমের স্ত্রীর মনে হিন্দুদের প্রতি পাহাড়সম ঘৃণা। সে যৌবনে হিন্দুদের অপহরণের শিকার হয়। তার বিশ্বাস, নিরীহ অবলা কিশোরীদের অভিশাপের কারণেই প্রতাপশালী জয়পালের পরাজয় ঘটেছে। আল্লাহ্র মেহেরবানীতে সে আসেম ওমরের মতো দক্ষ সৈনিককে পেয়েছিল স্বামী হিসেবে। বিয়ের পর অল্পদিনের মধ্যেই আসেম অধিনায়ক পদে উন্নীত হয়। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, ইসলাম ও মুসলিম বাহিনীর জন্যে নিবেদিত প্রাণ সেই কৃতি স্বামীকে হিন্দুরা চক্রান্তের ফাঁদে ফেলে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করল। কাসেমের আম্মা পেশোয়ারে সুলতানের অভিযানের কথা শুনে খুশি হয়েছিলেন। এজন্যে তিনি স্বামীর কাছে সফরসঙ্গী হওয়ার বায়না ধরেছিলেন। স্বামী আসেমও পেশোয়ারের আঞ্চলিক ভাষাভাষী হিসেবে কাজে লাগতে পারে মনে করে স্ত্রীকে পেশোয়ার নিয়ে এসেছিল। কাসেমের মায়ের মন ছিল প্রচণ্ড হিন্দু বিদ্বেষে অগ্নিকুণ্ড। সে কোনদিন তার মতো অসংখ্য যুবতীর উপর হিন্দুদের নির্যাতনের কথা বিস্মৃত হতে পারেনি। কিন্তু প্রতিশোধের আগুন নিভানোর যে স্বপ্ন নিয়ে কাসেমের মায়ের পেশোয়ার আগমন সেই মায়ের হৃদয় এখন আত্মগ্লানি ও বিষাদে ভরপুর। অসহনীয় কষ্ট তার সাহসী মনটাকে ভেঙ্গে খান খান করে দিচ্ছে। কাসেমের মা জীবনের সব স্বপ্ন স্বামীর পরিবর্তে পুত্রকে সঁপে দিল। ছেলেটিকে সে এখন অত্যাচারী হিন্দুদের বিরুদ্ধে সাহসীরূপে গড়ে তুলতে সচেষ্ট। রাবেয়াকে এক বঞ্চিতা ভাগ্য বিড়ম্বিতা অবলা মেয়ে হিসেবে নিজের কাছেই রেখে দিল। ভয়াবহ ক্ষতির মুখোমুখি থেকে সুলতানের বাহিনীকে বাঁচানোর জন্যে রাবেয়া যে কঠিন

দায়িত্ব পালন করেছে, এজন্য তিনি রাবেয়াকে সাধুবাদ জানালেন। তার জন্যে প্রাণ খুলে দু'আ করলেন।

আসেম ওমর যেদিন ষড়যন্ত্রের নকশা নিয়ে গযনীর উদ্দেশে রওয়ানা হল এর পরদিনই দাউদ বিন নসর বেরায় গিয়ে বিজি রায়কে জানাল, সুলতানকে পরাজিত করতে সে কি ফাঁদ পেতেছে। কিভাবে সুলতানের প্রেরিত দূতকে বিভ্রান্ত করে ধোঁকা দিয়ে চক্রান্ত বাস্তবায়নের ক্রীড়নক বানিয়েছে। বিজি রায় দাউদের সংবাদ নিয়ে সেদিনই লাহোর চলে গেল আনন্দ পালের কাছে। আনন্দ পালকে সে বলল, অল্প ক'দিনের মধ্যে দুশমন আমাদের জালে ধরা দিচ্ছে। আপনার কাজ দাউদের নকশা অনুযায়ী পথিমধ্যে মাহমূদের সৈন্যদের নাস্তানাবুদ করে দেয়া। আনন্দ পাল বিজি রায়ের কথা শুনে বলল, "আপনি কিভাবে দাউদের কথায় আশ্বস্ত হলেন? দাউদ নিজেও তো একজন মুসলমান। দাউদ চক্রান্ত করে আমাদের সর্বনাশ ঘটাবে না এমনটা কি করে বিশ্বাস করা যায়? মুসলমানদের উপর এতোটা ভরসা করা কি ঠিক হবে?"

"আপনি এখনও জানেন না, দাউদ আসলে মুসলমান নয়! আপনার তো কারামতীদের সম্পর্কে জানা নেই। ওরা আবার মুসলমান হলো কি করে? ওরা যত অপকর্ম করে তা তো কোন অমুসলমানও করে না। ওদেরকে ধর্মহীন বললে ভুল হবে না। ওরা নামমাত্র মুসলমান। আসলে ওরা চরম ইসলাম বিরোধী। তারপরও যদি দাউদ আমাদের সাথে কোন ধরনের প্রতারণা করে তবে তার পরিণতি হবে খুবই কঠিন। সে তো চতুর্দিকে আমাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রতারণা করলে ওর রাজ্য আমরা দখল করে ওকে হত্যা করব, না হয় জীবনের জন্যে জেলখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করব।

আপনি একথা মনে করবেন না যে, মাহমূদের সৈন্যরা এই মুহূর্তে আমাদের উপর হামলা করতে আসছে। মাহমূদ চাচ্ছে মুলতানকে ওদের সেনা ঘাঁটি বানাতে। মুলতানকে কেন্দ্র বানিয়ে মাহমূদ আপনার ও আমার এলাকা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিতে চাচ্ছে।

আমি দু'জন গোয়েন্দা পেশোয়ারে পাঠিয়েছি। যখনই মাহমূদের সৈন্যরা মুলতান থেকে রওয়ানা করবে তখনই ওরা দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে আমাকে আগাম খবর দিবে। আমি ঝটিকা বাহিনীকে পাহাড়ী এলাকায় পাঠাচ্ছি। যখনই মাহমূদের বাহিনী সংকীর্ণ পথে এসে ঢুকবে ওরা পাহাড়ের উপর থেকে তীরবৃষ্টি বর্ষণ করে ওদের নাস্তনাবুদ করে ছাড়বে। তাছাড়া ওরা মাহমূদের প্রত্যেক ছাউনীতে রাতের অন্ধকারে ঝটিকা আক্রমণ করে পালিয়ে আসবে। এভাবে

ক্রমাগত হামলার শিকার হয়ে ওদের অগ্রসর হতে হবে। মাহমূদের বাহিনী যদি মুলতান পৌঁছতে সক্ষমও হয় তবে তাকে অর্ধেক সৈন্য পথে হারাতে হবে। এরপর মাহমূদকে হত্যার ব্যবস্থাও করে রেখেছি আমি।"

দীর্ঘ সময় আনন্দ পাল ও বিজি রায় সুলতান মাহমূদকে চক্রান্তের বেড়াজালে আটকানোর কৌশল নিয়ে আলোচনা করল। জনকের তিনবার ধারাবাহিক পরাজয়ের কারণে আনন্দ পাল ছিল সুলতানের আনুগত্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সর্বশেষ যুদ্ধে জয়পালের পরাজয়ের পর মুক্তিপণ ও চুক্তির শর্ত অনুযায়ী জয়পাল সুলতানকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এখন থেকে আর কোনদিন তার সেনাবাহিনী সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করবে না এবং যুদ্ধ খরচ আদায় করা ছাড়াও বছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর সে সুলতানের কোষাগারে জমা দিবে। কিন্তু জয়পালের ছেলে আনন্দ পাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আত্মঘাতক বাবার প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করে চললো। সে জন্যে আনন্দ পালের মনে সুলতানের আক্রমণ আশংকা ছিল প্রবল। সে কিছুতেই সুলতানকে ঘাটাতে চাচ্ছিল না। কিন্তু সুলতানের বাহিনী এদিকে অগ্রসর হোক এটাও ছিল তার কাছে আতংকের ব্যাপার। আনন্দ পাল ভাবছিল, মাহমূদের বাহিনীকে ক্ষতি করতে গিয়ে বিজি রায় না আবার তার জন্যে বিপদ ডেকে আনে।

"ঝটিকা অভিযানের যে শক্তি মুসলিম সেনাদের রয়েছে, আমাদের সৈন্যদের তা নেই। ঝটিকা অভিযানের জন্যে সৈনিকদের মেধাবী, সাহসী, কৌশলী ও ত্যাগী হতে হয়। আমাদের সৈন্যদের মধ্যে এসবের অভাব আছে।" বলল আনন্দ পাল। "আপনি ঝটিকা বাহিনী পাঠান, তাতে আমার সমর্থন থাকবে কিন্তু আমার পক্ষে সরাসরি কোন সেনাবাহিনী পাঠানো সম্ভব নয়।"

"পেশোয়ার থেকে এদিকে আসতে হলে মাহমূদকে সিন্ধু নদ পেরিয়ে আসতে হবে। সিন্ধু নদের উপরে আমরা নৌকার যে পুল তৈরি করে রেখেছি ওখানে আমি ওদের ঠেকানোর ব্যবস্থা করব, যাতে তারা নদ পেরিয়ে আসতে না পারে। পুলের আশপাশে আমি সৈন্য মোতায়েন করব যাতে ওরা নদ পেরিয়ে আসার সুযোগ না পায়। তারপরও যদি ওরা নদ পার হতে সক্ষম হয় তাহলে ওদের পথ রোধ করার দায়িত্ব আপনার। আমাদের সবার চেষ্টা হওয়া উচিত, ওরা যদি এদিকে এসেই যায় তবে যেন আর জীবিত ফিরে যেতে না পারে।" বললো বিজি রায়।

ওদের ভাবনার চেয়েও দ্রুতগতিতে সুলতানের বাহিনী মুলতান অভিযানের প্রস্তুতি নেয়। সুলতান কারামাতীদের শিকড় উপড়ে ফেলার জন্য খুব দ্রুত অভিযানের নির্দেশ দিলেন। তার কাছে তখন রসদের কোন ঘাটতি ছিল না, তাই

প্রস্তুতি নিতেও তেমন ভাবতে হয়নি। সুলতান সেনাপ্রধান ও শীর্ষ কর্মকর্তাদের ডেকে তাদেরকে অভিযানের কৌশল বলে নিলেন। তিনি এও বলে দিলেন, "পথিমধ্যে যথাসম্ভব কম ছাউনী ফেলতে হবে। ছাউনী যেখানেই ফেলা হোক, রাতের পাহারা জোরদার রাখতে হবে। গুপ্ত হামলার শিকার থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ছাউনীর আশপাশে ঝটিকা বাহিনী নিযুক্ত রাখতে হবে। কেননা, মুলতান পর্যন্ত পৌঁছতে প্রতি ক্ষেত্রে গেরিলা আক্রমণের আশংকা রয়েছে। এই আশংকা থেকে বাহিনীকে নিরাপদ রাখার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।"

অগ্রণী দল নির্বাচনে সেনাপ্রধান আবু আব্দুল্লাহ্ আত্তায়ীকে নির্দেশ দিলেন সুলতান। বললেন, "এমনটা মনে করো না যে, অগ্রগামী দল পথ পরিষ্কার করে দিবে আর বাকী সৈন্যরা মানুষের ক্ষেতের ফসল, গাছের ফল আর আচার খেতে খেতে নির্বিঘ্নে মুলতান পৌঁছে যাবে। যেখানে আমরা যাচ্ছি, পথের প্রতিটি গাছ, প্রতিটি শস্যদানা, প্রতি ইঞ্চি মাটি আমাদের প্রতিপক্ষ। এ পথের প্রতিটি পাহাড়, টিলা ও ঝোপঝাড় আমাদের জন্যে মৃত্যুফাঁদ। অগ্রণী বাহিনীকে মেপে মেপে পা ফেলতে হবে। ঈগলের মতো সতর্ক দৃষ্টি আর হরিণের মতো সদা জাগ্রত থাকতে হবে। গতি হবে ক্ষীপ্র, লক্ষ্যভেদী। মনে রেখো, অগ্রণী দলকে প্রতিক্ষেত্রে প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হবে। প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত করে তাদের সামনে এগুতে হবে। মূল বাহিনীর প্রত্যেক সদস্যকেও সার্বক্ষণিকভাবে শত্রুর মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকতে হবে।"

সাধারণ কমান্ডাররা বুঝতেই পারছিল না, সুলতান এ অভিযানে অগ্রণী দলকে কেন এত সতর্ক থাকতে বলছেন। সবার অজানা থাকলেও কাসেম বিন আসেমের জানা ছিল সুলতানের সতর্কবাণীর মর্ম-রহস্য। জানা থাকার কারণে সুলতানের নির্দেশনার পর সে দাঁড়িয়ে বলল—

"সুলতানে আলী মাকাম! আমার প্রস্তাব যদি আপনার হুকুমের বরখেলাপ এবং আপনার সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপের অপরাধ হিসেবে বিবেচিত না হয় তবে আমার অনুরোধ, আমার ইউনিটকে অগ্রণী দলের দায়িত্বে দেয়া হোক।"

"তোমার কি নাম?" জিজ্ঞেস করলেন সুলতান।

"ওর নাম কাসেম বিন ওমর।" কাসেমের পরিবর্তে জবাব দিলেন সেনাপ্রধান আবু আব্দুল্লাহ। "সে আসেম ওমরের ছেলে।"

কাসেমের দিকে তাকিয়ে সুলতানের চেহারায় ভাবান্তর ঘটল। তিনি একটু নীরব থেকে বললেন, "অগ্রণী দল পরে নির্বাচন করা হবে, তুমি পাশের ঘরে বস, তোমার সাথে পরে কথা বলব।"

অভিযানের সময়, কৌশল ও প্রস্তুতির নির্দেশনা দিয়ে সবাইকে বিদায় করে দিলেন সুলতান। সেনাপ্রধান আবু আব্দুল্লাহ ও কাসেমকে ডেকে একান্ত বৈঠকে কাসেমকে জিজ্ঞেস করলেন—"তুমি অগ্রণী দলের দায়িত্ব নিতে আগ্রহী কেন?"

"এ অভিযানে পথে পথে যে সব কঠিন বিপদের মুখোমুখি সুলতানের বাহিনীকে হতে হবে তা সবই আমার পিতার তৈরি। তাই পিতার তৈরি বিপদের মোকাবেলা সবার আগে ছেলেরই করা উচিত বলে আমি মনে করি।" বলল কাসেম।

"মুহতারাম সুলতান! ওর আম্মা আমার কাছে এসেছিল। স্বামীর আত্মহত্যায় তার কোন অনুতাপ নেই। সুলতানের জন্যে তার স্বামীর এতো বড় বিপদাংশকা সৃষ্টির জন্যে সে অত্যন্ত দুঃখিত। সে আমাকে বলেছে, তার ছেলেকে সে আল্লাহ্‌র পথে কুরবান করতে চায়। তাকে যেন অগ্রণী বাহিনীতে সুযোগ দেয়া হয়, যাতে সে তার বাবার অপরাধের কাফফারা করার সুযোগ পায়।"

"তুমিও কি তোমার আম্মার মতো আত্মবিশ্বাসী, না তোমার পিতার মতো তুমিও বেঈমানদের শিকারে পরিণত হবে?" কাসেমকে জিজ্ঞেস করলেন সুলতান।

"শপথ করা ছাড়া আপনাকে আশ্বস্ত করার আর কোন উপায় আমার নেই—মহামান্য সুলতান! আমি প্রতিজ্ঞা করে বলতে পারি, মায়ের উদ্দীপনাই আমি ধারণ করি, পিতার দুর্বলতা নয়। সৈনিক হিসেবে আমি পিতার উত্তরসূরী। আমি আমার পিতাকে একজন বিচক্ষণ, সাহসী ও বুদ্ধিমান সেনাপতি হিসেবেই দেখেছি, শুনেছি, কিন্তু তার করুণ পরিণতি দেখার পর বেঈমানদের চক্রান্তের উচিত শিক্ষা দিতে আমি শপথ গ্রহণ করেছি।"

"তুমি হয়তো জানো না, তোমার মায়ের বুকে বেঈমানদের প্রতি কি আগ্নেয়গিরি জ্বলছে। যৌবনের শুরুতেই সে বেঈমানদের দ্বারা অপহৃত হয়ে হিন্দু নরপশুদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছে। তোমার মায়ের মতো তখনকার বহু তরুণীর সৌভাগ্য যে, হিন্দুরা পরাজিত হয়ে ওদের ফেলে চলে যায়। আমরা ওদের উদ্ধার করে সেনাবাহিনীর লোকদের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করে দেই।

কাসেম! তুমি তরুণ। তুমি হয়তো জান না, হিন্দুরা মুসলমান তরুণীদের সম্ভ্রমহানীকে ধর্মীয় দায়িত্ব মনে করে। অথচ মুসলমানরা নারীর মর্যাদা রক্ষা আর ইসলামের জন্যে জীবন দিতে কত আন্তরিক ও অকুণ্ঠ! একজন মুসলমান অমুসলিম নারীর সম্ভ্রমকেও পবিত্র আমানত মনে করে জীবন দিয়ে তার সম্ভ্রম রক্ষা করে। ইসলাম নারীর গায়ে হাত দেয়াকে কবীরা গুনাহ এবং শাস্তিযোগ্য

অপরাধ সাব্যস্ত করেছে, আর বেঈমানরা নারীর সম্ভ্রমহানীকে পুণ্যের কাজের মতো উৎসাহিত করে। কাসেম! বিশ্বের কোন মুসলিম তরুণী লাঞ্ছিত হলে সারা বিশ্বের মুসলিম তরুণদের ঘুম হারাম হয়ে যাওয়া উচিত। মুসলিম তরুণী লাঞ্ছিতের সংবাদে প্রতিশোধ স্পৃহায় বিশ্ব মুসলিমের ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত। তাই আমাদের মুসলিম বোনদের লাঞ্ছিতের প্রতিশোধ আমাদের নিতেই হবে। নরপশুদের কালো হাত ভেঙে গুড়িয়ে দিতে হবে। না হয় আমাদের সন্তানরা ওদের পাশবিকতা ও দন্ত-নখরাঘাতে বারবার রক্তাক্ত হবে।"

"প্রতিশোধ! কন্যা জায়াদের লাঞ্ছিত করার প্রতিশোধ!"

"আমি সেই প্রতিশোধ নিতেই প্রস্তুত। সুলতানে আলী মাকাম!"

"কাসেম! তারুণ্য এক ধরনের অন্ধত্ব।" বললেন সুলতান। "ছোট বেলায় আমি আমার শাইখ ও মুর্শিদের কাছে শুনেছি, মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতার চেয়ে নেক কাজ করার প্রবণতা বেশি শক্তিশালী। কিন্তু সেই প্রবণতা মানুষের ইচ্ছাধীন। মানুষ যদি নিজ ইচ্ছা শক্তিকে নেক কাজ করার প্রতি ধাবিত করে তখনই সে পাপ পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত থাকতে পারে। আহ্! তোমার পিতার মৃত্যু আমাকে অতটুকু কষ্ট দেয়নি, যতটুকু কষ্ট দিয়েছে তার নৈতিক অবনতি। সারা জীবনের জিহাদ, ইসলামের খেদমতে নিজের অবদানকে সে মুলতানের ক'দিনের রঙ তামাশা আর আমোদ-আয়েশে জলাঞ্জলি দিয়ে দিল। এখানে ফিরে এসেছিল সে শুধু শরীরটি নিয়ে; তার হৃদয়কে মুলতানের নাচঘরেই সে হত্যা করে এসেছিল। এই মাটির পাপ পঙ্কিল দেহের মায়া ত্যাগ কর কাসেম, রূহকে পঙ্কিলতা মুক্ত রাখতে চেষ্টা কর। আমার মুর্শিদ শাইখ আবুল হাসান খিরকানী বলেছেন, মানুষের হৃদয় বা আত্মা আল্লাহ্র পবিত্র আমানত। যে এ পবিত্র আমানতে কালিমা লিপ্ত করল, সে আল্লাহ্র আমানতে খেয়ানত করল। কাসেম! আত্মাকে পবিত্র রাখতে চেষ্টা কর! তোমার পিতা তার রূহকে নাপাক করে ফেলেছিল— যার ফলে একজন খ্যাতিমান কৃতি ব্যক্তিত্ব হওয়ার পরও তাকে অপমানজনক মৃত্যুবরণ করতে হলো। তার এই লজ্জাজনক পরিণতির জন্য আমার মনে খুবই কষ্ট কাসেম ...।

দেখো, মুলতানের সেই মেয়েটি পাপের সাগরে নিমজ্জিত থাকার পরও সে তার আত্মাকে নেক কাজে নিয়োজিত রেখেছিল। ইসলামের সেবায় নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিল। যার ফলে আল্লাহ্ তাকে পাপ-পঙ্কিল জগৎ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সে-ই তোমার পিতার অধঃপতন ও চক্রান্তে জড়ানোর কথা আমাকে অবহিত করেছে। দেখো! ইসলামের জন্যে নিবেদিতা এক অবলা

মহিলার দ্বারাও আল্লাহ্ তা'আলা কতো বড় কাজ নিতে পারেন। সে যদি আমাকে যথা সময়ে অবহিত না করতো, তবে না জানি আমাদের কতো কঠিন বিপদের মুখোমুখি হতে হতো। কাসেম! তুমি হয়তো আমাদের অভিযানের উদ্দেশ্য জানো! এটাও হয়তো বুঝতে পেরেছো, পথে পদে পদে কঠিন বাধা ডিঙাতে হবে।"

"আমাদের অভিযানের উদ্দেশ্য কি এবং পথিমধ্যে কি কি বিপদ হতে পারে তা আমি জানি সুলতানে আলী মাকাম। মেহেরবানী করে আপনি আমাকে অনুমতি দিন, যাতে আমি নিজের পছন্দমতো সহযোদ্ধা নির্বাচন করতে পারি। আশা করি, বেঈমান গুপ্তঘাতকরা আমাদের অগ্রযাত্রা রুখতে পারবে না।"

সুলতান মাহমূদ সেনাপ্রধান আবু আব্দুল্লাহকে বললেন, "কাসেমকে তার পছন্দমতো সহযোদ্ধা নির্বাচনের সুযোগ দিন।"

অগ্রগামী দলে নির্ভীক, সাহসী ও পারদর্শী পাঁচ'শ যোদ্ধা বেছে নিলো কাসেম। তারা পেশোয়ার থেকে সবার আগে রওয়ানা হলো। এই দলের অধিনায়ক কাসেম বিন ওমর। কাসেমের অশ্ব সবার আগে। তার পাশাপাশি অন্য একটি ঘোড়ায় আরোহী এক মহিলা। কাসেম জানতো, নিকাব পরিহিতা সহযাত্রী কে। বেশ কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর কাসেমের ঘোড়া থেমে গেল। থেমে গেল কাফেলা। কাসেম নিজ অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে নিকাব পরিহিতার মুখোমুখি হয়ে বললো, "এখন আমাকে আল্লাহ্র হাতে সোপর্দ করে দাও মা!" মহিলার কদমবুচি করে বলল কাসেম।

মাও ঘোড়া থেকে নেমে গেলেন। কাসেমের ডান বাহুতে তাবিজের মতো একটা ছোট্ট পুটলী বেঁধে বললেন— "এটা পবিত্র কুরআনের সেই আয়াত যার বরকতে সকল বাধা পায়ে দলে তোমরা মঞ্জিলে পৌঁছে যাবে সাফল্যের সাথে। শর্ত হলো, তোমার ঈমানদারীর উপর অবিচল থাকতে হবে। মানুষের শারীরিক সামর্থ অটুট রাখতে হলে ঈমানী শক্তি মজবুত থাকা অপরিহার্য। আলবিদা হে প্রিয় পুত্র! যদি তুমি জীবিত ফিরে এসো তাহলে খুশি হবো, তবে সবচেয়ে খুশি হবো যদি তোমার লাশ ফিরে আসে আর তোমার শাহাদাতের বিনিময়ে মুসলিম বাহিনী বিজয় লাভ করে।" এতটুকু বলার পর মায়ের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। আবেগে তার শরীর কাঁপতে শুরু করল। দু'চোখ বেয়ে নেমে এলো অশ্রুর অঝোর ধারা।

কাল বিলম্ব না করে কাসেম এক লাফে অশ্বপৃষ্ঠে উঠে বসে ঘোড়ার বাগে টান দিল। চলতে শুরু করল অগ্রগামী কাফেলা। অনেক দূরে গিয়ে পিছনে ফিরে

তাকাল কাসেম। একটি টিলার উপরে ছায়ার মতো অস্পষ্ট একজন অশ্বারোহী গোচরীভূত হলো। কাসেম অনুমান করল, তার মা হাত নাড়িয়ে তাকে আলবিদা জানাচ্ছেন। ঘোড়া সামনে চলতে লাগল। একটি উঁচু টিলা মা ও ছেলেকে অদৃশ্য করে দিল।

পেশোয়ারের এক বিশাল প্রান্তরে সেনাবাহিনীর সামনে এসে সুলতান মাহমূদ যখন দাঁড়ালেন তখন ভোরের অন্ধকার ভেদ করে পূর্বাকাশে সূর্য উঠছে। রসদপত্র বোঝাই করা দীর্ঘ সারি ধীরলয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সৈন্যরা সুলতানের নির্দেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

"মুজাহিদ ভাইয়েরা! আজ তোমরা আমার নির্দেশে নয়, আল্লাহ্র নির্দেশে অভিযানে বের হচ্ছো। তোমরা আজ এমন এক ভূখণ্ডে যাচ্ছো, যে ভূখণ্ড মুহম্মদ বিন কাসিম ও তাঁর সহযোদ্ধাদের আযানের ধ্বনিতে মুখরিত হয়েছিল। কিন্তু বেঈমানেরা এখন আর সে দেশে উচ্চকিত হতে দেয় না সুমধুর আযানের আওয়াজ। সেখানে আজ ইসলামের নাম নিশানা নিশ্চিহ্ন হওয়ার উপক্রম। মসজিদগুলো আজ পরিত্যক্ত। কাফের বেঈমানেরা অপবিত্র করছে আল্লাহ্র ইবাদতখানাগুলো, দুঃশাসন চলছে জালেমদের। তোমাদেরই বোন-কন্যাদের সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হচ্ছে সে দেশের ঘরে ঘরে। সেই নির্যাতিতা মা বোনেরা তোমাদের আগমন অপেক্ষায় অধীর নেত্রে তাকিয়ে রয়েছে।

পৃথিবীর কোন ভূখণ্ডে যদি একজন মুসলিম নারীও নির্যাতনের শিকার হয় তবে সেই নির্যাতিতাকে রক্ষা করার জন্যে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে জিহাদ করা সক্ষম প্রত্যেকটি মুসলমানের জন্যে অবশ্যকর্তব্য। পবিত্র কুরআন নির্দেশ দিয়েছে— 'বেঈমানদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও, যতক্ষণ না জুলুমের অবসান হয়।' পৌত্তলিক বাহিনী তোমাদের উপর তিনবার আক্রমণ করেছে, প্রত্যেকবার তোমরা তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছো। হিন্দু রাজারা তোমাদেরকে পদানত, পরাজিত করে ইসলামের শক্তিকে ধ্বংস করে দিতে বদ্ধপরিকর। আজ যে অভিযানে তোমরা যাচ্ছো, এটা মামুলী দু'টি বাহিনীর যুদ্ধ নয়, দু'টি চির প্রতিদ্বন্দ্বী আদর্শের সংঘাত।

ইসলামই একমাত্র সত্যধর্ম এবং মানবতার মুক্তির সনদ— এই অমোঘ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং পুনর্বার বেঈমানদের জানিয়ে দিতেই পরদেশে আজকের এই অভিযান। মুলতানের পথঘাট অপরিচিত হলেও তোমরা সেটিকে পরদেশ মনে করো না, ওখানকার মাটি মুসলমানদের বরণ করতে উন্মুখ। মুলতানের বৃক্ষ-তরুলতা, মুলতানের জমিন বিন কাসিমের জিহাদী চেতনায়

উজ্জীবিত, মুজাহিদ কাফেলার অশ্ব পদচারণায় ধন্য হতে উদগ্রীব। সেখানকার আলো-বাতাস, বৃক্ষ-তরুলতা পর্যন্ত তোমাদের অপেক্ষায় অধীর। তোমাদের স্বাগত জানাতে প্রতীক্ষায় রয়েছে মুলতানের প্রতি ইঞ্চি মাটি। মুলতানের আকাশ তোমাদের তকবীর ধ্বনিতে তৃপ্ত হওয়ার অপেক্ষায় ব্যাকুল।"

সুলতান মাহমূদের আবেগ আপ্লুত ভাষণ দীর্ঘতর হতে লাগল। কমান্ডার ও অধিনায়কদের যুদ্ধকৌশল ও করণীয় সম্পর্কে অফিসিয়াল নির্দেশনা তিনি আগেই দিয়েছিলেন। অভিযান শুরু হওয়ার আগে প্রতিটি সৈনিকের মনে এ প্রত্যয় তিনি জন্মানো জরুরী মনে করলেন যে, "তোমাদের এ যুদ্ধাভিযান দেশের ভৌগোলিক সীমানা বৃদ্ধির জন্য নয়, রাজত্ব প্রসারের উদ্দেশ্যে নয়, এটি জিহাদ। মজলুম মুসলমানদের মুক্তির জিহাদ, ইসলামী ভূখণ্ডকে পুনর্দখলের জিহাদ। মুসলমানদের হৃত গৌরব উদ্ধারের জিহাদ, মুছে দেয়া ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করার জিহাদ।"

সুলতানের আবেগঘন অগ্নিঝরা বক্তৃতায় সৈনিকদের মধ্যে মনোবল দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে উঠল। তাদের মধ্যে সৃষ্টি হলো বেঈমানদের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিশোধ স্পৃহা, আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল প্রত্যেক সৈনিকের বুকে। গোটা বাহিনী প্রচণ্ড আক্রোশে বেঈমানদেরকে তুলোর মতো উড়িয়ে দিতে উদ্যত, সবাই তীব্র গতিতে শত্রুর মুখোমুখি হতে অস্থির হয়ে উঠল।

ওদিকে কাসেম বিন ওমরের অগ্রগামী দল বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সিন্ধু নদপারের নৌকাগুলোর কাছে পৌঁছে গেল। কাসেমের সেনা ইউনিট যখন পুলের মাঝামাঝি পৌঁছাল তখন এক ঝাঁক তীর এসে তার ঘোড়ার সামনে নৌকার পাটাতনে বিদ্ধ হলো। কাসেম সকলকে সতর্ক হতে বললো। ইত্যবসরে অপরদিক থেকে আওয়াজ ভেসে এলো— "সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করবে না, তাহলে তোমাদেরকে তীরের আঘাতে চালুনী বানিয়ে ফেলব।"

"তোমরা কে আমাদের পথ রোধ করার?" উচ্চ আওয়াজে বলল কাসেম। "আমরা সুলতান মাহমূদের সৈনিক। রাজা আনন্দ পাল আমাদের রায়ত। এ পুল দিয়ে অতিক্রমে আমাদের কেউ বাধা দিতে চাইলে তার পরিণতি হবে খুবই ভয়াবহ।"

"মহারাজা আনন্দ পালের হুকুম। এ পুল পেরিয়ে কোন যবনকে এদিকে আসতে দেয়া হবে না। তোমরা ফিরে যাও।"

কাসেম খেয়াল করল, ওপারের কোল ঘেঁষে উঁচু টিলা, ঘন বনবীথি। টিলার উপরে মাত্র ক'জন লোককে কাসেম দেখতে পেল। তার আন্দাজ করতে অসুবিধা

হলো না, পুলের নিরাপত্তা ও মুসলিম বাহিনীকে রুখে দিতে আড়ালে আরো বহু সৈনিক লুকিয়ে রয়েছে।

মাত্র একজন সাথীকে নিয়ে দ্রুত গতিতে ওপারে পৌঁছে গেল কাসেম। টিলার উপরে দাঁড়ানো হিন্দু সৈনিক কাসেমকে ক্ষুব্ধকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল— "কেন তুমি পুল পেরিয়ে সেনাবাহিনী নিয়ে এদিকে আসতে চাচ্ছো?"

"আমরা কারো উপর আক্রমণ করতে আসিনি।" জবাব দিল কাসেম। "আক্রমণ ও যুদ্ধের প্রশ্নই এখানে অবান্তর। কেননা এ ভূখণ্ডের রাজা আমাদের করদাতা। আমরা শুভেচ্ছা সফরে এসেছি, আমাদের পুল পার হওয়ার সুযোগ দেয়া উচিত।"

"তোমাদের করদাতা রাজাই তো আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে, মুসলিম ফৌজ আসছে, ওদেরকে পুলের ওপর রুখে দিতে হবে।" বলল হিন্দু সৈনিক।

"তোমাদের রাজা তো এখানে থাকার কথা নয়। তিনি লাহোর বা বাটান্ডায় থাকার কথা।"

"মহারাজা এখান থেকে মাত্র সাত মাইল দূরে তাঁবু ফেলেছেন।" বলল হিন্দু সৈনিক। "যদি তার কাছ থেকে পুল পার হওয়ার অনুমতি নিতে চাও, তাহলে তোমার সুলতান নয়তো উজীরকে পাঠাও।"

"আমিই সুলতান আমিই উজীর। আমাকেই তোমার রাজার কাছে নিয়ে চলো।" বলল কাসেম। "আমি কিছুতেই ফিরে যাবো না। তুমি যদি আমাকে আড়ালে লুকিয়ে থাকা তীরন্দাজদের মাধ্যমে বাধা দিতে চাও, তবুও তোমার বাধা আমি মানবো না। আমরা পুল ছাড়াও নদী পেরিয়ে আসতে পারবো। তবে তোমাদের জন্য রাজার অন্যায় নির্দেশ পালন করতে গিয়ে জীবন বাজী রাখা ঠিক হবে না।"

হিন্দু সেনারা তাকে সাথে করে রওয়ানা হল। কাসেম চতুর্দিক গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে দেখতে পেল, টিলার আড়ালে বহু সৈন্য লুকিয়ে রয়েছে। টিলা অতিক্রম করে একটু অগ্রসর হতেই তার নযরে পড়ল রাজা আনন্দ পালের শিবির। কাসেম এলাকাটির ভৌগোলিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। কাসেমের বুঝতে অসুবিধা হলো না, রাজা আনন্দ পাল নিজে কেন সেনাবাহিনী নিয়ে শিবিরে অবস্থান করছে!

রাজা আনন্দ পালের শিবিরটি ছিল সবুজ শ্যামল ময়দানে। কাসেমকে একটি চৌকোণা উঁচু তাঁবুতে নিয়ে যাওয়া হলো। কয়েকটি কক্ষ পেরিয়ে যাওয়ার পর সে

দেখল, বিশাল একটি ঘরের মতো সাজানো গোছানো তাঁবুতে শাহী মসনদে রাজা আনন্দ পাল উপবিষ্ট। তার পিছনে দাঁড়িয়ে অনিন্দ্যসুন্দরী দু'তরুণী বাতাস করছে। রাজাকে আগেই অবহিত করা হয়েছিল, তার সাথে কে সাক্ষাৎ করতে আসছে। ফলে রাজার চেহারা ছিল ভাবগম্ভীর। তার চারদিকে রাজার শীর্ষ কর্মকর্তারা ও সেনাপতি দণ্ডায়মান।

"তোমাদের সুলতান কি নদী পার হতে চায়? তার এইদিকে আসার উদ্দেশ্য কি? কোথায় যেতে চায় সে?" কাসেমকে জিজ্ঞেস করল রাজা আনন্দ পাল।

"আপনি আমাদের করদাতা। এখনও পর্যন্ত আপনি চুক্তির শর্তানুযায়ী কর পরিশোধ করেননি। চুক্তি মতে আপনি আমাদের অধীন। অতএব সুলতান কেন নদী পেরিয়ে এদিকে আসতে চান একথা জিজ্ঞেস করার অধিকার আপনার আছে কি? তবুও আমি আপনাকে এ নিশ্চয়তা দিচ্ছি, সুলতান আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছেন না। আমরা নির্বিবাদে এইপথ অতিক্রম করার সুযোগ চাই।"

"তোমার ঔদ্ধত্যপনা ক্ষমা করে দিলাম। জেনে রাখো, আমি কারো করদাতা নই। তোমাদের সাথে চুক্তি করেছিল আমার পিতা, আমি কোন চুক্তি করিনি। তিনি মরে গেছেন। তোমাদের সুলতান আমাকে কখনও পরাজিত করেননি। কাজেই আমি কেন বাবার জরিমানা দিতে যাবো? তোমাদের সুলতানকে বলে দিও, সে কোথায় যেতে চায় তা আমরা জানি। আমরা কিছুতেই সুলতানকে মুলতানে সেনাঘাঁটি স্থাপন করতে দেবো না। পাহাড়ের ওপাশে কি ঘটছে তাও আমি জানি। এ মুহূর্তে তোমাদের সুলতান কোথায় আছে, তার সাথে কতো সৈন্য রয়েছে সবই আমি তোমাকে বলে দিতে পারব। তাকে ফিরে যেতে বলো। আমি তার অধীনতা অস্বীকার করছি। কেন তাকে কর দেবো? সে যদি একান্তই নদী পার হতে চায় তবে অনুমতির জন্যে তাকে আমার দরবারে আসতে বলো।"

"আমরা এমন অহংকারী কোন রাজার দরবারে সুলতানকে যেতে দেই না। আত্মহংকারে যে রাজা ঘাড় উঁচু করে রাখে আমাদের সুলতান তার নিকট আসার প্রয়োজনবোধ করেন না। তিনি যদি এখানে আসতেও চান তবুও তাঁকে আমি আসতে দেবো না।" বলল কাসেম।

"ভদ্রভাবে কথা বল। তুমি আমাদের রাজদরবারের অপমান করছো।" হুংকার দিয়ে বলল এক আমলা। সে রাজার দিকে প্রতিশোধ আজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাল। রাজা মুচকি হেসে বলল, "তুমি যেতে পার। তুমি তরুণ। এবার তোমার যৌবনের প্রতি দয়া করে ক্ষমা করে দিলাম। আর কখনও পুলে কদম

রাখার দুঃসাহস করো না। তোমাদের সুলতান যদি যুদ্ধ করার ইচ্ছায় এসে থাকে, তবে তাকে বলো, আমরা প্রস্তুতই রয়েছি, সাহস থাকলে সে পুল অতিক্রমের চেষ্টা করে দেখুক।'

"আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি।" ক্ষোভ চেপে ফেলল কাসেম। "ফিরে যাচ্ছি।"

কাসেম ফিরে গিয়ে আনন্দ পালের সেনাদের বাধা এবং সাক্ষাতের ঘটনা বিস্তারিত সুলতানকে জানাল।

"তোমার বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ কাসেম। তুমি চমৎকার কূটনৈতিক চাল দিয়েছো। ওকে এমনই একটা সংশয়ের মধ্যে ফেলা দরকার ছিল। দেখবে, আজ রাতেই আমি নদী পার হওয়ার ব্যবস্থা করব। তোমার অগ্রগামী ইউনিট পুলের কাছে অপেক্ষা করবে, আরেকটি অশ্বারোহী ইউনিট তোমার পিছনেই থাকবে সহযোগী হিসেবে। অন্য সৈন্যরা ভিন্ন পথে নদী পেরিয়ে আনন্দ পালের শিবিরে আক্রমণ শানাবে। তুমি আমার পয়গামের অপেক্ষা করবে। খবর পৌছার সাথে সাথে সহযোগীদের নিয়ে ঝড়ের বেগে পুল পেরিয়ে যাবে।

শত্রুবাহিনী তোমাদের মুখোমুখি থাকবে না— তোমাদেরকে ওরা পিছনে রাখবে তা বলা কঠিন। বুদ্ধি খাটিয়ে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করে কাজ করবে। এখন পুলের পিছনে চলে যাও। খেয়াল রাখবে, কোন বাহিনী যাতে তোমাদের অবস্থান নির্ণয় করতে না পারে।

আরেকটা বিষয়ের প্রতি গভীরভাবে খেয়াল রাখবে, কোন সাধু-সন্ন্যাসী কিংবা দরবেশ ধরনের মানুষ বা সৈনিক যদি পুল পার হয়ে তোমাদের দিকে আসে তাকে অবশ্যই বন্দী করবে। এ সময়ে অপরিচিত যে কোন ব্যক্তিই শত্রুচর হওয়ার আশংকাই বেশি।"

সুলতান মাহমূদ সেনাপ্রধান আবু আব্দুল্লাহকে জানালেন, "রাজা আনন্দপাল নদীর ওপারে সেনাবাহিনী নিয়ে অপেক্ষমাণ। সে আমাদেরকে নদী পার হতে বারণ করে দিয়েছে। মাছ শিকারীর বেশ ধরে এখনই নদী তীরের অবস্থা পর্যবেক্ষণে বেরিয়ে যান, নয়তো দূরদর্শী কোন কমান্ডারকে পাঠান। আজ রাতেই নদী পার হয়ে আনন্দ পালের শিবিরে আক্রমণ করতে হবে।" সুলতান মাহমূদ কাসেমের কাছ থেকে নদী তীরের পরিবেশ পরিস্থিতি এবং ভৌগোলিক প্রকৃতি জেনে নিয়েছিলেন, যাতে নদী পেরিয়ে ওপারে উঠে নিজেদের গতি নির্ণয় সহজ হয়।

অপর দিকে রাজা আনন্দ পাল সেনাবাহিনীর অর্ধেককে সিন্ধু নদের পুল পাহারায় নিযুক্ত করে, যাতে সুলতানের বাহিনীকে ওরা ওখানেই রুখে দিতে পারে। পুলটি ছিল কাবুল নদী ও সিন্ধুনদের মোহনা থেকে একটু উজানে। সুলতান মাহমূদ নদীর পরিস্থিতি জেনে আরেকটু উজানে অগ্রসর হয়ে সিন্ধু নদ পার হলেন। এখানে নদী ছিল চওড়া কিন্তু অগভীর। বেলা উঠার আগেই সুলতানের সকল সৈন্য নদী পেরিয়ে ওপারে পৌঁছে গেল। তখন এক হাজার ছয় খৃস্টাব্দের বসন্তকাল।

রাজা আনন্দ পাল ভাবতেও পারেনি, সুলতানের বিশাল বাহিনী পুল ছাড়াই এতো অল্প সময়ে নদী পার হয়ে যাবে। আনন্দ পাল শংকাহীন ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল। সুলতানের সরাসরি কমান্ডে যখন আনন্দ পালের শিবিরে আক্রমণ শুরু হয়ে গেল তখন তাদের পক্ষে প্রতিরোধ করার কোন সুযোগ নেই। আনন্দ পালের যে সৈন্যরা পুলের পাহারায় ছিল ওরা ছিল সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত। রাজার শিবিরে আক্রমণের সংবাদ পেয়ে ওরা প্রতিরোধে অগ্রসর হল। ইত্যবসরে বেলা উপরে উঠে এসেছে। এদিকে কাসেম সাথীদের নিয়ে সুলতানের পয়গামের জন্যে অধীর অপেক্ষায় রয়েছে। সে একটি উঁচু টিলার উপর থেকে ওপারের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্যে দু'জনকে নিয়োগ করে রাখল। যারা সুলতান ও আনন্দ পালের যুদ্ধ পরিস্থিতি দেখছিল। ওরা যখন দেখল, পুল পাহারায় নিয়োজিত রাজার বাহিনী পাহারা তুলে নিয়ে ময়দানের দিকে দৌড়াচ্ছে, তখন তারা কাসেমকে ইঙ্গিতে ব্যাপারটি বোঝাল। কাসেম সঙ্গীদেরকে ঝড়ের গতিতে পুল পার হওয়ার নির্দেশ দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে পুলের ওপারে পৌঁছে গেল। সবাইকে এক সাথে করে কাসেম আনন্দ পালের পুল প্রহরী বাহিনীর পিছন দিক থেকে তীব্র গতিতে আক্রমণ করল।

রাজা আনন্দ পাল প্রতি-আক্রমণের অবকাশই পেল না। পরিস্থিতি এমন হলো যে, রাজার পালানোই একমাত্র বিকল্প পথ। রাজা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল। তার সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে পড়ল। অধিকাংশকে সুলতানের বাহিনী বন্দী করল, কিছুসংখ্যক পালাতে সক্ষম হলো আর বাকীরা নিহত হলো। সুলতানের বাহিনী আনন্দ পালকে বর্তমান অজীরাবাদ পর্যন্ত তাড়া করেছিল। কিন্তু আনন্দ পাল গরীব মাঝিদের মোটা অংকের বখশিশ দিয়ে পাঞ্জাব নদী পার হয়ে প্রাণে বেঁচে যায়। ইতিহাসে এ যুদ্ধ 'সিন্ধু নদ' যুদ্ধ হিসেবে খ্যাত।

পশ্চাদ্ধাবনকারী সুলতানের সৈন্যরাও বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সুলতান দ্রুত দূত পাঠিয়ে বিক্ষিপ্ত সৈন্যদেরকে ঝিলাম নদীর পূর্বতীরে একত্রিত করেন।

অবশ্য শত্রু বাহিনীর পিছনে পশ্চাদ্ধাবনকারী মুসলিম সৈন্যদের একত্রিত ও সমগ্র বাহিনীকে পুনর্গঠিত করতে এক মাস সময় লেগে যায়।

সুলতান মাহমূদ সেনাধিনায়ক ও কমান্ডারদের বললেন, "আমরা বিজি রায়ের অবস্থান থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। এই মুহূর্তে বিজি রায়ের সাথে সংঘর্ষ এড়াতে চেষ্টা করা উচিত। আমাদের সৈন্যরা রণক্লান্ত। এছাড়া আমাদের আসবাব পত্র ও শত্রুবাহিনীর থেকে প্রাপ্ত বিপুল সম্পদও যুদ্ধাবস্থায় আগলে রাখা কষ্টকর হবে। এখন আমাদের লক্ষ্য দাউদ বিন নসর। আগে আস্তিনের কাল সাপটিকে খতম করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

এবার মুলতানের দাউদ বিন নসরের মসনদের দিকে যাত্রা করল সুলতানের বাহিনী। এবারও কাসেম বিন ওমরের ইউনিট অগ্রগামী। মুলতান যাত্রার তৃতীয় দিন। কাসেম বিন ওমর সবার আগে। তার পাশাপাশি দু'জন অশ্বারোহী আঞ্চলিক গাইড। হঠাৎ কাসেম চার পাঁচশ গজ দূরে একজন অশ্বারোহীকে দেখল। লোকটি ঘোড়া থামিয়ে কাসেমের বাহিনীকে পর্যবেক্ষণ করছিল। অগ্র পশ্চাৎ দেখে লোকটি দ্রুত একদিকে অশ্ব হাঁকালো।

অন্যরা ভাবলো, লোকটি হয়ত সৈন্যদলকে দেখে ভয়ে পালিয়েছে। কিন্তু কাসেম মনে করল, লোকটি বিজি রায়ের চর হতে পারে, সে বিজি রায়কে মুসলিম বাহিনী আগমনের আগাম সংবাদ দিতে দৌড়াচ্ছে। কাসেম গাইডকে জিজ্ঞেস করল, "এখান থেকে বেরা কত দূর এবং কোনদিকে?"

গাইড বললো, "বেরা বেশি দূরে নয়, ঐ লোকটি তো বেরার দিকেই ঘোড়া দৌড়াচ্ছে।"

কাসেম বিন ওমর দু'জন অশ্বারোহীকে সাথে নিয়ে পালায়নপর অশ্বারোহীর পশ্চাদ্ধাবন করল। লোকটি অনেক দূর চলে গেছে কিন্তু কাসেম ও সাথীদের ঘোড়াগুলো ছিল দ্রুতগামী। তারা দৌড়াচ্ছে। এক পর্যায়ে তাদের চোখে পড়ল বেরা দুর্গের উঁচু মিনার। পলায়নপর ও পশ্চাদ্ধাবনকারীদের মধ্যে ক্রমশ দূরত্ব কমে এলে কাসেম সাথীদের বলল— "তীর বের কর। ওকে জীবিত যেতে দেয়া যাবে না।" এক সাথী ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠে বসেই তীর চালাল। একটি তীর লোকটির পিঠে আর একটি তীর ঘোড়ার পশ্চাদ্দেশে বিদ্ধ হলো। এতে পলায়নকারীর ঘোড়ার গতি আরো বেড়ে গেল। কাসেমের সাথীরা আরো দু'টি তীর নিক্ষেপ করল, কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হল।

ইতিমধ্যে শহরের সীমানা প্রাচীর তাদের গোচরীভূত হলো। সীমানা প্রাচীর দুর্গের মতোই উঁচু। পলায়নপর অশ্বারোহী শহরের প্রবেশদ্বারে ঢুকে পড়লে কাসেম ও সাথীরা ঘোড়া ফিরিয়ে নিল।

বিজি রায় দরবারে উপবিষ্ট। তার প্রধান সেনাপতি তাকে রিপোর্ট শুনাচ্ছিল। গুপ্ত বাহিনী দেড় মাস হয়ে গেছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত তারা মাহমূদের কোন সৈনিকের দেখা পায়নি। বিজি রায়ের সামনে ছিল ষড়যন্ত্রের সেই নকশা যা দাউদ বিন নসর আসেম ওমরকে দিয়েছিল। বিজি রায় তাদের তৈরি পথে সুলতানের বাহিনীকে গুপ্ত আক্রমণে পর্যুদস্ত করার জন্যে বহু সংখ্যক ঝটিকা বাহিনী নিয়োগ করে রেখেছিল। আর প্রতিদিন আশা করতো, ঘুম থেকে উঠে সে শুনবে, তার গুপ্ত বাহিনীর হাতে মাহমূদের বাহিনী পর্যুদস্ত হতে শুরু করেছে। এরপর প্রতিদিন তাকে তার সৈন্যদের সাফল্য গাঁথার ফিরিস্তি জানানো হবে। কিন্তু দেড় মাস অতীত হয়ে গেল, সংবাদ তো দূরে থাক তার বাহিনী মুসলিম সৈন্যদের দেখাই পেল না। এটা ছিল বিজি রায়ের জন্যে এক চরম হতাশাজনক বিষয়।

"আচ্ছা, তাহলে মুসলিম বাহিনী গেল কোথায়?" ক্ষুব্ধকণ্ঠে সেনাপতির কাছে জানতে চাইল বিজি রায়। "পেশোয়ার থেকে খবর পাওয়া গেল, ওখান থেকে মাহমূদের বাহিনী রওয়ানা হয়ে গেছে; তাহলে ওরা গেল কোথায়? উধাও হয়ে গেল?"

"আমার মনে হয়, দাউদ আপনাকে ধোঁকা দিয়েছে, নয়তো সুলতান মাহমূদের দূত আপনাদের ধোঁকা দিয়েছে। মুসলমানকে বিশ্বাস করা আপনার ভুল হয়েছে মহারাজ!" বলল সেনাপতি।

এমন সময় বিজি রায়কে খবর দেয়া হল, এক সৈনিক পিঠে তীরবিদ্ধ হয়ে দুর্গে ফিরে এসেছে। বিজি রায় কিছু বলার আগেই তীরবিদ্ধ সৈনিক দরবারে প্রবেশ করল। তার পিঠে তখনও তীর বিদ্ধ, সারা শরীর রক্তাক্ত।

আহত সৈনিক বলল, "আমি পর্যবেক্ষণের এক পর্যায়ে সেনাবাহিনীর ছোট একটি ইউনিট দেখে ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে দাঁড়াই। ওরাও এগুতে থাকে। যখন বুঝতে পারি, ওরা সুলতান মাহমূদের সৈনিক, তখন ফিরে আসতে ঘোড়া দৌড়াই। কিন্তু ওদের দুই অশ্বারোহী আমার পিছনে অশ্ব হাঁকায়। ওরা পরপর কয়েকটি তীর ছুঁড়ে। একটি আমার পিঠে বিদ্ধ হয় আরেকটি আমার ঘোড়ার কোমরে আঘাত হানে। আমার বিশ্বাস, এরা মুসলিম বাহিনীর অগ্রগামী দল।"

"হ্যাঁ, ওরা সেই বাহিনীর অংশ যাদের জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি।" বলল বিজি রায়। সেনাপতিকে বিজি রায় বলল, "আমরা মাহমূদকে শহর ঘিরে ফেলার সুযোগ দেব না। ওরা দীর্ঘ ভ্রমণে ক্লান্ত। আমরা ওদেরকে শহর থেকে দূরে আমাদের সুবিধা মতো জায়গায় লড়তে বাধ্য করব। এক্ষুণি তোমরা শহর ছেড়ে বাইরে অবস্থান নাও।"

একটু পরেই বেজে উঠল যুদ্ধ নাকারা! বেরার সৈন্যদের মধ্যে রণপ্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। জঙ্গী হাতির চিৎকার, অশ্বের হ্রেষাধ্বনি আর সৈন্যদের শোরগোলে মুখর হয়ে উঠল বিজি রায়ের রাজধানী। একদল সৈন্যকে আগে পাঠিয়ে দেয়া হলো, মুসলিম বাহিনী কতদূর এসেছে তার খবর নিতে। একটু পরেই সংবাদ এলো, মাহমূদের সেনাবাহিনী শহর থেকে দশ মাইল দূর দিয়ে অতিক্রম করছে। বিজি রায় নির্দেশ দিল, আমাদের সেনাবাহিনীকে ওর পথ রোধ করে রণপ্রস্তুতিতে থাকতে হবে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিজি রায়ের সেনাবাহিনী শহর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। কাসেম বিন ওমর অগ্রগামী বাহিনীর পশ্চাতে প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহকে জানাল, "এক শত্রুসেনা আমাদের দেখে পালাতে ছিল, সে আমাদের তীরে আহতাবস্থায় শহরে ফিরে গেছে।" আবু আব্দুল্লাহ্ সাথে সাথে সুলতান মাহমূদকে খবরটি অবগত করালেন। সুলতান এ সংবাদ শুনে দারুণ বিমর্ষ হলেন। কিছুক্ষণ ভেবে তিনি রসদসামগ্রী বোঝাই কাফেলাকে ওখানেই থামিয়ে দিলেন। আসবাব পত্রের পাহারার জন্যে কিছু সৈন্যকে নিযুক্ত করে কাসেমকে বললেন, "বিজি রায়ের সৈন্যদের গতিবিধি দেখে আমাকে জানাও।"

শত্রু সৈন্যদের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে কাসেম সুলতানকে যে সংবাদ দিল তা মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়। বিজি রায় শহর থেকে চার পাঁচ মাইল দূরে সুলতানের গমন পথে রণ প্রস্তুতিতে রেখেছে গোটা সেনাবাহিনীকে। জায়গাও বেছে নিয়েছে তার সুবিধামত। হস্তিবাহিনীকে সে সবার আগে রেখেছে।

সুলতান হস্তিবাহিনীর দুর্বলতা জানতেন। হাতি আহত হলে স্বপক্ষের জন্যে কতটুকু বিপদ বয়ে আনে এর অভিজ্ঞতা তার যথেষ্ট। তিনি পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে তীর ধনুক ও বর্শাসজ্জিত পদাতিক বাহিনীকে হস্তিবাহিনীর মোকাবেলার জন্যে নির্দেশ দিলেন। কয়েকটি হাতি আহত হয়ে বিকট চিৎকারে উল্টোপথে দৌড়াল, কিন্তু ওদের পিছন দিকটা ছিল মুক্ত। আহত হাতি ওদের জন্যে কোন ক্ষতির কারণ হলো না।

সুলতান একটি উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি বিজি রায়ের রণকৌশলে বিস্মিত হলেন। এই প্রথম তিনি হাতির সফল ব্যবহার দেখে অবাক হলেন। সুলতান দেখলেন, তার পদাতিক বাহিনী হস্তিবাহিনীর মোকাবেলায় পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে। তিনি অশ্বারোহী বাহিনীকে ওদের সহযোগিতার জন্যে নির্দেশ দিলেন। এক হাজার অশ্বারোহী ইউনিট ওদের সমর্থনে ঝাঁপিয়ে পড়ল, কিন্তু বিজি রায়ের অশ্বারোহী বাহিনী সুলতানের

অশ্বারোহীদেরকে দু'দিক থেকে ঘিরে ফেলল। ফলে মুসলমান অশ্বারোহীরা পদাতিক সৈন্যদের সাহায্যে ওদের কাছেই যেতে পারল না।

হিন্দু সৈন্যরা প্রচণ্ড উদ্যম ও সাহসিকতার সাথে মুসলিম সৈনিকদের তাড়া করছিল, ওদের কমান্ডিং নির্দেশনাও ছিল নিপুণ। সুলতান মাহমূদ ওদের পিছন দিকে একটি ইউনিট পাঠালেন ওদিক থেকে আক্রমণ করতে কিন্তু ওরা পিছন দিকটাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছিল আগে থেকেই। যে মুসলিম সৈন্যদল পশ্চাৎ দিক থেকে আক্রমণ করতে গিয়েছিল হিন্দু সৈন্যরা ওদের ঘেরাও করে ফেলল। ওরা আক্রমণ তো করতেই পারেনি, নিজেদের প্রাণ রক্ষা করাই মুশকিল হয়ে পড়ল। এক পর্যায়ে হিন্দুবাহিনী মুসলিম সৈন্যদের বিরুদ্ধে হস্তিদল লেলিয়ে দিল। খুব কষ্টে বহু হতাহতের পর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে মুসলিম বাহিনীর একাংশ ওদের ঘেরাও থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলো। এভাবেই এদিনের বেলা অস্তমিত হলো। সুলতান প্রচণ্ড চাপের মধ্যে পড়ে ভাবছেন, কী করবেন।

আশু পরাজয় নয়তো পশ্চাদপসরণ ছাড়া সুলতান বিজয় লাভের কোন পথ খোলা দেখছেন না। সুলতান বহু দূর পথ ঘুরে বেরা শহরের কাছে গিয়ে দেখে নিলেন, রাজধানীতে আক্রমণ করে বিজি রায়ের মনোনিবেশ ময়দান থেকে ঘুরিয়ে দেয়া যায় কি-না। কিন্তু তারও কোন সুযোগ ছিল না। বিজি রায় শহর রক্ষায়ও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করে রেখেছিল। শহরের বাইরে অসংখ্য মোরচাবন্দী সৈনিককে সে নিযুক্ত করে রেখেছিল রাজধানীর নিরাপত্তা রক্ষায়। এদিকে সে রাতে সুলতানের রসদপত্রেও হিন্দুরা আক্রমণ করে বসল। এই প্রথম সুলতান দেখলেন, হিন্দুরা তারই কৌশল অবলম্বন করে তাকে বিপর্যস্ত করে তুলছে।

নির্ঘুম কাটল সারা রাত। সুলতান সবেমাত্র ফজরের নামায শেষ করলেন। তখন পদাতিক বাহিনী দিয়ে আক্রমণ চালানো হলো কিন্তু ফল হলো বিরূপ। মুসলিম সৈন্যরা যেটিকে শত্রুবাহিনীর বাহু মনে করেছিল আসলে সেটি বাহু ছিল না, ছিল ফাঁদ। সেই ফাঁদে পা দিয়েছিল সুলতানের পদাতিক সেনাদল।

পদাতিক বাহিনীর বিপর্যয়ে সেনাপ্রধান কাসেম বিন ওমরের অশ্বারোহী বাহিনীকে ওদের জায়গায় পাঠালেন। কাসেমের দল জীবন-মৃত্যুর লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। লাশের পর লাশ পড়লেও কাসেমের সাথীরা শত্রুর মোকাবেলায় পিছপা হলো না। তাজা রক্তে লাল হয়ে উঠল রণাঙ্গন। ময়দান জুড়ে সারি সারি মৃতদেহ। আহতদের আর্তচিৎকার ও জখমী সওয়ারের ক্রন্দনে পরিবেশ ভয়ংকর রূপ নিল, কিন্তু কোন পক্ষই মোকাবেলায় পিছুটান না দিয়ে হামলা আরো তীব্র করতে লাগল। তীব্র লড়াইয়ের মধ্যেই বেলা শেষে নেমে এলো সন্ধ্যা।

তৃতীয় দিনের শুরুতে সুলতানের সৈন্যসংখ্যা অর্ধেকে নেমে এসেছে। বাকী সবাই হয়তো নিহত না হয় আহত হয়ে পড়ল। রসদ সামগ্রীও নিঃশেষ প্রায়। তৃতীয় দিনের প্রাণপণ মুকাবেলায়ও লড়াইয়ের যবনিকাপাত না ঘটায় সুলতান হতোদ্যম হয়ে পড়লেন। তিনি একবার ভাবলেন, এভাবে সৈন্যদের মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়া অর্থহীন। কিন্তু তৃতীয় দিন মুসলিম সৈন্যরা আক্রমণ আরো শাণিত করল, তাদের আবেগ ও আক্রমণের তীব্রতা দেখে সুলতান সিদ্ধান্ত বদলে ফেললেন। তিনি তার দেহরক্ষী বাহিনীর উদ্দেশ্যে বললেন, "মুজাহিদ ভাইয়েরা! বিজয়ের জন্যে আমি আমার জীবনকে আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করলাম। এখন থেকে যুদ্ধের কমান্ড করব আমি স্বয়ং।" সুলতানের আবেগ ও অগ্নিঝরা বক্তৃতায় রিজার্ভ ও তার দেহরক্ষী সৈন্যদের খুন টগবগ করে উথলে উঠল। সৈন্যদের তাকবীর ধ্বনিতে বেরার আকাশ কেঁপে উঠল। রিজার্ভ বাহিনী নিয়ে সুলতান ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

মুসলিম বাহিনী সিংহের মতো গর্জে উঠল শত্রুর মোকাবিলায়। শত্রু বাহিনীও শেষ শক্তি ঝেড়ে ছিল প্রতিআক্রমণে। কিন্তু তখনও বিজি রায়ের বাহিনী ময়দানে অবিচল। এক পর্যায়ে সুলতান নিজের বাহিনীকে পশ্চাদপসারণ করে নিলেন। ঘোড়া থেকে নেমে দু'রাকাত নামায পড়লেন। নামায শেষ করে সালাম দিয়েই তিনি এক লাফে ঘোড়ায় চড়ে বসলেন। হাঁক দিলেন, "মুজাহিদ ভাইয়েরা! আল্লাহ্ আমাকে বিজয়ের ইশারা করেছেন। বন্ধুরা! এগিয়ে যাও। বেঈমানদের নিঃশেষ করো!" সুলতানের আহ্বানে স্তিমিত আগ্নেয়গিরির মতো জ্বলে উঠল মুসলিম বাহিনী। প্রচণ্ড আওয়াজে হায়দরী হুংকারে গর্জে উঠল মুসলিম বাহিনী। একই সাথে গগনবিদারী তকবীর তুলে লাফিয়ে পড়ল সকল অশ্বারোহী শত্রু নিধনে।

সুলতান যখন আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদাবনত, বিজি রায় তখন পণ্ডিতদের নিয়ে দেবীর পূজায় মগ্ন। মুসলমানদের অবিচল শক্তি আর পরাক্রম দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত বিজি রায় দেবীর চরণে পড়ে হাউ মাউ করে সাহায্য প্রার্থনা করছিল। বিজি রায়ের কাছে যখন পুনর্বার মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের খবর দেয়া হলো, তখন সে মূর্তির পা ধরে সাহায্যের জন্যে কান্নায় ভেঙে পড়ল। সে মূর্তির পায়ে চুমু খেয়ে বিজয়ের আশায় অগ্নিমূর্তি ধারণ করে ময়দানে হাজির হলো। এসেই সে শুনতে পেল গগনবিদারী কণ্ঠ— "মুজাহিদ ভাইয়েরা! বিজয় নয়তো শাহাদত। আল্লাহ্‌র সিপাহীগণ! এটা মূর্তিপূজক ও তাওহীদে বিশ্বাসীদের সংঘাত। মুজাহিদ ভাইয়েরা! আল্লাহ্‌র জমিন থেকে পালিয়ে যাবে কোথায়? বিজয় নয়তো শাহাদাত, সামনে এগিয়ে যাও!"

যুদ্ধের দৃশ্য এ মুহূর্তে বদলে গেল। মুসলমানরা এখন বেপরোয়া। তাদের সামনে একটাই লক্ষ্য, বিজয়। গোটা মুসলিম বাহিনীর মধ্যে একই জোশ, একই চেতনার প্রজ্জ্বলন। তাদের চোখ থেকে যেন আগুনের ফুলকি ঝরছে, তরবারী লাভা উদ্‌গিরণ করছে, যেন আগ্নেয়গিরি তার জ্বালামুখ খুলে দিয়েছে। আগুনের লাভা ছড়িয়ে পড়েছে গোটা ময়দানে। সুলতান নিজেই কমান্ড দিচ্ছেন। তাঁর তরবারীর আঘাতে সারি সারি মানবদেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। তিনি যেদিকেই যাচ্ছেন শত্রুবাহিনী কচুকাটার মতো সাফ হয়ে যাচ্ছে। প্রধান সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ্ দেখছেন, সুলতানের আবেগ অত্যুঙ্গে। তিনি সুলতানের নিরাপত্তার ব্যাপারটি সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিলেন। তার ডান-বামে-পিছনে ছোট তিনটি বিশেষ বাহিনীকে নিযুক্ত করলেন। নির্দেশ দিলেন, যে কোন মূল্যে তোমরা সুলতানের উপর আক্রমণ প্রতিহত করবে। আবু আব্দুল্লাহ্ দেখলেন, শত্রুবাহিনী এখন দিশেহারা। বিজি রায়ের বাহিনী রণক্লান্ত, ময়দানে লাশের স্তূপ জমে গেছে, সম্মুখ ভাগে মুসলিম বাহিনীর তীব্রতার কাছে শত্রু বাহিনী আক্রমণাত্মক নয়, এখন আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। তাই তিনি মুসলিম বাহিনীর দুই বাহুতে ও পশ্চাৎদিকে নিরাপত্তা বিধানের কঠোর নির্দেশ দিলেন। সেই সাথে দু'প্রান্তের মুজাহিদদের বললেন, "তোমরা আক্রমণ আরো তীব্র করো।"

দেখতে দেখতে যুদ্ধের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেল। বিজি রায়ের সম্মুখভাগের সেনাবল কমে এলো। বিজি রায় শহররক্ষীদের নির্দেশ দিল ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে। শহরের নিরাপত্তারক্ষীরা নিমিষে ময়দানে চলে এলো। এই প্রচণ্ড যুদ্ধাবস্থায় দিনমণি শেষ আলোর ঝলকানী দিয়ে আঁধারে হারিয়ে গেল। সুলতান শত্রুবাহিনীকে বিপর্যয়ের মুখোমুখি রেখে আক্রমণের ইতি টানলেন।

শহরের নিরাপত্তারক্ষীদের ময়দানে চলে আসার ব্যাপারটি বুঝতে পেরে আবু আব্দুল্লাহ্ রাতের আঁধারে ঝটিকা আক্রমণে রাজধানী তছনছ করে ফেললেন। শহরের প্রধান ফটক ভেঙে গুড়িয়ে দিলেন। দুর্গ প্রাচীরের কয়েক জায়গা ধসিয়ে দিলেন বিস্ফোরক ব্যবহার করে। পরদিন প্রত্যুষে আর কোথাও বিজি রায়ের পতাকা উড্ডীন দেখা গেল না। হিন্দু সৈন্যবাহিনী বিক্ষিপ্ত। বিজি রায়ের খোঁজ নেই। বহু খোঁজাখুঁজির পর অনেক দূরের এক মাঠে সৈন্য বেষ্টিত বিজি রায়কে একদল মুসলিম সৈন্য দেখতে পেয়ে ওদের দিকে ধাবিত হল। মোকাবিলা না করে বিজি রায়ের নিরাপত্তারক্ষীরা যে যেদিকে পারে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল। বিজি রায়কে ঘিরে ফেলল সুলতানের সিপাহীরা। তাকে আত্মসমর্পণ করে অস্ত্র ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিল দলপতি। কিন্তু বিজি রায় অস্ত্র না ফেলে নিজের তরবারী নিজের পেটে ঢুকিয়ে দিল।

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বিজয়ী বেশে সুলতান বিজি রায়ের রাজধানী বেরায় প্রবেশ করলেন। দু'শর চেয়ে বেশি প্রশিক্ষিত হাতি তাদের দখলে এলো। রাতের আঁধার নেমে এসেছে তখন। চতুর্দিকে বহু দূর পর্যন্ত লাশ আর লাশ। উভয় পক্ষের অধিকাংশ সৈন্য হয় মৃত নয়তো আহত। সারা ময়দান ও শহর জুড়ে আহত সৈন্যের আর্তচিৎকার, করুণ আর্তি আর আহত জন্তুর বিকট চেচামেচি। বহু মশাল জ্বালিয়ে মুজাহিদরা আহত সাথীদের খোঁজে বের হলেন। লাশের পর লাশের স্তূপ থেকে উদ্ধার করতে লাগলেন পড়ে থাকা সহযোদ্ধাদেরকে। লাশের স্তূপের মাঝে আহত কাসেম মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। প্রচণ্ড রক্তক্ষরণে সে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় মাঠে শোনা গেল একটি নারীকণ্ঠ। কাসেম...! কাসেম...! বেঁচে থাকলে আমার ডাকে সাড়া দাও! কাসেম...তুমি কামিয়াব, আমার আশা সফল হয়েছে আজ। আল্লাহ্ আমার দু'আ কবুল করেছেন...। কাসেম বলো, তুমি কি বেঁচে আছো...?

চার কুমারী দুর্গ

আজ থেকে হাজার বছর পূর্বে সেই রাতের চাঁদের আলোও ছিল রক্তিম। আকাশ ছিল ধূসর বিবর্ণ। সুলতান মাহমূদের সেনারা টানা তিন দিন মরণপণ যুদ্ধে যে রক্তনদী প্রবাহিত করেছিল এবং যে ধুলোবালি বেরার আকাশে উড়িয়ে ছিল তাতে সে আকাশ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল ধূলির আস্তরণে। চাঁদনী রাতের ফ্যাকাশে আলোয় যে পর্যন্ত দৃষ্টি যেতো, তাতে মৃতের লাশ, শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ আর আহত জখমী সৈন্য, ঘোড়া, উট আর হাতির মিলিত চিৎকারে পরিবেশ দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। রাতের নিস্তবদ্ধতা নয় সেদিনকার বেরা ছিল একটি ধ্বংসযজ্ঞের মূর্তিমান চিত্র। মাইলের পর মাইল জমিন মানুষের রক্তে লাল রং ধারণ করেছিল।

সেই জমিন আজকের পাকিস্তানের অংশ। বিজয়ী ভূখণ্ডটি বর্তমান পাকিস্তানের হলেও ওখানে শহীদ যোদ্ধাদের কারো ঠিকানা পাকিস্তানে ছিল না। তারা এসেছিল সুদূর গজনী হতে। গজনী থেকে এসে সেই মৃত্যুঞ্জয়ী সুলতানের সহযোদ্ধারা মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিজয়ভূমি উদ্ধার করেছিলেন পৌত্তলিক হায়েনাদের দখল থেকে। সেই বিরান মসজিদগুলো মুক্ত করেছিলেন শেরেকী চর্চার নাপাক গ্রাস থেকে। সাম্প্রদায়িক হিন্দুরা মসজিদগুলোকে পরিণত করেছিল মদালয় ও ঘোড়ার আস্তাবলে। মসজিদগুলো তারা আবার উচ্চকিত করেছিল এক

আল্লাহ্র জয়গানে, মসজিদে মসজিদে আবারো চালু করেছিল একত্ববাদের বিজয়ধ্বনি 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।'

অসংখ্য আহত মুসলিম যোদ্ধার কাতর আর্তি আর দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেও ছিল পৌত্তলিকদের পদানত করার শুকরিয়া। মৃত্যুপথযাত্রী মুজাহিদরা কষ্ট ভুলে গিয়ে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছিল ভয়ংকর শত্রুদের পরাজয়ে এবং সুলতানের শত্রুদেশে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করার সাফল্যে। অনেকের দেহ থেকে প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু তারা বাবারে মারে, মরে গেলাম বলে আহাজারী করেনি, তাদের মুখে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা, বিজয়ের জন্যে আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য প্রকাশে ধ্বনিত হলো, আলহামদুলিল্লাহ্।

সেই যোদ্ধারা ছিল অটল অবিচল ঈমানের অধিকারী, ইসলামী আকীদা-আমলে দৃঢ় বিশ্বাসী। তারা মাতৃভূমি ছেড়ে সুদূর মুলতানে এসেছিল, মুসলিম কন্যা জায়াদেরকে মুশরিক পাষণ্ডদের পাঞ্জা থেকে উদ্ধার করতে, যেসব মুশরিক-পশুরা মুসলিম মেয়েদেরকে দাসী বানিয়ে তাদের ইজ্জতের উপর পাশবিক উৎপীড়ন চালাচ্ছিল। তারা এসেছিল আল্লাহ্র পূজারীদের হৃত ইবাদতখানা আবার আল্লাহ্র দাসদের জন্যে মুক্ত করে দিতে।

এক সাগর রক্তের বিনিময়ে সেদিন পৌত্তলিক হায়েনাদের কবল থেকে গজনীর শার্দুলেরা নির্যাতিত মুসলিম অবলাদের মুক্ত করেছিল। যারা জীবিত ছিল তারা যুদ্ধের ক্লান্তি ভুলে গিয়ে রাতের অন্ধকারে মশাল হাতে সারা প্রান্তর খুঁজে ফিরছিল সাথীদের মৃতদেহ এবং বেঁচে থাকা আহত সহযোদ্ধাদের। শতশত মশাল রাতের অন্ধকার বিদীর্ণ করে ছড়িয়ে পড়েছিল বেরার মাঠে-প্রান্তরে। শত্রুসৈন্য আর আহত মুজাহিদের আর্তি, গগনবিদারী চিৎকারে সে রাতে যেন কেয়ামত নেমেছিল বেরার জমিনে। আহত উট, ঘোড়া আর হাতিদের বিচিত্র গোঙানী সৃষ্টি করেছিল এক ভয়ংকর পরিস্থিতির।

অগণিত মানুষের করুণ আর্তি আর অশ্ব হস্তির বিকট চিৎকারের মধ্যে মুজাহিদরা শুনতে পেল ক্ষীণ আওয়াজের এক নারীকণ্ঠ— কাসেম...! কাসেম...! জীবিত থাকলে সাড়া দাও। বড় অস্থির, দিগভ্রান্তের মতো দিগ্বিদিক দৌড়াচ্ছিল এক মশালবাহী। কখনো কোন আহতের মুখের কাছে মশালটি নিয়ে দেখছিল লোকটির চেহারা, হতাশ হয়ে আবার দৌড়াচ্ছিল মশাল উঁচু করে। তার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছিল কাসেম...! কাসেম...! আমার ডাকে সাড়া দাও! আমি তোমাকে খুঁজছি।

এই মৃত্যুপুরীতেই এক জায়গায় মারাত্মক আহতাবস্থায় পড়েছিল কাসেম। সারা শরীরে তার অসংখ্য ক্ষত। অত্যধিক রক্তক্ষরণে সে শক্তিশূন্য। মাথা তুলে দাঁড়ানো তো দূরের কথা, চোখ মেলে পৃথিবীটা দেখার শক্তিও তার নেই। হুঁশ জ্ঞান পুরোপুরি লোপ না পেলেও যুদ্ধের ভয়াবহতার কিছুই মনে নেই কাসেমের।

কাসেম...! কাসেম...! নারীকণ্ঠের এই মায়াবী আওয়াজ ইথারে ভাসতে ভাসতে তার কানেও ধ্বনিত হচ্ছিল। কিন্তু তখন এ জগতের চেয়ে পরকালের ভাবনায় তন্ময় ছিল কাসেমের হৃদয়। ভাবছিল, সে হয়তো তার বাবার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে পেরেছে নিজের জীবন এবং শরীরের সবটুকু রক্তের বিনিময়ে। তাই আকাশের হুরপরী ও ফেরেশতারা তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে মর্তজগতে এগিয়ে আসছে। তার মস্তিষ্কের পরতে পরতে এসব ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে।

এক পর্যায়ে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল কাসেম কাসেম আহ্বান। ধ্যান ভেঙে গেল কাসেমের। স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠল তার মায়ের অবয়ব। বাবার অপরাধের কথা মনে পড়ায় সে কুঁকড়ে উঠল। তার মনে পড়ল, মা তাকে বাবার তরবারী হাতে দিয়ে বলেছিলেন, "আমি তোমাকে আল্লাহ্‌র দুশমনদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করলাম, তোমাকে আমি মৃত অথবা দুশমনের তরবারী বিদ্ধ অবস্থায় দেখতে চাই। তবে মৃত্যুর আগে তুমি এ তরবারী দিয়ে কম করে হলেও শত দুশমন সংহার করবে। তবেই আমার হৃদয়ের যন্ত্রণা লাঘব হবে।"

তার স্মরণ হলো... সে তার বাবার তরবারী মাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিল, এ তরবারী আমাকে দিও না মা! এটি নাপাক হয়ে গেছে। এতে লেগে রয়েছে মদ নারীর নাপাক প্রভাব।

তার আরো মনে পড়ল, পেশোয়ার থেকে রওয়ানা হওয়ার পর অনেকখানি পথ এগিয়ে দিয়ে তার ডান হাতের বাহুতে একটি কুরআনের আয়াত সম্বলিত তাবীজ বেঁধে দিয়ে মা বলেছিলেন— "আল বিদা আমার কলিজার টুকরো! তুমি জীবিত ফিরে এলে খুশি হবো, কিন্তু তোমার লাশ যদি বিজয়ের সংবাদ নিয়ে আমার কাছে ফিরে আসে তবে আরো বেশি খুশি হবো।" কানে বাজল প্রধান সেনাধ্যক্ষ আবু আব্দুল্লাহ্‌কে মায়ের অনুরোধ— "আমি আমার একমাত্র ছেলেকে আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গ করে দিচ্ছি, তাকে তার বাবার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ দেয়ার বিনীত অনুরোধ করছি।"

তখনও কাসেমের ক্ষতস্থান দিয়ে অঝোর ধারায় খুন ঝরছে। এই স্মৃতিগুলো কাসেমের অনুভূতিকে জাগিয়ে দিল চরমভাবে। মায়ের প্রতিটি কথা তার কানে অনুরণিত হচ্ছে। আনচান করে উঠল কাসেমের আহত হৃদয়। হায়! কোথায়

আছি আমি! মায়ের কাঙ্ক্ষিত বিজয় কি অর্জিত হয়েছে? আমি কি বাবার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে পেরেছি? সুলতান কোথায়? কোথায় আছেন সেনাপতি আবু আব্দুল্লাহ্? আমার সাথীরা কেমন আছে? তারা সবাই গ্রেফতার হয়নি তো? সুলতান কি পশ্চাদপসরণ করেছেন? বেরা দুর্গকি দখলে এসেছে? আমার তরবারী মায়ের কাছে কে পৌছাবে? কে তাকে বলবে, তোমার ছেলে এই তরবারী দিয়ে শত নয় হাজারো দুশমনকে মৃত্যুর স্বাদ দেখিয়েছে। এতেও কি তোমার আত্মা শান্তি পাবে না? এমন হাজারো প্রশ্ন আহত কাসেমের কষ্ট আরো বাড়িয়ে তুলছে।

কাসেমের জানার উপায় ছিল না, সুলতান বিজয়ী হয়েছেন। এখন তিনি বিজি রায়ের রাজমহলে বসে অধিনায়ক ও কমান্ডারদের কাছ থেকে সর্বশেষ পরিস্থিতির রিপোর্ট নিচ্ছেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানে ব্যস্ত রয়েছেন। অপর দিকে বিজি রায় নিজের তরবারী দিয়েই আত্মহত্যা করেছে।

যুদ্ধের পরিণতি চিন্তায় তার মন অস্থির হয়ে উঠল। জখমের যন্ত্রণা ভুলে গেল সে। উঠে দাঁড়াতে চাইল। কিন্তু তার হাত-পায়ের একটিও অক্ষত নেই। তরবারী আর বর্শার আঘাতে কাসেমের সারা শরীর জর্জরিত। সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে ব্যথায় কুঁকিয়ে উঠল। উঃ! শব্দ বেরিয়ে এলো মুখ থেকে। বসে পড়ল কাসেম। কিন্তু না, বসে থাকাও সম্ভব হলো না তার। সুলতান, সেনাবাহিনী ও মায়ের আকাঙ্ক্ষা তার অসার দেহে শক্তির সঞ্চার করল। এবার মাটিতে ভর দিয়ে অনেক কষ্টে কোমর সোজা করে দাঁড়াল কাসেম। চারদিকটায় একবার চোখ বুলাল। দেখছে, অন্ধকারের মধ্যে ঘুরে ফিরছে অনেকগুলো মশাল। বিবর্ণ চাঁদের আলো। চাঁদ একটু পর পর ঢাকা পড়ে যাচ্ছে মেঘের আড়ালে। এরই মধ্যে আবার কানে ভেসে এলো সেই আহ্বান— কাসেম...! কাসেম...! তুমি কোথায়? পাশাপাশি শোনা গেল পুরুষের ভারী কণ্ঠ— "এই মহিলা হয়তো কাউকে খুঁজছে। ওকে কেউ নিয়ে যাও।"

"সে কাসেমের লাশ তালাশ করছে?" বলল একজন। "তাকে বল, আমরা আহত এবং মৃতদের তুলে নিচ্ছি। কে সে, তার পরিচয় নিও।"

লোকগুলো কথা বলছিল গজনীর ভাষায়। কাসেম তাদেরকে হাঁক দিয়ে তার অবস্থান জানান দিতে চাচ্ছিল, কিন্তু তার মুখের আওয়াজ সে নিজেই শুনতে পেল না। কঠিন যন্ত্রণা ও অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণে তার শরীরে সামান্য শক্তিও ছিল না। তাছাড়া ময়দান আহত যোদ্ধা ও সওয়ারীদের শোরগোলে মুখরিত। উচ্চ আওয়াজে কথা বলা ছাড়া আর কাউকে ডাকার উপায় ছিল না। মশালগুলো

কাসেমের কাছ থেকে বেশি দূরে ছিল না। কিন্তু মনে হচ্ছে এগুলো তার কাছে এখন যোজন যোজন দূরত্বের সমান। কাসেমের পক্ষে সম্ভব ছিল না এক কদম অগ্রসর হওয়া। পায়ের রগ কেটে যাওয়ার কারণে পা ফেলে সামনে যাওয়ার চেষ্টা করলে পড়ে গেল কাসেম। অনেক কষ্টে মাথা সোজা করে বসল। এমন সময় কানে ভেসে এলো পানি .... পানি ...।

আওয়াজ লক্ষ্য করে দেখল কাসেম, তার সামনেই কাতরাচ্ছে এক জখমী সৈনিক। কিন্তু গজনীর সৈনিক হলে তো সে 'পানি'র বদলে 'আব' বলতো। নিশ্চয়ই লোকটি মুলতানের। হিন্দু সৈনিক হবে। মায়ের মাতৃভাষা মুলতানী হওয়ার কারণে কাসেমও জানতো ভারতীয় হিন্দুরাই 'পানি' বলে। পানির কথা শুনে কাসেমের বুকের মধ্যে তৃষ্ণা হাহাকার করে উঠল। বুকটা যেন শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছে। কখন কোথায় পানি পান করেছিল মনেই নেই। সুলতানের মতো যুদ্ধের ভয়াবহতায় সেও ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে গিয়েছিল। তার স্মৃতিতে শুধুই যুদ্ধ এবং মায়ের কণ্ঠই ধ্বনিত হচ্ছিল। কাসেম ছিল অগ্রণী দলের কমান্ডার। সুলতান যখন যুদ্ধের কমান্ড নিজের দায়িত্বে নিয়ে বিজি রায়ের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানেন তখন কাসেম সুলতানের পাশেই মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তার সাথীদের অধিকাংশই শহীদ হয়েছিল মুখোমুখি যুদ্ধ করে। এক সময় কাসেম আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। এসব তার মনে নেই। তার শুধু মনে আছে, যুদ্ধ ক্রমশই তাদের প্রতিকূলে চলে যাচ্ছে, বিজয় ছিল তাদের কাছে সুদূর পরাহত।

তুমি কে দাদা, ভগবানের নামে আমাকে একটু পানি দাও, বলে তড়পাতে শুরু করল আহত লোকটি। ভগবানের নাম শুনে কাসেমের মৃত দেহেও যেন আগুন জ্বলে উঠল।

সে তার তরবারী বের করতে কোমরে হাত দিল। কিন্তু খাপ শূন্য। কখন তরবারী পড়ে গেছে মনে নেই। তরবারী না পেয়ে কোমর থেকে খঞ্জর বের করল কাসেম। ঠিক এ মুহূর্তে আহত লোকটি বলে উঠল, তুমি হয়তো মুসলমান!

হ্যাঁ, আমি মুসলমান!

কাসেম সামান্য সময় ভাবলো। খঞ্জর কোমরে গুজতে গুজতে বলল, মুসলমান কখনো তৃষ্ণার্ত দুশমনকে হত্যা করে না। তুমি তৃষ্ণার্ত। কিন্তু আমার কাছে পানি নেই। ভগবানের নামে তুমি পানি চেয়েছো। তোমার ভগবান আর পানি নিয়ে আসবে না। আমি তোমাকে পানি পান করাব। একটু অপেক্ষা কর। দেখি তোমার জন্যে পানি পাই কি-না।

কাসেম দাঁড়াতে চেষ্টা করল। কিন্তু পা নড়বড়ে। সে অতি কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে একটি লাশের পাশে গেল। লাশের কোমর থেকে পানির মশক খুলে হামাগুড়ি দিয়ে আহত লোকটির পাশে পৌছে বলল, হা কর।

লোকটি বলল, তুমি মুসলমান, তোমার হাতে আমি পানি পান করব না।

কাসেম অবাক হলো। এতো ঘৃণা ওদের মনে! মরার সময়ও লোকটি মুসলমানের হাতে পানি পান করতে রাজি হচ্ছে না! মুসলমানদের কত ঘৃণা করে এরা!

তাহলে তোমার ভগবানকে ডাক। ভগবান পানি নিয়ে আসে কিনা দেখ। আমরা আল্লাহ্‌র নামে যুদ্ধ করি। এজন্য যুদ্ধের সময় আমাদের কোন ক্ষুধা-তৃষ্ণা অনুভূত হয় না। তিনদিন ধরে আমরা ক্ষুধা-পিপাসা ভুলে যুদ্ধ করেছি, আমাদের কোন তৃষ্ণা নেই। আল্লাহ্ আমাদের বুক চির-প্রশান্তিতে ভরে দিয়েছেন।

এবার হিন্দু সৈন্যটি হাত বাড়িয়ে মশকটি ধরতে চেষ্টা করল, কাসেম মশকটি ওর মুখে ধরল, লোকটি এক নিঃশ্বাসে আধা মশক পানি গলাধঃকরণ করল।

যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছে, তুমি কি কিছু জান? লোকটিকে জিজ্ঞেস করল কাসেম।

আমি সাধারণ সৈনিক নই। দু'শ সৈনিকের কমান্ডার আমি। আমাদের রাজার মৃত্যুর পর আহত হয়েছি আমি।

আমাদের সুলতান কোথায়? বলতে পার?

সম্ভবত শহরে ...। শোন। মৃত্যুকালে তুমি আমাকে পানি পান করিয়েছো। আমি তো মরেই যাবো, তোমাকে একটা সত্যকথা বলে যাচ্ছি। আমাদের জাতিকে কখনও বিশ্বাস করো না। মুসলমানদের ধ্বংস করা আমাদের ধর্মের শিক্ষা। আমরা বহু মুসলমানকে ধোঁকা দিয়ে আমাদের অনুগত করে রেখেছি। আমাদের পণ্ডিতেরা সব সময় বলেন, মুসলমানরা আমাদের চিরশত্রু। ওদের শেষ করাই আমাদের ধর্ম। আমরা আমৃত্যু মুসলিম জাতির বিনাশে সব রকম চেষ্টা করে থাকি। এ যুদ্ধে আমাদের পরাজয় হলেও যুদ্ধ থেমে থাকবে না। যতোদিন দুনিয়াতে একটি হিন্দুও বেঁচে থাকবে, সে চেষ্টা করবে মুসলমানকে ধ্বংস করতে। এটা আমাদের ধর্ম, এটা আমাদের ধর্মের নির্দেশ।

হিন্দু সৈনিকের কথা শুনে কাসেমের চেতনা আরো জেগে উঠতে লাগল। কথা বলতে বলতে হিন্দু সৈনিকটির যবান আড়ষ্ট হয়ে গেল, কিছুক্ষণ পর ওর আওয়াজ থেমে গেল। একটা হেচকি দিয়ে অসার ও নীরব হয়ে গেল লোকটি।

সুলতান মাহমূদ যখন বিজয়ী বেশে বেরা শহরে প্রবেশ করেন, শহরের ছোট বড় আবাল-বৃদ্ধ সকল মুসলমান তাকে স্বাগত জানানোর জন্যে শহর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। সকলের মিলিত তকবীর ধ্বনিতে বেরার আকাশ পেয়েছিল নতুন আবহ। কেউ কেউ আনন্দের আতিশয্যে শুয়ে পড়েছিল সুলতানের ঘোড়ার সামনে। মুসলমানদের আনন্দে আবেগপ্রবণ হয়ে উঠলেন সুলতান। দীর্ঘদিন পর প্রাণ ফিরে পেয়েছে এখানকার মুসলমান জনসাধারণ। কিন্তু মুসলমানদের পাংশু চেহারা দেখে সুলতানের মন বিজয়ের আনন্দে নেচে উঠার বদলে বিষণ্নতায় ছেয়ে গেল। ওদিকে বেরার হিন্দুরা ছেলে-পেলে, স্ত্রী-সন্তান আর ঘাটুরী-পেটারা মাথায় নিয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল।

সুলতানের দৃষ্টি পড়ল ওদের উপর। গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। বললেন সেনাধিনায়কদের, "ফেরাও ওদের। কোথায় যাচ্ছে এরা। সন্ধ্যা নেমে এসেছে। রাতের অন্ধকারে বাড়িঘর ফেলে এরা কোথায় যেতে চাচ্ছে?" গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, "ঘোষণা করে দাও, আমরা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে শহরের কোন অধিবাসীকে তাড়াব না, কারো বাড়িঘর লুট করবো না, আগুন ধরাব না। কারো ইজ্জতের উপর আক্রমণ করবো না। ওদের জলদি ফেরাও...। বল, যারা শহরে আছে তারা যেন তাদের পরিচিতজনদের লাশ এনে সৎকার করে এবং আহতদের চিকিৎসা কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়। আহত সবাইকে ময়দান থেকে তুলে আনার মতো জনবল নেই আমাদের। তারা ইচ্ছে করলে এ কাজের জন্য মহিলাদেরকেও ময়দানে নিয়ে যেতে পারে।"

সুলতানের নির্দেশে শহরত্যাগী হিন্দুদের ফিরিয়ে আনা হল। যারা গমনদ্যোত ছিল তাদেরকে অভয় দেয়া হল। সুলতানের অভয়বাণী প্রচার করা হলো শহরের সর্বত্র। বলা হলো, শহরের বাসিন্দাদের সাথে সুলতানের কোন বিরোধ নেই, তাদের সাথে তার কোন সংঘাত নেই। বিরোধ-সংঘাত ছিল রাজার সাথে এবং সংঘাত হয়েছে রাজার সেনাবাহিনীর সাথে। সাধারণ নাগরিকরা সম্পূর্ণ দোষমুক্ত।

হিন্দু-মুসলমান সকলকে লাশ তুলে আনতে বলা হলো। মুসলমানরা সুলতানের সহযোদ্ধাদের মৃতদেহ ও আহতদের তুলে আনার জন্যে ময়দানের দিকে ধাবিত হলো। তাদের সেবা-শুশ্রূষা এবং চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে আসার জন্যে দলে দলে লোক মশাল হাতে বেড়িয়ে পড়ল।

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর শহরের প্রধান মন্দিরের বড় পণ্ডিত কয়েকজন সেবাদাসকে শহরে পাঠিয়ে বহু বিশ্বস্ত হিন্দুকে মন্দিরে ডাকাল। পণ্ডিতের সংবাদ

পেয়ে বহু সংখ্যক হিন্দু মন্দিরে জড়ো হল। আজ মন্দিরে শঙ্খ বাজছে না। ওদের চোখে আজ মূর্তিগুলোর চেহারা যেন ম্লান দেখাচ্ছে। সরস্বতীর চেহারায় হাসি থাকলেও তারা মনে করলো, পূজারীদের ব্যর্থতায় সে বিদ্রূপের হাসি হাসছে। সারা মন্দির জুড়ে নীরবতা। শোকের ছায়া।

বড় পণ্ডিত কোন শ্লোক না আওড়িয়ে গম্ভীরকণ্ঠে সমবেত পূজারীদের বলল, "আমাদের সেনাবাহিনী পরাজিত হয়েছে, রাজা মৃত্যুবরণ করেছে, কিন্তু আমরা এখনও জীবিত। পরাজয়ের প্রতিশোধ নেয়ার এক সুযোগ এসেছে। সুলতান আমাদেরকে শহরে থাকার অনুমতি দিয়েছে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তার বাহিনী আমাদেরকে হয়রানী করবে না। তারা আশ্বাসও দিয়েছে, কোন ধরনের লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটবে না, কারো উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করা হবে না।

তারা যদি শহর লুটের ইচ্ছা করতো, শহর ধ্বংস করতে চাইতো, তাহলে এতোক্ষণে সারা শহর জ্বলে উঠতো। আমরা এই সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগাতে পারি। পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারি। রাতের অন্ধকারে খুব সহজেই কাজটি সমাধা করতে পারি।

পণ্ডিত গম্ভীরকণ্ঠে বলল, "শহরের হিন্দু-মুসলমান নারী-পুরুষ সবাইকে নিজেদের নিহত আত্মীয়-স্বজনকে তুলে এনে সৎকার করতে এবং আহতদের সেবাকেন্দ্রে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।"

"তোমরা জলদি ময়দানে চলে যাও। সবাই মশাল সাথে নিবে, আর সাথে রাখবে খঞ্জর অথবা একটি ছোট্ট কুড়াল। মুসলমানরা বিজয়ী হলেও অর্ধেকের বেশি সৈন্য আহত হয়েছে। যেসব মুসলিম সৈন্য আহত অবস্থায় ময়দানে পড়ে আছে তারা যদি চিকিৎসা কেন্দ্রে এসে সুস্থ হয়ে ওঠে তবে ওরা আমাদের জন্যে বিপদ আরো বাড়াবে। শত শত মুসলিম যোদ্ধা ময়দানে আহত অবস্থায় পড়ে আছে। তোমরা ওদের দেখেই বুঝতে পারবে। ওদের মধ্যে যারা দাঁড়াতে পারে না তাদেরকে তোমরা কুড়ালের আঘাতে ওখানেই শেষ করে দেবে।"

"শহরের সব হিন্দুকে এ সংবাদ বলার দরকার নেই। বেশি বলাবলি করলে কোন সুবিধাভোগী আমাদের পরিকল্পনা ফাঁস করে দিতে পারে। নারী-পুরুষ সবাই যাও, সকাল পর্যন্ত যতো পারো শত্রুদের বধ করো। আমাদের দেশমাতা ও দেবীকে খুশি করতে হলে এ কাজ আমাদের করতেই হবে। যাও, যতো জলদি পারো সবাই কাজে লেগে যাও।"

কাসেম যে জায়গায় আহত হয়ে পড়েছিল সেখানটায় হতাহত লোক কম। আহতদের আহাজারীও নেই। তাই এখনো এদিকে উদ্ধারকারীদের কেউ আসেনি। এতোক্ষণ পর্যন্ত কাসেম... কাসেম... যে ডাক শোনা যাচ্ছিল তাও আর শোনা যাচ্ছে না। উদ্ধারকারীর আগমন আশা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছিল। নিজের জীবন নিয়ে কাসেমের ভাবনা ছিল না, তার প্রত্যাশা ছিল সে সুলতান ও সেনাপ্রধান আবু আব্দুল্লাহ্‌র সামনে হাজির হয়ে বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করবে, "আমার পিতার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি আমি করতে পেরেছি? তার মা'কে জানাবে, মা! তোমার আশা কি এখন পূর্ণ হয়েছে?"

দূরে দূরে অনেক মশাল ঘুরতে দেখছে কাসেম। কিন্তু সবাই ওদিকেই ব্যস্ত। তার এ দিকটায় কেউ আসছে না। হতাশায় কাসেমের শরীর অবশ হয়ে আসছিল। তার পক্ষে এক কদম অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। পা দুটোয় কোন শক্তি নেই। প্রচুর রক্তক্ষরণে শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

এমন সময় বড় দুটো মশালকে এদিকে আসতে দেখে আশ্বস্ত হলো কাসেম। মাথাটা উঁচু করে তাকিয়ে রইল মশাল দু'টোর দিকে। খুব কষ্ট করে মাথাটা সোজা করে বসল মশাল দু'টোর আসার অপেক্ষায়। আর ভাবল, এরা হয়তো আমাদেরই কেউ হবে। আবারো তার কানে ধ্বনিত হলো সেই ডাক... "কাসেম ...! কাসেম...! জীবিত থাকলে আমার ডাকে সাড়া দাও!"

হায়! কাসেমের যে সেই দরদী ডাকে সাড়া দেয়ার শক্তি নেই, শত ইচ্ছে থাকার পরও তার কণ্ঠ থেকে কোন আওয়াজ বেরুচ্ছে না। ঝুঁকে ঝুঁকে, জায়গায় জায়গায় থেমে থেমে মশাল দু'টো এগিয়ে আসছিল কাসেমের দিকে। স্পষ্ট বুঝতে পারছিল কাসেম, লোক দু'টো থেমে থেমে মরদেহ দেখছে। ভাবতে ভাবতে মশালধারী লোক দু'টো একে অন্যের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল কাসেমের সামনে। তাদের হাতে মশাল জ্বলছে।

লোক দু'টোর অনুচ্চ বাক্যালাপ শুনতে পেল কাসেম— একজন সাথীকে বলছে, "মুসলমান! সাংঘাতিক ঘাড় ত্যাড়া, আমাদের সহ্যই করতে পারে না...।"

"হ্যাঁ। আমি মুসলমান। খুব ক্ষীণকণ্ঠে জানাল কাসেম। আমাকে বিজয়ের সুসংবাদটি জানাতে পার! মনে হয় তোমরা এখানকার বাসিন্দা। তোমরা আমার ভাষা বলতে পার না জানি। কিন্তু আমি তোমাদের কথা বুঝতে পারি বলতেও পারি।"

এদের একজন অপরজনের দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপাত্মক হাসল। কোমর থেকে খঞ্জর বের করল একজন। ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল, "হ্যাঁ সুসংবাদটি তোমাকে আমি এই খঞ্জরের ফলা দিয়ে শুনিয়ে দিচ্ছি।"

কথা শেষ না করেই খঞ্জর চালাতে উদ্যত হলো লোকটি। কাসেম নিরুপায়। প্রত্যাঘাত তো দূরে থাক আত্মরক্ষার জন্যে একটু নড়ার শক্তিও তার নেই। কাসেমের জীবন ও মৃত্যুর মাঝে মাত্র মুহূর্তের ব্যবধান। কয়েক পলকের মধ্যেই কাসেমের বুকটা এফোড় ওফোড় হয়ে যেতো, যদি না খঞ্জরের আঘাত প্রতিহত হতো। যেই মশালধারীর খঞ্জর কাসেমের বুকে আঘাত হানতে নেমে আসছে— কোত্থেকে বিজলীর মতো একটি মশাল এসে আঘাত হানে ঘাতকের মুখে। একটা চিৎকার দিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে ঘাতক। তার চকচকে খঞ্জরটা ছিটকে পড়ে দূরে। মশালটিও পড়ে যায় ওর হাত থেকে।

এরা মৃতপ্রায় কাসেমকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। এর আগে তেরজন আহত মুজাহিদকে এরা হত্যা করে এসেছে। এদের চৌদ্দতম শিকার ছিল কাসেম। সামান্য দূর থেকে রাবেয়ার নিক্ষিপ্ত মশালের আঘাত উদ্যত খঞ্জরের আঘাত থেকে রক্ষা করেছে কাসেমকে। মশালের আলোয় কাসেম দেখতে পেল, মুখ থুবড়ে পতিত ঘাতকের মশালটি হাতে তুলে নিয়েছে রাবেয়া। সংহারী মূর্তি ধারণ করে মোকাবেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে রাবেয়া। এ সেই রাবেয়া। যে রাবেয়া ফেরারী হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসেম বিন ওমরের ফাঁদ ও দাউদ বিন নসরের চক্রান্ত সম্পর্কে আগাম সংবাদ দিয়েছিল সুলতানকে। এই সেই রাবেয়া যার সত্য সাক্ষ্যর কারণে আত্মহত্যা করেছে সেনাপতি আসেম। যার কারণে ধ্বংসের মুখোমুখি হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছেন সুলতান ও তার সেনাবাহিনী। পিতার সেই হন্তা, পুত্র কাসেমের জীবনদাত্রী হয়ে দেখা দিল যুদ্ধের ময়দানে।

এক ঘাতকের আঘাত থেকে রাবেয়ার নিক্ষিপ্ত মশালে বেঁচে গেল কাসেম। কিন্তু ঘাতক রয়ে গেছে আরেকজন। ওর সাথী রাবেয়ার উপস্থিতি দেখে কুড়াল উত্তোলন করল মোকাবেলার জন্যে। ঘাতক দেখল, এক যুবতী রুদ্রমূর্তি ধারণ করে মশাল হতে দাঁড়িয়ে। ওর হাতে কোন অস্ত্র নেই। কাসেম আহত। তার পক্ষে মোকাবেলা করা অসম্ভব। উপরন্তু রাবেয়া জীবনে কোনদিন খঞ্জর ধরেনি। হাতের মশালটি ছিল তার একমাত্র ভরসা। কাসেমের জীবন সংহারে উদ্যত ঘাতকের মুখের দিকে তাই হাতের মশালটিই ছুঁড়ে মেরেছিল। অব্যর্থ লক্ষ্য। মশালটি আঘাত হানে ঘাতকের মুখে। চোখ মুখ ঝলসে যায় ঘাতকের। দূরে

ছিটকে কুঁকাতে থাকে। ওর সাথী রাবেয়াকে দেখে ওকেই আগে বধ করতে আঘাত হানতে উদ্যত হলো। মশাল দিয়েই প্রতিরোধে লিপ্ত হলো রাবেয়া। অবস্থার আকস্মিকতায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় মুহূর্তে এক পায়ে দাঁড়িয়ে গেল কাসেম। তবে নড়তে পারল না এক কদমও। রাবেয়া আর ঘাতকের মধ্যে চলছে সংঘাত। কৌশলী যোদ্ধার মত হাতের মশাল দিয়ে প্রতিরোধ করছে রাবেয়া। মৃতপ্রায় কাসেম এই সঙ্গিন অবস্থা দেখে স্থির থাকতে পারল না। তার মৃতপ্রায় শরীরে জেগে উঠল মুজাহিদের সত্তা। কোমর থেকে সে বের করে নিল খঞ্জর। খ র হাতে নিয়ে সুযোগের অপেক্ষা করছিল। যেই না ঘাতক কাসেমের দিকে ফিরল, মশালের আলোতে দেখে ওর পেট বরাবর নিক্ষেপ করল খঞ্জর। লক্ষ্যভেদী নিশানা। খঞ্জরটি আমূল বিদ্ধ হলো দুশমনের পেটে। খঞ্জর বিদ্ধ হয়ে ঘুরে গেল বেঈমান। যেই ঘাতক পিঠ ফেরাল অমনি রাবেয়া মশাল ঠেকিয়ে দিল ওর কাপড়ে। জ্বলে উঠল ঘাতকের পরিধেয় বস্ত্র। চকিতে আবার এদিকে তাকাল দুশমন, অমনি আবার রাবেয়া ওর মুখে ঠেসে ধরল মশাল। বাঁচার জন্যে দিগ্বিদিক জ্বলন্ত কাপড় নিয়ে দৌড়াতে শুরু করল ঘাতক। কিছুদূর গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল।

দূরের উদ্ধারকারী লোকেরা যখন একটি মানুষকে জ্বলতে দেখল এবং শুনতে পেল আর্তচিৎকার, তখন তাদের একজন এদিকে দৌড়ে এল। তারা এসে দেখতে পেল রাবেয়া ও আহত কাসেমকে। আর অদূরে ছটফট করছে ঝলসে যাওয়া দু'বেঈমান। এরা ছিল গজনীর সেনাসদস্য। কাসেম ও রাবেয়া পূর্বাপর ঘটনা জানাল সৈন্যদের। ইতিবৃত্ত শুনে সৈন্যরা ঘাতকদের পাশে গেল। এদের একজনের অবস্থা করুণ। অপর ঘাতকের চোখ-মুখ ঝলসে গেছে, কথা বলার শক্তি আছে ওর। গজনীর উদ্ধারকারী দলের এক কমান্ডার ওর বুকে তরবারী রেখে ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল, "তোরা কারা? কোত্থেকে এসেছিস? বল, কেন ওকে হত্যা করতে চাচ্ছিলি? নইলে এই তরবারী তোর পেটে ঢুকিয়ে দেবো।"

বেঈমান ঘাতক মুজাহিদের হুংকারে সবই বলতে শুরু করল। বলল, "আমরা বড় পণ্ডিতের আজ্ঞাবহ। তার নির্দেশে আমরা মুসলমান আহতদের হত্যা করতে ময়দানে এসেছি। দু'জনে এর আগে তেরজনকে হত্যা করেছি, এ লোকটি ছিল আমাদের চৌদ্দতম শিকার।"

ভয়াবহ এই সংবাদ শুনে উদ্ধারকারী গযনী বাহিনীর লোকেরা ময়দানের সর্বত্র তল্লাশী শুরু করল। তারা এ ধরনের বহু ঘাতককে গ্রেফতার করল ময়দান

থেকে। তৎক্ষণাৎ হিন্দুদের বাধা দেয়া হল ময়দানে প্রবেশ করতে। বিদ্যুৎগতিতে বড় মন্দিরের প্রধান পণ্ডিতকে গ্রেফতার করা হল। কাসেম বিন ওমরকে নিয়ে আসা হল চিকিৎসা কেন্দ্রে।

* * *

গজনীর সেনাবাহিনী যখন পেশোয়ার থেকে মূলতানের পথে রওয়ানা হয় তখন কয়েকজন অধিনায়ক ও কমাণ্ডারের স্ত্রীও কাফেলার সাথে ছিলেন। রসদসামগ্রীর কাফেলার সাথে থাকতো তাদের বহনকারী পালকী। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের স্ত্রী ছাড়াও আরো কয়েকজন মহিলা ছিলেন সেই কাফেলায়। সেইসব অভিজাত মহিলাদের প্রধান কাজ ছিল সেবা ও অসুস্থ রোগীদের দেখাশোনা করা। অন্যান্য যুদ্ধে আহতদের সেবা যত্ন সৈনিকরাই করতো, কিন্তু এই যুদ্ধের গুরুত্ব ও সার্বিক পরিস্থিতি অনুধাবন করে মহিলাদের সঙ্গে আনা হলো, যাতে সৈনিক স্বল্পতায় আহতদের সেবার কাজে তারা সহযোগিতা করতে পারে।

"তোমার আম্মা শুরুতে আমাকে আসতে দিতে চাচ্ছিলেন না। তাঁর কাছেই আমাকে থাকতে বলেছিলেন।" ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ করায় কিছুটা সুস্থানুভব করার পর কাসেমের পাশে বসে বলছিল রাবেয়া। তবে তোমাদের রওয়ানা হওয়ার সময় তোমার আম্মা আমাকে বললেন, "এবারের অভিযানে কিছু সংখ্যক মহিলা সাথে যাওয়ার অনুমতি পেয়েছে। আমি তাকে অনুরোধ করলাম, 'আপনি আমাকেও কাফেলায় শরীক হওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।' জানি না তিনি কার সাথে বলে আমাকে কাফেলায় শরীক হওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন।"

"আমি তোমার মাকে বললাম, সুলতানের এক গাদ্দার সেনাধিনায়কের অপকর্ম ফাঁস করে দিয়ে আমি সুলতান ও সুলতানের সেনাবাহিনীকে ভয়ংকর পরাজয় থেকে বাঁচাতে সাহায্য করেছি। আপনি যদি এর পুরস্কার দিতে চান, তবে আমাকে যে করেই হোক যুদ্ধ কাফেলার সাথে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। আমার ভেতরে যে কষ্ট ও দুঃখের আগুন জ্বলছে তা সেই দিন নিভাতে পারবো, যেদিন সুলতান মুলতান জয় করবেন, আর আমি আমার বেঈমান বাপকে নিজের হাতে খুন করবো। দাউদ বিন নসরের পাপের প্রাসাদ নিজের হাতে আমি গুড়িয়ে দেবো, ওখানে কেয়ামত ঘটিয়ে ছাড়ব।

তোমার মা আমার কথা শুনে বললেন, বোন! আমার ভেতরেও তো আগুন কম নয়। যুদ্ধে যেতে আমারও ইচ্ছে করছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত হয়েছে, স্বামী ছাড়া কোন মহিলাকে কাফেলার সাথে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে না। কথা বলতে

বলতে তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছিল। তিনি বললেন, তুমি যাও, আমার একমাত্র ছেলে অগ্রণীদলের কমান্ডার হয়ে যাচ্ছে। আশা করি আমার ছেলে যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও পিছপা হবে না। ওর মাথা থেকে শরীর আলাদা না হওয়া পর্যন্ত ও মৃত্যুবরণ করবে না। আমি ওকে সাহস দিয়ে বলেছি, তুমি জীবিত আমার কাছে ফিরে এলে আমি খুশি হবো। কিন্তু তোমার জীবনের বিনিময়ে হলেও আমি যুদ্ধজয়ের সুসংবাদ চাই। বোন রাবেয়া! মুখে যাই বলি না কেন, আমি তো মা, যখন ভাবি রণাঙ্গনে পানি... পানি... করে আমার পুত্র মারা যাচ্ছে তখন হৃদয়টা ভেঙ্গেচুরে খান খান হয়ে যায়। তখন আর সাহস থাকে না। কিন্তু পুত্র কাসেম নয়, আমি একজন মুজাহিদের মা ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেই। মুজাহিদরা মরতেই যুদ্ধ করে, বাঁচতে নয়। বেঈমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মরণেই মুজাহিদের সফলতা। ভাবি, আমার উদর থেকে জন্ম নেয়া এ মুজাহিদ আমার নয়, এ আমার কোলে আল্লাহ্‌র আমানত মাত্র। আল্লাহ্ যখন ইচ্ছা করেন তখনই আমানত ফিরিয়ে নিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে আমার দুঃখ করা অনুচিত। তখন মনটা শান্ত হয়, দুঃখ কিছুটা লাঘব হয়।"

"তোমার আম্মা আমাকে হাত ধরে বললেন, রাবেয়া! তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও। আহতদের খুঁজতে গিয়ে সবার আগে তুমি আমার ছেলেকে খুঁজবে। ওর মুখে পানি দেবে। তুমি আমার প্রতিচ্ছবি হয়ে মায়ের ভূমিকা পালন করবে। রাবেয়া! তোমার কোন সন্তান নেই। সন্তানের মমতা দিয়ে ওর প্রতি যত্ন নিও তুমি। উপরে আল্লাহ্ আর নিচে তোমার কাছে আমি পুত্রকে সোপর্দ করলাম...।

কাসেম! তোমার আম্মা আমাকে এও বলেছিলেন— রাবেয়া! তোমার কাছে যদি এমন সংবাদ আসে, আমার ছেলে যুদ্ধক্ষেত্রে পিঠ দেখিয়েছে বা মোকাবেলা করা থেকে পালিয়ে ছিল, তাহলে তরবারী, বর্শা কিংবা খঞ্জর দিয়ে তুমিই ওকে খুন করে ফেলো। মনে করো, আমার স্বামী গাদ্দার ছিল ওর ঔরসজাত সন্তানও গাদ্দারই হয়েছে। গাদ্দারকে শেষ করেছো ওর বীজও শেষ করে দিবে। ও এমন করলে বাকী জীবনটা কোন পীর বুযুর্গের উঠোন ঝাড়ু দিয়ে কাটিয়ে দেবো।"

"আমার কার্যক্রম সম্পর্কে আপনি কোন তথ্য জানতে পেরেছেন?" রাবেয়াকে জিজ্ঞেস করল কাসেম।

"পেশোয়ার থেকে আসার পথে সিন্ধুনদ পার হওয়ার জন্য যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তখন আমি সেনাধ্যক্ষ আবু আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কাসেমের সংবাদ কি? তিনি বললেন, কাসেম দারুণ সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছে। আমি

তাকে বললাম, আমার আসার খবরটি যেন কাসেম জানতে না পারে। কেননা সে আমার আসার সংবাদ পেলে তার মন এদিকেও ঝুঁকতে পারে, তাতে যুদ্ধের মনোযোগ নষ্ট হবে।"

রাবেয়া আরো জানাল, "যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে রসদসামগ্রী বহরের সাথে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যুদ্ধে কি হচ্ছে এ সংবাদ আমরা পাচ্ছিলাম না। তিন দিন টানা যুদ্ধ চলল, আমাদের কাউকেই এদিকে আসতে দেয়া হলো না। একদিন খবর পেলাম, যুদ্ধের অবস্থা সঙ্গীন। হয়তো আমাদের পশ্চাদপসরণ করতে হতে পারে! একথা শুনে সব মহিলা লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হল। কারো কাছেই তোমার কোন সংবাদ আমি পাচ্ছিলাম না। আমরা সবাই নামায পড়ে বিজয়ের জন্যে দু'আরত ছিলাম। এমতাবস্থায় আজ দুপুরে আমাদের সংবাদ জানানো হলো, আমাদের বিজয় হয়েছে। কিন্তু আমাদের ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। হতাহতের সংখ্যাই বেশি। সারা ময়দান জুড়ে লাশ আর লাশ। জখমীদের তুলে আনার মতো পর্যাপ্ত লোকেরও অভাব। আমাদেরকে এখানকার চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেয়া হলো। ডাক্তাররা ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে দিতো, মহিলারা ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধতো, আহতদের ওষুধ খাওয়াতো, পানি পান করাতো।

একের পর এক আহত যোদ্ধাকে সেবাকেন্দ্রে আনা হচ্ছিল আর তাদের গায়ের রক্ত পরিষ্কার করে ক্ষতস্থানে ওষুধ দেয়া হচ্ছিল। অনেকের চেহারা পুরোটাই রক্তে মাখা ছিল, অধিকাংশই ছিল মরণাপন্ন, বেহুঁশ। কয়েকজন তো সেবাকেন্দ্রে এসে মারা গেছে। আমি আহতদের দেহ থেকে রক্ত পরিষ্কার করছিলাম। কাজের ফাঁকে চেতনাজ্ঞানসম্পন্ন অনেকের কাছে আমি জিজ্ঞেস করেছি তোমার কথা। অনেকেই অজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। মাত্র তিনজন তোমাকে দেখেছিল বলেছে কিন্তু সবাই এ কথাই বলেছে, 'তার দল যেদিকে গিয়েছিল ওইদিক থেকে খুব কম লোকই ফিরে এসেছে।'

বেলা ডুবে যাওয়ার পর তোমার দলের একজন আহতকে আমি পেয়েছি। সে আমাকে বলল, কাসেম বিন ওমর যদি এখনো এখানে না এসে থাকে তবে সে হয়তো মারা গেছে। আমার সামনেই কাসেম আহত হয়েছিল। লোকটি আরো বলল, সম্ভবত আমাদের ইউনিটের মধ্যে আমি একাই বেঁচে এসেছি। কাসেম ছিল আমাদের ইউনিট কমান্ডার। যুদ্ধের পরিস্থিতি এমন ছিল যে, যেন হিন্দুরা আমাদের খতম করেই নিঃশ্বাস নেবে। সুলতানের সরাসরি কমান্ডে যখন শেষ হামলার নির্দেশ হলো— তখন প্রধান সেনাপতি কাসেমকে বললেন, "কাসেম!

রাজার পতাকাটিকে গুড়িয়ে দিতে হবে।" তিনি আমাদেরকে রাজার রক্ষণভাগে আক্রমণ করতে নির্দেশ দিলেন। সেনাপ্রধান বললেন, কাসেম! রাজার ঝাণ্ডা গুড়িয়ে দিতে পারলে যা পুরস্কার চাইবে তাই দেয়া হবে। বিদায়ের সময় মনে হচ্ছিল, সেনাপ্রধান আমাদের শেষ বিদায় জানাচ্ছিলেন।"

আহত যোদ্ধা আরো বলল, 'শেষ পর্যায়ে কাসেম এতোই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিল যে, হয় সে রাজার ঝাণ্ডা গুড়িয়ে দেবে না হয় নিজেই শেষ হয়ে যাবে। আখেরী আক্রমণে আমরা ছিলাম বেপরোয়া। কাসেমের উদ্দীপনা আমাদের সবাইকে পাগল করে তুলেছিল। মৃত্যু আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। জীবন-পণ আঘাত হানলাম। রাজার ঝাণ্ডাকে আক্রমণ করে তছনছ করে দিলাম। কিন্তু ততক্ষণে আমাদের কেউ আর অশ্বপৃষ্ঠে বসে নেই, সবাইকে শত্রুসেনারা আহত করে ফেলেছিল। আমার বিশ্বাস, এখনও পর্যন্ত যদি তাকে এখানে না দেখা যায় তবে সে আর জীবিত নেই।'

এরপর আমি সেবাকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পথে একটি পড়ে থাকা মশাল উঠিয়ে হাতে নিলাম। ময়দানে এসে আমি হতবাক। কখনও রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখিনি। আর এখানকার মৃতদেহ দেখে মনে হলো যেন জঙ্গল কেটে অসংখ্য গাছ ফেলে রাখা হয়েছে। প্রতিটি লাশকেই আমি গভীরভাবে দেখছিলাম। প্রতিটি আহতের কুঁকানী শুনে দৌড়ে যেতাম। প্রত্যেকটি হিন্দু মরদেহ দেখে আমার মধ্যে প্রশান্তি আসতো কিন্তু মুসলমান যোদ্ধার মৃতদেহ দেখামাত্র চোখে পানি এসে পড়তো। এভাবে দেখতে দেখতে অনেক সময় চলে গেল। আহতদেরকে চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠানোর কাজ চলতে লাগল।

এক পর্যায়ে তোমাকে ডাকতে শুরু করলাম আমি। কেমন যেন হয়ে গেলাম। তোমার মায়ের আত্মা বুঝি আমার বুকে এসে ঢুকেছিল। সজোরে চিৎকার শুরু করে দিলাম তোমার নাম ধরে। উদ্ধারকারীদের অনেকেই বলল, 'আপনি ফিরে যান, এখানে কাসেমকে পাওয়া যাবে না।' কারো কথায় আমি স্বস্তি পেলাম না। সারা ময়দান দেখে দেখে এদিকে চলে এলাম যেখানে মরদেহ চোখে পড়ছে কম। তোমাকে না পেলে সারারাত তোমাকে খুঁজেই ফিরতাম। দিনের আলোতে তোমার লাশ উদ্ধার করে তবেই আমি ঘরে ফিরতাম।

যাকেই পেতাম তোমার কথা জিজ্ঞেস করতাম। এমন সময় দৃষ্টি পড়ল দু'টি মশালের দিকে। আমি ছিলাম ওদের পিছনে। আমি এগিয়ে গেলাম ধীরে ধীরে। ইচ্ছা ছিল ওদের কাছে তোমার কথা জিজ্ঞেস করব। কিন্তু কিছুটা দূরে থাকতেই মশালের আলোয় তোমার চেহারা চিনে ফেললাম আমি। তখন তুমি বসেছিলে।

আমি তোমাকে দেখলেও তুমি কেন আমাকে দেখতে পেলে না আমি বুঝতে পারছিলাম না।

ওদের পোশাক দেখেই বুঝতে পারছিলাম, এরা উদ্ধারকারী গজনীর সেনা নয় এবং মুসলমানও নয়। ওদের দেখে আমার কোন দুর্ঘটনার আশংকা হয়নি কিন্তু যখন দেখি, ওদের একজন তোমাকে মেরে ফেলতে তরবারী তুলেছে, কোন কিছু না ভেবে দৌড়ে এসে ওর মুখে মশাল দ্বারা আঘাত করলাম। কাসেম! এ আসলে আল্লাহ্‌র দারুণ মেহেরবানী। তোমার বেঁচে থাকাটা একটা বিস্ময়। তবে তোমাকে বেঁচে থাকতেই হবে, আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন। কারণ তোমার কাজ এখনও শেষ হয়নি।"

দাউদ বিন নসর বিজি রায়ের পরাজয় সংবাদ পেয়ে কারামতী প্রাসাদ ছেড়ে মুহাম্মদ বিন কাসেমের সময়ে নির্মিত একটি দুর্গে আশ্রয় নেয়। দুর্গের ভেতরে বিশাল প্রাসাদ। প্রাসাদের অভ্যন্তরে বহু কক্ষ। প্রহরী, গোলামখানা, আস্তাবল, বিরাট আঙিনা, শানবাঁধানো পুকুর, সজ্জিত বাগান— মোটামুটি একটি রাজপ্রাসাদ। এই দুর্গ সম্পর্কে জনশ্রুতি ছিল যে, মুহাম্মদ বিন কাসিমের পর যখন এলাকাটি হিন্দুরা দখল করে নেয় তখন অনেক শিশু ও নারীকে হত্যা করে এর একটি কক্ষে নিক্ষেপ করেছিল। এখন এই দুর্গটিতে জিন-ভূতের বসবাস— এ কথা ছিল সব লোকের মুখে মুখে। বিশেষ করে লোকেরা বলাবলি করতো, ওই বাড়িতে হিন্দু দখলদাররা চার কুমারীকে চরম নির্যাতন করে হত্যা করেছিল। দুর্গের ভেতরে নিহত চার কুমারীর কান্না এখনো নাকি শোনা যায়। শিশুদের দৌড় ঝাপ, খেলাধুলা চেচামেচি এবং কোলাহলরত মানুষের কথাও নাকি মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায়।

এই দুর্গ সম্পর্কে মানুষের মনে এতো ভীতি ছিল যে, কেউ এর ধারে-পাশে যেতো না। কেউ কেউ বলতো, তারা দুর্গের ছাদের উপরে আগুন জ্বলতে দেখেছে। দেখেছে ভূত-পেত্নীর ঝগড়া-ফ্যাসাদ। ওখানে এখনো নাকি মৃতদের হাড়গোড় পড়ে রয়েছে।

যেদিন সুলতান মাহমূদ বেরা জয় করেন সেদিন মুলতানের এই চার-কুমারী দুর্গে ছিল মেলা। মুলতানের শাসক দাউদ বিন নসর কারামাতীদের ধর্মীয় নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সে মানুষের কাছে নিজেকে আল্লাহ্‌র খাস লোক ও পয়গম্বর বলে পরিচয় দিতো এবং নানা অলৌকিক কীর্তি জাহের করে সরল ও অল্পশিক্ষিত মানুষকে কারামাতী মতাবলম্বী করতে সচেষ্ট ছিল। এ সময়ে দাউদ বিন নসরের ভক্তরা দেশ জুড়ে একথা প্রচার করল যে, মুসলমানদের

শাসক, কারামাতী ধর্মের নেতা, আল্লাহ্‌র ওলী দাউদ বিন নসর স্বীয় কারামাতীতে চার-কুমারী দুর্গের সকল জিন-ভূতকে বন্দী করে তার অনুগত বানিয়ে ফেলেছেন, যাতে এগুলো মানুষের কোন ক্ষতি করতে না পারে এবং মানুষ এই দুর্গের কাছে যেতে ভয় না পায়। দাউদের সাঙ্গ-পাঙ্গরা আরো প্রচার করল, চার-কুমারী দুর্গের জিন-ভূতেরা প্রতিদিনই একজন তাজা মানুষের রক্ত পান করতো, আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতে দাউদ নিজের কারামতী ও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এগুলোকে বন্দী করে রেখেছেন, যে কেউ ইচ্ছা করলে বন্দী জিন-পেত্নীদের দেখতে পারে।

সুলতান মাহ্মূদ বেরায় যে সময়ে নতুন সৈন্য ঘাটতি পূরণে ব্যস্ত এ সময়ে চার-কুমারী দুর্গে চলছে লোকমেলা।

এ আজব খবর শুনে দাউদের কারামতী দেখতে দলে দলে লোক সন্ধ্যার পরে চারকুমারী দুর্গে সমবেত হতে লাগল। দুর্গটিকে সাজানোও হলো নতুনরূপে। জায়গায় জায়গায় প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। দুর্গের প্রধান ফটক ও রাস্তার চারপাশে এমন তীব্র সুগন্ধী ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে, যারাই দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করছিল, দুনিয়া ভুলে মুগ্ধ বিমোহিত হচ্ছিল কিংবদন্তির দুর্গাভ্যন্তরের অবস্থা দেখে।

দুর্গের বহিরাঙ্গন অবিকল পূর্বের মতোই রেখে দেয়া হয়েছে। যেখানে দীর্ঘদিনের ময়লা আবর্জনা জমে ইঁদুর, মাকড়সা জাল বুনেছে, আর পলেস্তরা খসে খসে পড়ে গেছে। শুধু ভেতরের পরিবেশ আমূল বদলে বাড়ির উঠোনে বিশাল প্যান্ডেল টেনে রঙ-বেরঙের শামিয়ানা টাঙিয়ে রঙীন বাহারী বাতি জ্বালিয়ে এমন স্বপ্নিল পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে, সাধারণ মানুষ তা দেখে হতবাক।

প্যান্ডেলের মাঝখানে রাখা হয়েছে একটি বিরাট গালিচা। গালিচার উপর সিংহাসন। সিংহাসনটি মণি-মুক্তা হীরা জওহারে সজ্জিত। রঙীন আলোতে সিংহাসনের মণিমুক্তাগুলো তারার মতো ঝকমক করছিল। সাধারণ মানুষ অভূতপূর্ব এ দৃশ্য দেখে অপার বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে দাউদের অলৌকিক শক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠছিল।

দু'চার দিনের মধ্যে সারা মুলতানে ছড়িয়ে পড়ল দাউদের কারামতী। লোকমুখে প্রধান আলোচ্য বিষয় চার-কুমারীর দুর্গ।

মানুষ বলাবলি করছিল, হাজার বছর আগে নিহত চার কুমারীকে দাউদ আবার লোকের সামনে জীবিত করে এভাবে দেখিয়েছে যে, তারা বাতাসে উড়ে এসে আবার বাতাসে মিলিয়ে গেছে। দর্শকেরা নাকি কিশোরীদের আওয়াজ ও শিশুদের কথাও শুনেছে।

দাউদের কারামতী মুলতানবাসীর মধ্যে এমনই প্রভাব ফেলল যে, কোন কোন মসজিদের ইমাম জুমআর দিনের বক্তৃতায় পর্যন্ত দাউদের কারামাতী উল্লেখ করে বক্তৃতা করতে শুরু করে। তারা দাউদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। হিন্দুদের মন্দিরগুলোতে পণ্ডিতেরা দাউদের কারামতীকে সত্য বলে প্রচার করছে। হিন্দু পণ্ডিতরা শিষ্য-পূজারীদের বলছে, আসলে কারামতী ধর্মই আসল ইসলামী ধর্ম। মোল্লারা শুধু শুধু মানুষের মধ্যে নেক ও পাপের প্রাচীর সৃষ্টি করে ভোগান্তির মধ্যে ফেলেছে। এসব আসলে মিথ্যা। মানুষের জৈবিক চাহিদা সৃষ্টিকর্তার দেয়া। সে দুনিয়াতে তার ইচ্ছা ও সাধ্যমতো যা কিছু করার তাই করতে পারে। এতে কোন পাপবোধের কারণ নেই।

মুলতান শহরের সবচেয়ে ঘন-ঘিঞ্জি এলাকায় বসবাস মুসলমানদের। কারামাতীদের হাতে মুলতানের শাসনক্ষমতা চলে যাওয়ার পর থেকে হকপন্থী মুসলমানদের আর্থিক ও সামাজিক অবনতি ঘটে। চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বদিক থেকেই মুসলমানদের উপর নেমে আসে দুর্যোগ। যারা কারামাতীদের অনুসারী তারাই সরকারী সহযোগিতা ও আনুগত্যে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে।

ঘন বসতি মুসলিম এলাকায় অনুরূপ আরেকটি দুর্গসম বাড়িতে কিছু সংখ্যক খাঁটি মুসলিম পরিবার বাস করে। চার-কুমারী দুর্গে মেলা শুরু হওয়ার ক'দিন পর এই দুর্গসম বাড়িতে কয়েকজন লোক একটি পুরনো ঘরে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে আলোচনারত। তবে তাদের আলোচনার বিষয় দাউদের কারামতীর প্রশংসা নয়, দাউদের কারামতীর বিরূপতা। আলাপকারীদের একজন সেই বুযুর্গ যিনি রাবেয়াকে আসেম ওমরের চক্রান্ত ফাঁস করে দেয়ার জন্য দাউদের প্রাসাদ থেকে ফেরার হতে সাহায্য করেছিলেন।

"মুলতানের শাসনক্ষমতা কারামাতীদের হাতে। সর্বময় দণ্ডমুণ্ডের মালিক তারা। তাই আমরা প্রকাশ্যে একথা বলতে পারছি না, কারামাতী আসলে ইসলামী আদর্শ নয়, সম্পূর্ণ ইসলাম পরিপন্থী। ইসলাম মানুষকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে নেক কাজে উৎসাহিত করে। ইসলামের সম্পর্ক মানুষের আত্মার সাথে আর কারামাতী ধর্ম শরীর সর্বস্ব। কারামাতী মতে, মানুষ যথেচ্ছভাবে তাবৎ বিলাস-ব্যসন, জিনা-ব্যভিচার, মদ-নারী সম্ভোগ করতে পারে। কারামাতী মতে একজন সুন্দরী নারী ইচ্ছে করলে স্বামী ছাড়াও যে কোন পছন্দনীয় পুরুষের সঙ্গ লাভ করতে পারে, তাতে কোন বাধা নেই। সে তার শরীরের একচ্ছত্র মালিক। তার ইচ্ছায় বাধা দেয়ার এখতিয়ার কারো নেই। তাদের মতে, আল্লাহ্ মানুষকে

দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন দুনিয়ার স্বাদ উপভোগ করতে। এতে বিধি-নিষেধ থাকতে পারে না। আপনারা লক্ষ্য করেছেন— কারামাতীদের অনুসারী ঢলের মতো বাড়ছে। সাধারণ অজ্ঞ মানুষ এদের প্ররোচণায় আকৃষ্ট হয়ে ঈমান হারাতে শুরু করেছে।" বললেন একজন।

"মানুষ স্বভাবতই পাপকর্মের প্রতি দ্রুত আকৃষ্ট হয়।" বললেন সমবেতদের মধ্যে আলেম ব্যক্তি। "নেক কাজে দৈহিক কোন সুখ নেই। মানুষের আসল শক্তি আত্মা। আত্মা দেখা যায় না। আত্মার সুখ তারাই অনুভব করতে পারে যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত-বন্দেগী করে আত্মা পবিত্র রেখেছে। সাধারণত মানুষ এটা বুঝতে চায় না। আত্মা পাপকর্মে দুর্বল হয়ে যায়। আত্মা দুর্বল হয়ে গেলে শরীরও দুর্বল হয়ে পড়ে। বেশি পাপকর্ম করলে মানুষের আত্মা মরে যায়। জীবন শেষে মানুষ যখন মরে যায় তখন দেহটাকে মাটিতে দাফন করা হয় কিন্তু আত্মা কখনও মরে না, আত্মা আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির করা হয়।"

"আপনি যা বলছেন— তা এখানে উপস্থিত সবাই জানে। আমাদের মাথার উপর এখন যে মুসিবত চেপে বসেছে দয়া করে এ ব্যাপারে কথা বলুন!" বলল এক যুবক। "যেদিন থেকে চার-কুমারী দুর্গে দাউদ মেলা বসিয়ে জিন ও চারকুমারীর প্রেতাত্মাকে দেখাচ্ছে, সে দিনের পর থেকে দলে দলে মুসলমান দাউদের কারামাতী ধর্ম গ্রহণ করে ঈমান হারাচ্ছে। আমি একটি মসজিদে ইমামকে ওয়াজ করতে শুনেছি, কারামাতী ধর্ম সত্যধর্ম। কোন ভ্রান্ত মতাদর্শ যখন মসজিদে প্রভাব সৃষ্টি করে তখন সাধারণ মানুষ এটিকে সত্য বলেই গ্রহণ করতে শুরু করে।"

'আপিন কি জানেন, হিন্দু পণ্ডিতেরা মন্দিরে পূজারীদেরকে বলছে, কারামাতী ধর্ম সত্যিকার ইসলামী ধর্ম। মৌলভীদের ধর্ম সঠিক নয়।' বলল আরেক যুবক।

"ইমাম আর পণ্ডিত উভয়ে একই কথা বললেও কোন হিন্দুকে তুমি কারামাতী ধর্ম গ্রহণ করতে দেখবে না।" বললেন বুযুর্গ ব্যক্তি। "আমরা লোকদের একথা বলতে পারছি না যে, কারামাতী সম্পূর্ণ ভ্রান্ত একটি গোষ্ঠী। এই গোষ্ঠী খৃস্টানদের সৃষ্ট। মহাভারতে এরা হিন্দু ও খৃস্টানদের সহায়তায় মুসলমানদের ঈমানহারা করতে মিশনারী কাজ করছে। বেঈমানদের অন্যতম একটি নীল নক্‌শা হলো— ইসলামের মোড়কে মুসলমানদের ঈমানহারা করতে গুনাহ্‌র কাজে জড়িয়ে ফেলা। কারামাতীদেরকে রীতিমতো হিন্দুরা পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে, যাতে মুলতানের কারামাতীদেরকে মুসলিম বলে সাধারণ মুসলিমদের ধোঁকা দিতে পারে।

ভাইয়েরা! মুসলমানদের বিরুদ্ধে জঘন্য চক্রান্ত শুরু হয়েছে। চার-কুমারী দুর্গের কারামাতী মুলতানের অর্ধেক মুসলমানকেই ঈমানহারা করে ফেলেছে। এখন আমাদের চিন্তা করতে হবে, কি করে আমরা এই জঘন্য চক্রান্ত রুখতে পারব। এখনও পর্যন্ত আমাদের কারো স্বচক্ষে দেখা হয়নি, চার-কুমারী দুর্গে আসলে কি ঘটছে।"

"যারা দেখে এসেছে তারা বলেছে, প্রত্যেক রাতেই চারকুমারী ও শিশুদের নাকি জীবন্ত করে দেখানো হয়।" বললেন আলেম। শোনা যাচ্ছে, একটি ধোঁয়ার কুণ্ডলী থেকে নাকি মেয়েগুলো দৃশ্যমান হয় আবার ধোয়ার কুণ্ডলীতে হারিয়ে যায়। আমাদের কারও স্বচক্ষে ব্যাপারটি দেখে আসা উচিত। আমরা তো ওখানে যাচ্ছি না এসব আজগুবী ঘটনা আমাদের ধর্মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে।"

"এ মুহূর্তে আমাদের করণীয় কি, এটা নির্ধারণ করতেই আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি।" বলল এক যুবক। "ওখানে যদি কোন ধোঁকা প্রতারণা কিংবা জাদুটোনার ব্যাপার ঘটান হয়ে থাকে তবে কারামাতীদের রহস্য আমরা ফাঁস করে দেবো।" যুবক তার সমবয়সী যুবকদের ইঙ্গিত করে বলল, "আমরা ইসলামের জন্যে জীবন দিতে প্রস্তুত। ওখানে যদি আমাদের কোন সংঘাতের মুখোমুখি হতে হয় তবুও আমাদের ভয় নেই। আপনি আলেম-জ্ঞানী। আপনি আমাদের করণীয় কি সে সম্পর্কে সঠিক নির্দেশনা দিন।"

"বাবারা! মনোযোগ দিয়ে শোন!" বললেন আলেম। "কারামাতী গোষ্ঠী কাফেরদের সৃষ্ট। ওদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য তোমরা জান। চিন্তার ব্যাপার হলো— ধর্ম অনেক সময় মানুষকে দুর্বল করে দেয়। মুসলমানরা ধর্মের জন্যে জীবন বাজী রাখতে দ্বিধা করে না, আমাদের শত্রুরা তা ভালভাবে জানে বলেই ধর্মের অস্ত্র ব্যবহার করেই আমাদের ঘায়েল করতে তৎপর।"

"দাউদ ক্ষমতালিপ্সু। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্যে সে ধর্মের লেবাস পরেছে। ধর্মের লেবেল এঁটেই দাউদ নিজের ক্ষমতা শক্ত করার কাজে লিপ্ত। লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে, আমাদের ধর্মের লোকেরা জাতিগতভাবে যতো প্রতারণার শিকার হয়েছে সবগুলো ধর্মের আবরণেই হয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ তো আর এখন নেই। তারা নিজেরা যেমন খাঁটি ছিলেন লোকদেরকেও খাঁটি ধর্মকর্ম পালনে বাধ্য করতেন। বর্তমান শাসকরা ধর্মের আবরণে নিজেদের খেলাফত টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট। এরা ধর্মকে মোড়কের মতো ব্যবহার করে অশিক্ষিত লোকদের সমর্থক বানাচ্ছে। সাধারণ লোকদের এদের ধোঁকা বুঝতে অনেক দেরী হয়। আর যখন বুঝে তখন আর করার কিছু

থাকে না। কেউ যদি এদের ধোঁকার মোকাবেলায় সঠিক কথা বলে তাকে ক্ষমতার শক্তি-বলে নিঃশেষ করে দেয়া হয়।

দাউদ বিন নসর যে মুসলমান নয় এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দাউদ যে ইসলামের ক্ষতি করছে, খৃস্টান ও হিন্দুদের সাথে মিলে মুসলমানদের ধ্বংস করতে শুরু করেছে— প্রকাশ্যে একথা আমাদের বলা যেমন ঝুঁকিপূর্ণ ওর বিরুদ্ধে মোকাবেলায় যাওয়াও কঠিন ব্যাপার। ওর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে না আমরা কিছু করতে পারছি না, আর আমরা সত্য কথা বলতে পারছি। এজন্য আমাদেরকে গোপন তৎপরতা চালাতে হবে।" বলল সেই অগ্রসর যুবক।

"হ্যাঁ। আজ রাতেই আমরা চার-কুমারী দুর্গে যাব।" বললেন দরবেশ। "সরেজমিনে পরিস্থিতিটা দেখে এসে তারপর আমরা ঠিক করব পরবর্তী কর্তব্য।"

সন্ধ্যার পর দুর্গের জনারণ্যে প্রবেশ করল বুযুর্গ ও তাঁর সাথীরা। দুর্গাভ্যন্তরের পরিবেশ দেখে সবাই অবাক। দর্শকদের আগ্রহ, মুগ্ধতা দেখে তাদের বিস্ময় আরো বেড়ে গেল। দর্শকরা দুর্গের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ঘরবাড়িগুলো দেখছিল। বুযুর্গের সাথে ছিল নয়জনের একটি তরুণ দল। তন্মধ্যে দু'জনের বয়স ছিল সতেরো আঠারো। তারা এটা সেটা দেখতে দেখতে এমন এক জায়গায় এসে থামল সেখান থেকে আর সামনে কাউকে যেতে দেয়া হয় না। একজন প্রহরী দর্শকদেরকে সামনে অগ্রসর হতে না দিয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছিল। বুযুর্গ ও তাঁর সাথীরাও এখানে এসে থেমে গেল। সামনে এগুতে চাইলে বাধা দিল প্রহরী। বুযুর্গ প্রহরীকে জিজ্ঞেস করল, সামনে কি? প্রহরী জবাব না দিয়ে রাগতস্বরে বুযুর্গকে ফিরে যেতে বলল। ইত্যবসরে প্রহরীর দৃষ্টি অন্য দিকে চলে গেল আর ফাঁক বুঝে প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন বুযুর্গ। জায়গাটি ছিল আলো আঁধারী। তাই প্রহরী বুযুর্গের অনুপ্রবেশ ঠাহর করতে পারল না। বুযুর্গ প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে সাথীদের ইশারা করলেন ওখান থেকে চলে যেতে। সাথীরা ওখান থেকে ফিরে গিয়ে মঞ্চের চারপাশে জড়ো হওয়া মানুষের ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

অন্ধকার গলিপথে যেতে যেতে বুযুর্গ একটি ঘরের মধ্য থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে দেখলেন। তিনি দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলেন, ভেতরের ঘরটি খুব সাজানো, মেঝের মধ্যে সুদৃশ্য গালিচা বিছানো। গালিচার উপরে বালিশ। রঙ বেরঙের ঝাড়বাতি জ্বালানো। অর্ধনগ্ন পাঁচ ছয়টি সুন্দরী তরুণী উচ্ছল নৃত্যরত। বালিশে ঠেক দিয়ে দুই সুদর্শন পুরুষ রাজকীয় ভঙ্গিতে বসা। তাদের সামনে

পানপাত্র। তারা থাবা দিয়ে নৃত্যরত একেকটি তরুণীকে ধরে নিজের কোলে টেনে নিয়ে ওকে উলঙ্গ করে নানাভাবে মজা করছে আর অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ছে।

এ দৃশ্য দেখে বুযুর্গ আরো সামনে অগ্রসর হলেন। সামনে পেলেন দরজা খোলা একটি কামরা। ভেতরে বাতি জ্বলছে, কোন লোক নেই। ভেতরে ঢুকে পড়লেন বুযুর্গ। দেখলেন এককোণে একটি সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে। বুযুর্গ ভাবলেন, এটা হয়তো কোন সুড়ঙ্গ পথ নয়তো কোন গুদাম ঘরের সিঁড়ি। সিঁড়ি ভেঙে সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন বুযুর্গ। আশ্চর্য! বাড়ির কোথাও কোন মেরামতের কাজ না হলেও এ সিঁড়িটি ছিল নতুন এবং সুড়ঙ্গ পথটি ছিল যথেষ্ট প্রশস্ত। একজন জোয়ান মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে পারতো। বুযুর্গ সুড়ঙ্গ পথে এগুতে থাকলেন, সুড়ঙ্গের জায়গায় জায়গায় বাতি জ্বালানো। বুযুর্গ টেরই পাননি, তার কয়েক কদম পিছনে খঞ্জর হাতে একলোক তাকে অনুসরণ করছে। লোকটি খঞ্জর হাতে পা টিপে টিপে বুযুর্গের পিছনে পিছনে আসছিল। লোকটি বুযুর্গ ব্যক্তিকে খঞ্জর দিয়ে দ্বিখণ্ডিত করতে হাত উপরে উঠাল— কিন্তু লোকটি বুঝে উঠতে পারছিল না, সুড়ঙ্গ পথটি এতোটুকু চওড়া নয় যে, হাত উঁচু করে হাত ঘুরিয়ে আঘাত হানা যাবে। সুড়ঙ্গ পথের দেয়ালে আঘাত লেগে শব্দ হলে বুযুর্গ চকিতে পিছন ফিরে বিদ্যুৎগতিতে কোমর থেকে খ র বের করে আঘাতকারীকে প্রতিঘাত করলেন। উভয়ের হাতের খঞ্জরে টক্কর খেয়ে শব্দ হল। কেউ লক্ষ্যভেদ করতে পারল না। বুযুর্গ বামপায়ে সজোরে প্রহরীর কোমরে লাথি মেরে চিৎ করে ফেলে দিলেন। নিজের খঞ্জর ওর বুকে আমূল বিদ্ধ করে হেচকা টানে বের করে আবার পাঁজরে ঢুকিয়ে আরেকটি লাথি মারলেন। লোকটি আর্তচিৎকার দিয়ে গড়িয়ে পড়ল।

আক্রান্ত আর্তচিৎকার দিলে দৌড়ে সিঁড়ির প্রবেশপথে এসে পড়লেন বুযুর্গ। তার দিকে দৌড়ে এলো কয়েকজন। বুযুর্গ বললেন, জলদি নিচে যাও। আমি আসছি। ওরা আহতের আর্তচিৎকার শুনেছিল। বুযুর্গকে চিনতে না পেরে ওরা সুড়ঙ্গপথের দিকে দৌড়ে গেল আর এই ফাঁকে দৌড়ে গলিপথ মাড়িয়ে জনারণ্যে মিশে গেলেন বুযুর্গ। রক্তমাখা খঞ্জরটি এর আগেই কোমরে গুঁজে ফেলেছিলেন তিনি।

সমবেত সকল লোকের আকর্ষণ ছিল মঞ্চের দিকে। সেখানে আলোর তীব্রতা কম। সবার দৃষ্টি মঞ্চের দিকে। বুযুর্গ তাঁর সাথীদের খুঁজে বের করে সংক্ষেপে বললেন, তিনি কোথায় গিয়েছিলেন, কি দেখেছেন এবং কি করে

এসেছেন। সাথীরা তাকে এখান থেকে চলে আসার প্রস্তাব দিয়ে বলল, অন্যথায় আপনার ধরা পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। শংকা না বাড়িয়ে বুযুর্গ চলে এলেন দুর্গ থেকে।

একটু পরই নাকাড়া বেজে উঠল। বাজল সানাই। এটা দাউদের মঞ্চে আগমন বার্তা। একটু পরই ঘোষক ঘোষণা দিল— মুলতানের শাসক, কারামাতী পয়গাম্বর, আবুল ফাতাহ শাইখ নসর বিন শাইখ হামিদ কারামাতী, সত্য ইসলামের পতাকাবাহী মঞ্চে আসছেন, জিন ও ভূত তার তাবেদার। উপস্থিত সকলেই মাথা নীচু করে তাকে অভিবাদন জানাবে।

ঢোল নাকারা বাজতে থাকল। বাজনার তালে তালে সৃষ্টি হলো সুর লহরী, যেন আন্দোলিত হতে থাকলো শত শত বছরের পরিত্যক্ত দুর্গের সব ঘরদোর। বাজনার আবহে মঞ্চের দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে এলো দাউদ, মাথায় রাজমুকুট। সারা গায়ে জরিদার জমকালো রাজকীয় পোশাক। সে এসে উপবেশন করল হীরা-মুক্তার সিংহাসনে। মানুষ তার আগমনে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করল। ঘোষক হাঁক দিল, "শত শত বছর ধরে এই দুর্গ জিন-ভূত-প্রেত্নীদের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল, এরা প্রতিদিন একজন না একজনের তাজা রক্তপান করতো। সত্যধর্মের পয়গাম্বর তার বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতাবলে খোদার বিশেষ ক্ষমতায় সকল ভূত-পেত্নী ও জিনকে তিনি অনুগত বানিয়ে ফেলেছেন। ওদেরকে বন্দী করে রেখেছেন। সমবেত সকল মানুষের কর্তব্য তার আনুগত্য স্বীকার করে তার হাতে মুরীদ হওয়া। না হয় জিন-ভূতেরা তাদের ক্ষতি করবে।"

এমন গুরু গম্ভীর আওয়াজে এই ঘোষণা দেয়া হলো যে, সমবেত মানুষজন ভীষণ প্রভাবিত হলো। এরপর কানে ভেসে এলো ধীরলয়ের যন্ত্রসঙ্গীতের আওয়াজ, সেই সাথে নৃত্যের সুরলহরী। এ সময়ে সমবেত কণ্ঠের কোরাস সঙ্গীতের আওয়াজও ভেসে এলো। পুরো প্যান্ডেলটি বাজনার তালে তালে নেচে উঠল। দাউদ বিন নসর মসনদ থেকে দাঁড়িয়ে গেল দর্শকদের দিকে পিঠ করে। বিড় বিড় করে মন্ত্রের মতো কি যেন আওড়াল। সুড়ঙ্গ পথ ছিল অন্ধকার। ওখান থেকে প্রথমে ধোঁয়া নির্গত হয়ে মঞ্চের জায়গাটি অন্ধকার হয়ে গেল। দাউদ দুহাত প্রসারিত করে বলল, খোদায়ে যুলজালাল! হে মানুষ ও জিনের সৃষ্টিকর্তা! আমাকে তুমি খোদায়ী শক্তি দাও। যাতে জিন ও ভূতের কষ্ট থেকে তাদের আমি মুক্তি দিতে পারি। সে ধমকের স্বরে বলল, "আমার সামনে আয়।" কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ায় মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে ধোঁয়া কমে গেল, ধোঁয়ার ভেতর থেকে চারটি কুমারী সুন্দরী দৃশ্যমান হল।

মেয়েগুলো যেন জান্নাতের হুর। তাদের গায়ে ফিনফিনে রেশমী পোশাক। বাদকদলের বাজনা আরো তীব্র হলো। যন্ত্রসঙ্গীতের সুরে কেঁপে কেঁপে উঠল মঞ্চ। যুবতীরা এক সাথে দাউদকে কুর্নিশ করতে সেজদায় পড়ে গেল। দাউদ তাদেরকে উঠে যেতে ইশারা করল। ধোঁয়া সম্পূর্ণ গায়েব হওয়ার আগেই যুবতীরাও অদৃশ্য হয়ে গেল।

যুবতীদের অন্তর্ধান বুঝে উঠার আগেই মঞ্চে দেখা গেল চারটি দৈত্যের মতো জংলী মানুষ। লোমশ কালো চেহারা। কুচকুচে কালো শরীর। বড় বড় চোখ। মাথার চুলগুলো সজারুর কাঁটার মতো খাড়া। মাথায় বাঁকানো শিং। দীর্ঘ দাঁত ওদের মুখের গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসেছে। মঞ্চের উপরে বেতাল বেশামালভাবে নাচতে শুরু করে দিল দৈত্যগুলো। ঘোষণা হলো— এরাই জিন। এদের চেয়ে আরো উদ্ভট চেহারার দানবের মতো একটি লোককে দেখা গেল হাতে চাবুক নিয়ে দাঁত খিটমিট করছে। সে বন্য দৈত্যগুলোকে এভাবে পেটাতে শুরু করে দিল যে, ওদের বিকট চিৎকারে দর্শকগণ ভয়ে জড়সড় হয়ে গেল।

গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলল, থামো! থেমে গেল পেটানো। ভূতগুলো সমস্বরে বলে উঠল, হুজুর! আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি। হুজুর! আমরা এখন আপনার কথা মানবো, আমরা আপনার মুরীদ হয়ে গেছি। আমরা কসম করে বলছি— আপনি আল্লাহ্র পয়গম্বর, আল্লাহ্র দূত। এ সংবাদ আমরা গায়েব থেকে জানতে পেরেছি।

মঞ্চের দিকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী আবারো ধেয়ে আসল। অন্ধকার হয়ে গেল মঞ্চ। ধোঁয়া কেটে যখন মঞ্চ পরিষ্কার হয়ে গেল তখন সেখানে দৈত্য দাউদ কাউকেই আর দেখা গেল না। ঘোষণা করা হল— কারামাতী পয়গম্বর আল্লাহ্র দরবারে হাজিরা দিতে গেছেন।

তোমরা যা দেখে এলে এসবই সেই সুড়ঙ্গের তেলেসমাতি। সাথীদের উদ্দেশ্যে সেই পুরনো বাড়িতে বসে বলছিলেন বুযুর্গ ব্যক্তি। যে মেয়েগুলোকে তোমরা দেখে এসেছো ওদেরকে আমি একটি বন্ধ ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে দেখেছি। এ সবই সেই সুড়ঙ্গ পথের কারিগরী। সুড়ং পথটি নতুন তৈরি করা হয়েছে। এই সুড়ঙ্গ পথটি মঞ্চে এসে শেষ হয়েছে। এই সুড়ঙ্গ পথেই মঞ্চের দিকে ধোঁয়া ছোঁড়া হয়। মেয়ে ও কৃত্রিম দৈত্যগুলো এই সুড়ঙ্গ পথ দিয়েই দৃশ্যমান হয়ে আবার ধোঁয়ার অন্ধকারে সুড়ঙ্গ পথে চলে যায়।

চার-কুমারী দুর্গে দাউদের তেলেসমাতী দেখে আসার পর বুযুর্গের নেতৃত্বে আবার পুরনো বাড়িতে বসল তাঁর সতীর্থদের পর্যালোচনা বৈঠক। আগেই আমার

সন্দেহ হয়েছিল এই দুর্গে জিনদের কোন অস্তিত্ব নেই, থাকলেও এভাবে এদেরকে বন্দী করে রাখা যায় না।

বুযুর্গ ও তাঁর সহযোগিরা যখন চার-কুমারী দুর্গের ঘটনা ও তাদের করণীয় নিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন তখন সেই বাড়ির দরজায় কড়া নড়ে উঠল। দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে গেল বাড়ির মালিক। আর অন্যেরা বিপদাশংকায় পালানোর জন্যে তৈরি হয়ে গেল। বাড়ির মালিক ছিল এদের সহযোগী। কোন বিপদ সংকেত থাকলে সে দরজার কাছে এসে কাশি দেবে এমন কথা ছিল। কিন্তু আজ সে কাশি দেয়নি। যখন দরজা খোলা হল তখন দেখা গেল, তাদেরই অন্য এক সাথী উপস্থিত।

আমি যে খবর শুনে এসেছি, তা যদি সত্য হয় তবে কারামাতীদের মৃত্যু ঘণ্টা ঘনিয়ে এসেছে। বেরা থেকে কয়েকজন লোক এসে বলেছে, সুলতান মাহমূদ বেরা দখল করে নিয়েছেন। বেরার রাজা বিজি রায় আত্মহত্যা করেছে। লোকগুলো বলেছে— তিনদিন পর্যন্ত এমন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়েছে যে, সুলতান ও বিজি রায় সবারই সহায় সম্পদ সব বিনষ্ট হয়ে গেছে। এখন সুলতান গজনীর সাহায্যের জন্যে অপেক্ষা করছেন। গজনী থেকে রসদপত্র পৌছাতে সময় লাগবে। বর্তমানে বেরা থেকে কাউকে বের হতে দেয়া হচ্ছে না, কাউকে ঢুকতেও দেয়া হচ্ছে না।

সবাই গভীর চিন্তায় ডুবে গেল। কিছুক্ষণ পর আলেম বললেন, "রাজশক্তির সাথে টক্কর দেয়া আমাদের সম্ভব নয়। আমরা এখন গোপনে কারামাতী চক্রান্তকারীদের নির্মূল করার কাজটি চালিয়ে যেতে পারি। যে কাজটি আমাদের দরবেশ সুনিপুণভাবেই শুরু করে এসেছে। সতর্ক থাকতে হবে আমাদের যেন কেউ চিহ্নিত করতে না পারে। যদি দাউদকে হত্যা করা যায় তবে হয়তো এই অপকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে। তৃতীয় পন্থা হতে পারে আমাদের কয়েকজন বেরা গিয়ে সুলতান মাহমূদকে এখানকার পরিস্থিতি জানিয়ে মুলতান আক্রমণের জন্যে অনুরোধ করা।

একথায় সায় দিল সবাই। সিদ্ধান্ত হল, আলেম, বুযুর্গ ও আরো তিনজন নওজোয়ান সাথী পরদিন সকালেই বেরার উদ্দেশে রওয়ানা হবে।

দরবেশের গোপন আস্তানায় যখন সুলতান মাহমূদের বেরা বিজয়ের খবর শোনানো হচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে দাউদকেও তার গোয়েন্দারা খবর দিল যে, সুলতান মাহমূদ বেরা দখল করে নিয়েছে এবং বিজি রায় আত্মহত্যা করেছে।

দাউদ তখন চার-কুমারী দুর্গের যাদুকরী ধোঁকাবাজীর এক সহযোগী হত্যার অপরাধে অন্যান্য প্রহরীর উপর চড়াও হচ্ছিল। প্রহরীরা তার সামনে দণ্ডায়মান হয়ে করজোড়ে নিবেদন করছিল, তাদের কেউ ওকে হত্যা করেনি। বরং তারা একজনকে বেরিয়ে যেতে দেখেছে। কিন্তু দাউদ কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে রাজি নয়। দাউদের বিশ্বাস, কোন তরুণীর চক্রান্তে এদেরই কেউ ওকে হত্যা করেছে। দাউদ ওদেরকে শাসাচ্ছিল কিন্তু প্রহরীদের সবাই মিনতি করছিল আমরা ওকে হত্যা করিনি।

এ সময় দাউদের সেনাপতি এসে জানাল বেরার দুঃসংবাদ। সংবাদ শুনে দাউদের অবস্থা এমন হলো যে, তার মদের নেশা উবে গেল। বেসামাল দাউদ চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশংকায় চোখে অন্ধকার দেখছিল। এরই উপর ভয়ানক দুঃসংবাদ ওকে আরো শংকিত করে ফেলল। নিরাপত্তা প্রধানকে হুকুম দিল, ওদেরকে হাত পা বেঁধে উল্টো করে ঝুলিয়ে দাও, তারপরও যদি সত্য কথা না বলে তবে কোন খাবার না দিয়ে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে ফেলে রাখবে।

প্রহরীদেরকে নিয়ে যাওয়ার পর সেনাপতিকে দাউদ বলল, মাহমূদ যদি বেরা দখল করে থাকে তবে আমাদেরকে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিতে হবে। তুমি আগামীকাল সকালেই ব্যবসায়ীর বেশে কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা পাঠিয়ে দাও। তারা গিয়ে সরেজমিনে ব্যাপারটি দেখে আসুক। মাহমূদের কাছে যদি সৈন্যবল কম থেকে থাকে তবে আমরা মহারাজা আনন্দ পালকে খবর দেবো ওর উপর হামলা করতে।

সকাল বেলা মুলতান থেকে ছোট দু'টি কাফেলা বেরার উদ্দেশে বের হল। এক দলে দরবেশ, আলেম ও তার তিন সাথী, আর অপর দলে দাউদের সেনা বাহিনীর দুই কর্মকর্তা ও অপর চারজন সৈনিক।

দাউদের লোকেরা যখন দরবেশের কাফেলাকে দেখল তখন বলল, মনে হয় ওরাও ওদিকে যাবে। চল, আমরাও ওদের সাথে মিশে যাই।

* * *

হক ও বাতিলের লড়াই

থমকে গেল দাউদের চমক। উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায় দাউদের নাচ, নখরা ভাটা পড়ল। বেরা পতনের খবরে দাউদের মাথায় চক্কর দিয়ে উঠল: সে চারজন কমান্ডার ও দুইজন উর্ধ্বতন সেনা অফিসারকে বেরার উদ্দেশে পাঠাল। ওদেরকে নির্দেশ দিল, যে করেই হোক, তোমরা বেরায় গিয়ে সুলতান মাহমূদের অবস্থা জানাবে। সে কবে নাগাদ মুলতান অভিযানে বের হতে পারে এবং তার সৈন্যসংখ্যা কত? ওখানকার হিন্দুদের অবস্থা কি তাও ভাল করে অনুসন্ধান করবে এবং সম্ভব হলে ওদের সাথে যোগাযোগ করে আসবে। নির্দেশ মত ছয়জনের কাফেলা বণিকের বেশে বেরার পথে রওয়ানা হল। এই ছয়জনের প্রত্যেকেই ছিল গোয়েন্দাবৃত্তিতে পারদর্শী এবং কট্টর কারামাতী।

মুলতান থেকে কিছু দূর যাওয়ার পর গুপ্তচর কারামাতীরা দরবেশ, আলেমসহ আরো তিন ব্যক্তিকে বেরার দিকেই যেতে দেখল। তারা এদের সাথে মিশে গেল। ভাবল, একই দিকে যেহেতু যাচ্ছি, তাই এদের কাছ থেকে কোন সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। দাউদের গুপ্তচররা ছিল অশ্বারোহী। তাছাড়াও তাদের তিনটি উট বোঝাই ছিল মালপত্রে। দরবেশের সাথীদের তিনজন ছিল উষ্ট্রারোহী এবং আলেম ও দরবেশ অশ্বারোহী। এরা ছিল নিষ্ঠাবান সুন্নী মুসলমান। তারা যাচ্ছিল সুলতান মাহমূদকে কারামাতীদের দুষ্কৃতি সম্পর্কে অবহিত করে মুলতান আক্রমণের অনুরোধ জানাতে।

উভয় কাফেলা মুখোমুখি হলে কুশল বিনিময় হলো, সালাম কালামও হলো। কিন্তু পরিচিতি পর্বে উভয় কাফেলা কিছুটা রক্ষণশীলতা বজায় রাখলো। দরবেশ জানালো, "তারা মুলতানের বাসিন্দা, মুলতানেই ব্যবসা করে। ব্যবসায়িক কাজে বেরা যাচ্ছে।" কারামাতীরা বলল, "তারা লাহোরের বাসিন্দা। ব্যবসায়িক কাজে মুলতান এসেছিল। এখন বেরা হয়ে লাহোর ফিরে যাবে।"

"আপনারা তো মুলতানের অধিবাসী, তাহলে তো আপনারা কারামাতী মুসলমান?" দরবেশকে জিজ্ঞেস করল এক কারামাতী।

"না, আমরা সুন্নী মুসলমান। কারামাতীদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। ওদেরকে আমরা মুসলমানই মনে করি না। আপনারা তো মনে হয় সুন্নী মুসলমান। কারণ, মুলতান ছাড়া আর কোথাও কারামাতী নেই।" বলল দরবেশ।

"ওদের আমরা চিনি না।" বলল এক কারামাতী সৈনিক। "আমরাও আপনাদের মতই সুন্নী মুসলমান। আচ্ছা— শুনলাম, সুলতান মাহমূদ বেরা দখল করেছে? ওখানকার রাজা বিজি রায় নাকি আত্মহত্যা করেছে?"

"শুনলাম তাই।" বললেন আলেম। "যদি খবরটি সত্য হয়ে থাকে, তবে আপনার, আমার সবারই খুশি হওয়া উচিত। মুহাম্মদ বিন কাসেমের পর এই প্রথম কোন ন্যায়পরায়ণ সুলতান এদিকে অভিযান করলেন। আপনি দেখে থাকবেন, এ অঞ্চলের অশিক্ষিত দরিদ্র মুসলমানরা কীভাবে দলে দলে হিন্দুদের চক্রান্তে ধর্মান্তরিত হচ্ছে।"

"আমরা খুব খুশি হয়েছি।" বলল কারামাতী কমান্ডার। "আমরা চাই সুলতান মাহমূদ লাহোরও দখল করে নিক। এ এলাকাটিও মুসলমানদের দখলে আসা দরকার।"

"লাহোরের আগে সুলতান মাহমূদের উচিত মুলতান দখল করা। কথায় বলে, ঘরের শত্রু বিভীষণ। আপনি হয়তো জানেন, মুলতানের শাসক দাউদ বিন নসর খৃস্টান ও হিন্দুদের ক্রীড়নক সেজে মুসলমানদের পরিচয়ে ইসলামের শিকড় কাটছে।"

"জানা তো নেই, সুলতান মাহমূদ দাউদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে জানেন কি না। সুলতানের কাছে সঠিক তথ্য আছে কি না তাও তো জানা নেই।" বলল কারামাতী কমান্ডার।

"জানা না থাকলেও তার এখন জানা উচিত।" বললেন আলেম।

"আমরা তো এক সাথেই বেরা যাচ্ছি। সুলতান মাহমূদ যাতে দাউদ বিন নসরকে বন্ধু মনে না করেন, এ ব্যাপারটি তাকে অবহিত করা তো আমাদেরও কর্তব্য।" বলল কারামাতী কমান্ডার।

"অবশ্যই।" বললেন দরবেশ। এ কর্তব্য আমাদের অবশ্যই পালন করা দরকার।

সবাই সমতালে চলতে লাগল। আলেম ও দরবেশ এ কথা প্রকাশ করতে চাচ্ছিল না যে, তারা সুলতান মাহমূদের কাছেই যাচ্ছে। তাদের গতিবিধি দেখে কারামাতীদের এমন কোন সংশয়ও হয়নি। কিন্তু কারামাতীরা ছিল দুর্দান্ত চালাক এবং পেশাদার গোয়েন্দা। ওরাও নিজেদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করেনি। কারামাতীরা দরবেশ ও সাথীদের আকীদা বিশ্বাস নিয়েই কথাবার্তা বলছিল। দরবেশ ও আলেম ঘুণাক্ষরেও আন্দাজ করতে পারেনি যে ওরা সুন্নী মুসলমান নয়

এবং ব্যবসায়ী ছাড়া অন্য কিছুও হতে পারে। তাদের মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক না হওয়ায় সমমনা মনে করে তারাও অকপটে ওদের সাথে কথাবার্তা বলতে লাগল।

বেলা ডুবার আগেই তারা মুলতান অঞ্চলের বড় নদী রাভী পেরিয়ে গেল। যে জায়গা দিয়ে তারা নদী পার হল এখানে নদীটি বেশ চওড়া কিন্তু অগভীর। নদী পেরিয়ে তীরে উঠেই তারা সবাই রাত যাপনের জন্যে সুবিধা মতো একটি জায়গা বেছে নিল। এ সময় কারামাতী দলের কমান্ডার তার ঘোড়ার পিঠ থেকে সামান ও জিন খুলছে, তার এক সৈনিক তার কাজে সহযোগিতা করছে। সহযোগী সৈনিকটি জিন খুলতে খুলতে কমান্ডারের উদ্দেশ্যে বলল, "লোকগুলোকে দেখে তো ব্যবসায়ীই মনে হয় কিন্তু আমার সন্দেহ হয়, ওরা আমাদের বিরুদ্ধে কোন বদ মতলবে বেরা যাচ্ছে না তো? যে দু'জন লোক আমাদের সাথে কথাবার্তা বলছে, মনে হয় এরা শিক্ষিত, আলেম। এরা যদি আমাদের সম্পর্কে কোন কূটকৌশল না করে তবুও আমাদের উচিত হবে এদের সাথে থাকা। কারণ আলেম হিসাবে বেরাতে তারা যে সম্মান পাবে এদের সাথে থাকলে আমরাও তাদের দ্বারা উপকৃত হবো। আমাদের উচিত তাদের সাথে হৃদ্যতা সৃষ্টি করা।"

"আজ রাতে আমরা মদের মশক খুলব না। যাতে তারা আমাদেরকে মু'মেন মুসলমান মনে করে। তাদের মধ্যে ওই বুড়ো লোকটি খুব ভালভাল কথা বলে। আমরা তাদেরকে সুলতান মাহমূদের সাথে সাক্ষাতের জন্যে উৎসাহ দেবো। এরপর তাদের সাথে আমাদের একজনও চলে যাবো মাহমূদের দরবারে। তাহলে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানা যাবে।"

সবাই এক সাথে আহারে বসল। আহার পর্বেও কারামাতী কমান্ডার সারাদিনের মতো ধর্মীয় প্রসঙ্গে কথা বলতে লাগল। ওদের কথায় বুঝা যাচ্ছিল, তারা নিষ্ঠাবান মুসলমান। কথার ধরনও ছিল এমন যে, আলেম ও দরবেশ মনে করলেন, তাদের মতো এরাও সুলতান মাহমূদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং তাদের মতোই ইসলামের জন্যে নিবেদিত প্রাণ। কারামাতী দলের সবাই প্রশিক্ষিত গোয়েন্দা। ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈনিক। দরবেশ ও আলেমের মিশন ছিল ইসলামী চেতনা থেকে উৎসারিত কর্তব্যের প্রতিফলন। তাই তাদের মধ্যে সব বিষয়ে অতিরিক্ত সচেতনতার বোধ ছিল না। তাদের মন-মস্তিষ্কেও এসবের গন্ধ নেই। পক্ষান্তরে কারামাতী দলটির মিশনই ছিল সন্দেহজাত, ধূর্তামি আর প্রতারণার। কথায় কথায় কারামাতী প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু করে দিল দলনেতা।

"কারামাতীদেরকে আমরা ভ্রান্ত মনে করি।" বলল কারামাতী কমান্ডার। "কিন্তু মুলতানে আমরা যাকেই দেখলাম সবাইকে দাউদের অনুসারীই মনে হলো। সেখানে লোক মুখে চার-কুমারী দুর্গের কথা শুনে গতরাতে আমরা সেই মেলা দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমরা জিন দেখলাম, কুণ্ডলীর ভেতর থেকে চারটি তরতাজা কুমারী মঞ্চে আবির্ভূত হলো। তারা আবার ধোঁয়ার মধ্যেই হারিয়ে গেল। আমাদের কাছে তো এগুলো বাস্তব এবং দাউদের কারামতীই মনে হলো। মনে হয় দাউদের মধ্যে বিশেষ আধ্যাত্মিক গুণ আছে— না হয় এসব কি কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব?"

"যে দিক থেকে আপনারা চার-কুমারী এবং ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে দেখলেন সেদিক থেকে কোন লাশ বের হতে দেখেননি?" কারামাতী কমান্ডারের কথায় আবেগ তাড়িত হয়ে রহস্য প্রকাশ করে দিলেন দরবেশ।

"লাশ! কার লাশ?" বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কারামাতী কমান্ডার।

"দাউদের একজন বিশ্বস্ত প্রহরীর লাশ। চার কুমারী আর জিনের ভোজভাজি আমি দুর্গের ভেতরে গিয়ে দেখে এসেছি।" বললেন দরবেশ।

"বলেন কি? আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদেরকে এই রহস্যের কথা খুলে বলুন তো! আমরা তো ভাবতেই পারিনি, কোন বাতিল গোষ্ঠীর মধ্যে এমন অলৌকিক ক্ষমতা থাকতে পারে। আমরা তো তার কারামাতী দেখে তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে মুরীদ হওয়ার চিন্তা করেছিলাম। আর আপনি বলছেন, ভোজভাজি! ভাই মেহেরবানী করে আমাদের সন্দেহমুক্ত করুন। এতেও আপনার সওয়াব হবে!"

কারামাতী কমান্ডারের চাতুর্যপূর্ণ কথায় আবেগপ্রবণ হয়ে গেলেন দরবেশ। তিনি ওদেরকে সুন্নী মুসলমান মনে করে তার গোপন অভিযানের কথা সবিস্তারে বলে দিলেন। বললেন, কিভাবে তিনি ভেতরে প্রবেশ করে গোপন কক্ষে চার কুমারীকে দেখলেন এবং দাউদ ও সহযোগীদেরকে তরুণী বেষ্টিত অবস্থায় মদ পানরত অবস্থায় পেলেন। তাও বললেন, একজনকে হত্যা করে কিভাবে তিনি গোপন সুড়ঙ্গ পথ ডিঙিয়ে বেরিয়ে এলেন।

কারামাতী কমান্ডার ও সাথীরা অভাবিত এই সফল অভিযানের জন্যে দরবেশকে বাহবা ও ধন্যবাদ দিল। এ কৃতিত্বের জন্যে দরবেশের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাকে খুবই উজ্জীবিত করতে লাগল। ওরা তো দরবেশের কথা শুনে হতবাক। "বলে কি বুড়ো! যে হত্যাকাণ্ডের কিনারা করতে না পেরে দাউদ মহলের অভ্যন্তরীণ সকল নিরাপত্তারক্ষীকেই কঠিন শাস্তি দিচ্ছে, ওরা ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বলতে পারছে না কে ঘটিয়েছে হত্যাকাণ্ড। আর

এই বুড়ো কি সেই হত্যার নায়ক! মনে মনে মহা খুশি হল তারা, অভাবিতভাবে হাতের নাগালে অপ্রত্যাশিত শিকার। আর পালাবে কোথায়? শিকার এখন তাদের হাতের নাগালে। ভেতরের মনোভাব প্রকাশ করল না কারামাতীরা।

রাতের আহারপর্ব সেরে সবাই বিছানা পেতে ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। কারামাতী কমান্ডার দরবেশের প্রতি দারুণ ভক্তি দেখাচ্ছে। তার প্রতি অত্যধিক সম্মান দেখিয়ে সে অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে দরবেশের বিছানা করল। সারাদিনের বিরামহীন ক্লান্তির কারণে শুয়েই সবাই ঘুমিয়ে পড়ল।

মধ্যরাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল দরবেশের। চোখ মেলল কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। মোটা কাপড় দিয়ে তার চোখ মুখ বেঁধে ফেলা হয়েছে। সে উঠে দাঁড়াল কিন্তু পা বাড়াতে পারল না। দু'তিনজন লোক তার হাত পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেলল। সাথে সাথে তাকে ধরাধরি করে একটি উটের উপরে রেখে বেঁধে ফেলল উটের সাথে। উটের রশি আরেকটি ঘোড়ার সাথে বেঁধে ঘোড়াকে তাড়া দিল। সহগামী হলো আরেকটি ঘোড়া। কারামাতী গুপ্তচররা অপ্রত্যাশিতভাবে চার-কুমারী দুর্গের রহস্যজনক নিরাপত্তারক্ষী হত্যাকারীকে পেয়ে তাকে দাউদের কাছে পৌঁছে দিয়ে মোটা অংকের পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় দরবেশকে মুলতানে নিয়ে যাওয়ার জন্য দু'জনকে দিয়ে রাতের অন্ধকারেই পাঠিয়ে দিল। এ কাজটা আসলেই ছিল তাদের জন্য বিরাট এক সাফল্য আর দরবেশ ও সাথীদের জন্যে মারাত্মক বিপর্যয়।

দরবেশের সাথীরা তার কাছ থেকে অনেকটা দূরে বেঘোরে ঘুমাচ্ছিল। রাতের এই অপহরণ ঘটনা মোটেও টের পেল না তারা।

খুব ভোরেই ঘুম ভাঙল আলেম ব্যক্তির। তিনি ঘুম থেকে উঠে নামাযের জন্য দরবেশকে জাগাতে তাঁর বিছানায় গেলেন। কিন্তু বিছানা খালি। ভাবলেন, দরবেশ হয়তো তার আগেই শয্যা ত্যাগ করে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেছেন। অথবা অযু করতে নদীতে গেছেন। কারামাতী কমান্ডার ঘুম থেকে উঠে তাদের বাধা উট ও ঘোড়ার দিকে গেল। একটু পরই চিল্লাতে শুরু করল, "হায়! আমাদের দু'টি ঘোড়া ও একটি উট নেই। আমাদের দু' সাথীও নেই। হল্লাচিল্লা করে কারামাতী কমান্ডার আবিষ্কার করল, আমাদের দামী জিনিসপত্রগুলোও সব নিয়ে গেছে। কমান্ডার চেমামেচি করে ঘোড়ায় জিন লাগাতে শুরু করল, আর বলতে লাগল, বেশি দূর যেতে পারেনি। চলো, ওদের তালাশ করি।" এমন সময় আলেম বললেন, "আমাদের দরবেশকেও তো দেখছি না।"

"হ্যাঁ, তাহলে সে-ই আমাদের লোকদের অপহরণ করেছে। তাকে তো আমরা দরবেশ মনে করেছিলাম। কিন্তু গতরাতে সুড়ঙ্গের মধ্যে যেভাবে এক সৈনিককে সে হত্যা করে ফিরে এসেছে— এ লোক পেশাদার খুনী। চল ওকে ধরতে হবে।"

"ওর পিছু নেয়া বোকামী।" বলল অপর এক কারামাতী। "জানা তো নেই এখান থেকে কখন কোন দিকে পালিয়েছে সে।"

"হ্যাঁ। তুমি ঠিক বলেছো। এ মরু বিজন প্রান্তরে কোথায় খুঁজে ফিরব আমরা। ওকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।" বলল কমান্ডার।

"আলেম ব্যক্তি নীরবে দাঁড়ানো। তার তিন সাথীও হতবাক। হচ্ছে কি এসব? দরবেশকে তো তারা জানে, সে খুন-খারাবী, চুরি-ডাকাতি করবে, একথা তারা কল্পনাও করতে পারে না। তার মতো একজন মর্দে মু'মেন নেক মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। অথচ এরা বলছে, দরবেশ তাদের মালপত্র লোকসহ অপহরণ করে নিয়ে গেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় তারা হতবাক।

"আমার তো মনে হয় তোমরাও ডাকাত।" আলেমকে উদ্দেশ্য করে বলল কারামাতী কমান্ডার।

"আমরা ডাকাত হলে এখন আমাদের কাউকে তুমি এখানে দেখতে না। আর তোমরাও জীবিত থাকতে না। সবাই লাশ হয়ে থাকতে।" বললেন আলেম। "দেখো! তোমাদের দু'লোক নিরুদ্দেশ। আমার তো মনে হয়, তোমাদের ওই লোকেরা চুরি করার জন্যে মালপত্র বাঁধছিল, তা দেখে ফেলেছিল দরবেশ। ওদের অপকর্ম ফাঁস হয়ে যাবে মনে করে ওরা দরবেশকে হত্যা করে নদীতে ফেলে পালিয়ে গেছে। ওরা জোয়ান দু'জন, আর দরবেশ বুড়ো একা।"

তাদের লোক কোথায় গেছে, তা কারামাতীদের জানা। তাই কারামাতী কমান্ডার মনে করল, এরাও যদি দরবেশের গোপন মিশনের সহযোগী হয়ে থাকে, তবে এদের বেশি ঘাটানো ঠিক হবে না। এদের কাছ থেকে আরো তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনায় কারামাতী কমান্ডার আলেম ও তার সাথীদের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখতে এ বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য করল না। বস্তুত তাদের উদ্বেগের কোন কারণও ছিল না। কমান্ডার নিজেই তো দরবেশকে অপহরণের ব্যবস্থা করেছে।

পুনরায় উভয় কাফেলা বেরার দিকে রওয়ানা হলো। কারামাতীরা আগে আর আলেম ও সাথীরা ওদের পিছনে।

“এদের গতিবিধি আমার কাছে সন্দেহজনক মনে হচ্ছে। সাথীদের ক্ষীণ আওয়াজে বললেন আলেম।” সকাল থেকে এদেরকে আমি গভীরভাবে দেখছি, আমার কাছে এদেরকে ব্যবসায়ী মনে হয়নি। এরা ব্যবসায়ী নয় অন্য কোন পেশার লোক। দরবেশ গতরাতে আবেগপ্রবণ হয়ে সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশের ঘটনা বলে দিয়েছিল। আমার মনে হয়, এরা দাউদের লোক। গোয়েন্দা। এরাই দরবেশকে অপহরণ করে মুলতান নিয়ে গেছে। এরা বেরা যাচ্ছে, সুলতান মাহমূদের গতিবিধি ও তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানার জন্যে।”

“আমাদের সচেতন থাকা দরকার।” বলল এক সাথী। “ওরা যেন বুঝতে না পারে, দরবেশের সাথে আমাদের গভীর কোন সম্পর্ক ছিল।”

“এরা যদি সত্যিই গোয়েন্দা হয়ে থাকে, তবে এদেরকে আমি বেরায় ধরিয়ে দেবো। এখন থেকে এদের সাথে আমরা আরো আন্তরিক ভাব দেখাবো।”

“এ বিষয়টা তো পরিষ্কার বোঝা গেছে, এরা আমাদের নবী দাউদ বিন নসর ও কারামাতী ধর্মাদর্শের ঘোরতর বিরোধী। এখন থেকে ওদের সাথে আমরা গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব দেখাবো। আমাদের জানতে হবে এদের প্রকৃত পরিচয় এবং এদের মূল উদ্দেশ্য।” সাথীদের বলল কারামাতী কমান্ডার।

সূর্য যখন মাথার উপর, তখন কারামাতী কমান্ডার সওয়ারীগুলোকে ঘাস পানি খাওয়ানো এবং নিজেদের বিশ্রাম ও আহারের জন্য কাফেলা থামিয়ে দিল। আহার পর্বে কারামাতী কমান্ডার আলেমকে জিজ্ঞেস করল—

“দরবেশের সাথে আপনার সম্পর্ক কতো দিন ধরে?”

আলেম বললেন, “আমি শুধু এতটুকু জানতাম, মুলতানে সে ব্যবসা করে। কোথায় কি ব্যবসা তা জানি না। আমরা যখন বেরা রওয়ানা হলাম, তখন সে আমাদের সাথে এসে মিলিত হয়েছে।”

“ঐ লোকটি চার-কুমারী দুর্গে একটি লোক হত্যা করেছে, তা কি আপনারা জানতেন?”

“খুনের কথা জানতে পারলে আমরা তাকে সাথেই রাখতাম না।” বললেন আলেম। “সে যদি ধর্মীয় ভাবাবেগে খুন করে থাকে তাও ঠিক করেনি। নরহত্যা মহাপাপ। হত্যাকাণ্ড আল্লাহও ক্ষমা করেন না।”

গুপ্তচর নেতা বহু চেষ্টা করেও আলেমের কাছ থেকে নতুন কোন তথ্য উদ্ঘাটন করতে পারল না। কারামাতীরাও আলেম কাফেলার সাথে একথাই প্রকাশ করছিল যে, তারা কারামাতী নয় নিষ্ঠাবান মুসলমান।

রাজা, মহারাজা কোন সুলতানের শাসনের বাইরে বিজন মরু প্রান্তরে দু'টি ছোট কাফেলা একই কাফেলায় লীন হয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। কিন্তু দৃশ্যত একটি কাফেলা হলেও এদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে বিস্তর ব্যবধান। একদল আরেক দলের প্রাণঘাতি শত্রু। এরা পারস্পরিক শত্রুতায় লিপ্ত এবং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চিন্তায় বিভোর। হক ও বাতিলের অদৃশ্য সংঘাতে তারা অহর্নিশ চিন্তামগ্ন। আলেম সন্দেহাতীতভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, এরা ব্যবসায়ী নয় কারামাতী। আলেম ছিলেন বয়স্ক প্রবীণ। তার তিন সাথী অবশ্য যুবক। কিন্তু কারামাতীদের সবাই শক্তিশালী। আলেম ভাবছিলেন, এরা যদি প্রশিক্ষিত সৈনিক হয়ে থাকে, তবে তার তিন সাথী কি এদের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারবে?

মনে মনে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে অগ্রসর হচ্ছিলেন আলেম। আল্লাহ্ই সকল বিপদে মদদগার। কোন মানুষ মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে না যদি আল্লাহ্র রহমত না থাকে। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন, এরা যদি তার সাথে বেরা পর্যন্ত যায় তবে এদেরকে তিনি ধরিয়ে দিবেন। তবে বুযুর্গ দরবেশকে নিয়ে ভাবনায় পড়ে গেলেন তিনি। তাকে যদি কারামাতীরা হত্যার দায়ে দাউদের কাছে ধরে নিয়ে যায় তবে বৃদ্ধ লোকটি অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে মুলতানে আমাদের সবার ঠিকানা বলে দিতে পারে। তাহলে তাদের স্ত্রী-সন্তান ও আত্মীয়দের দাউদের বাহিনী চরম লাঞ্ছিত করবে ও অত্যাচার চালাবে।

ইসলামী ইতিহাসে কষ্ট ও ত্যাগের কথা মনে হলো তার। কতো কঠিন নির্যাতন, নিপীড়ন সহ্য করেছেন সাহাবায়ে কেরাম। এ মুহূর্তে ইসলামের জন্যে তাদেরও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। কুরবানী এখন সময়ের দাবী। সাথীদের উদ্দেশ্যে বললেন—

"প্রিয় সাথীরা! আজ আমরা যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি, তা খুবই কঠিন। ইসলামের জন্যে আমাদের ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকারের সময় এসেছে। আশা করি আল্লাহ্র রাস্তায় যে কোন ত্যাগ স্বীকারে তোমরা পিছপা হবে না। মনে রেখো, যে মুসলমান ত্যাগ স্বীকার না করে কষ্ট দেখে পালিয়ে যায়, ইতিহাস থেকে তাদের নাম চিহ্ন হারিয়ে যায়। হতে পারে আমাদের এই অভিযানের কারণে তোমাদের প্রত্যেকের পরিবারে অবর্ণনীয় অত্যাচার নেমে আসবে। সব জুলুম-অত্যাচার দৃঢ়তা ও সাহসের সাথে সহ্য করতে হবে। তোমরা যদি কষ্ট দুর্ভোগ ও নির্যাতনের মোকাবেলায় অটল থাকতে না পার তবে এখনই বাড়িতে ফিরে যেতে পার। তবে মনে রাখবে, যে মুসলমান ঈমানের পরীক্ষায় পালিয়ে যায়, ইতিহাস থেকে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।"

তিন যুবকের কেউই আলেমকে ফেলে বাড়ি ফিরে যেতে রাজী হলো না। পক্ষান্তরে তারা আলেমকে তাদের দলনেতা স্বীকৃতি দিয়ে বললো, "আপনি আমাদের যে কোন নির্দেশ দিবেন, আমরা জীবন বাজী রেখে তা পালনে অঙ্গীকার করছি।"

ইতিহাসের এ এক নির্মম বাস্তবতা। যাদের রক্তের বিনিময় ও ত্যাগে রচিত হয় ইতিহাস, যাদের কুরবানীর বিনিময়ে সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর যতো রাজা-বাদশাহ-বিজয়ীর কীর্তিগাঁথা, তাদের অধিকাংশই রয়ে গেছে অজ্ঞাত। কেননা, ইতিহাস যুদ্ধের ময়দানে বিজয়ীর নামোল্লেখ করে, যে সব অজ্ঞাত লোক নিজেদের পরিচয় আড়াল করে বিজয়ের ভিত রচনা করতে জীবন বিলিয়ে দিয়েছে ইতিহাস তাদের জানে না।

তখন সূর্য ডুবে গেছে। কারামাতী কমান্ডার রাত যাপনের জন্যে যাত্রাবিরতি দিতে অনুরোধ করল। জায়গাটি ছিল সবুজ শ্যামল, তাজা ঘাসের প্রাচুর্য ছিল সেখানে। অসংখ্য ঝোপঝাড় উঁচু নীচু টিলায় ভরা। কারামাতী কমান্ডার আলেমের উদ্দেশ্যে বলল, "একটি সুবিধা মতো জায়গা দেখুন, আমিও দেখছি।" আলেম সাথীদের নিয়ে আরো সামনে অগ্রসর হলেন। একটি মরু প্রস্রবণের পাশে তিনি তাঁবু খাটাতে বললেন সাথীদের। জায়গাটিতে পানি ও ঘাস রয়েছে। পশুগুলোর খাবার ও নিজেদের বিশ্রাম উভয়টা একই সাথে সারা যাবে।

কারামাতীরা পিছনে রয়ে গেল। আলেম ভাবলেন, ওরা হয়তো এদিক সেদিক দেখে এ জায়গাটিকেই পছন্দ করবেন, কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও কারামাতীরা এলো না। আলেম ওদের আসার ব্যাপারে ভাবলেশহীন। ওরা ভিন্ন রাত কাটাক, তাতে কিছু যায় আসে না।

আলেম লক্ষ্য করলেন, "তাদের অদূরেই একটি তাঁবু খাটানো। সেখানে এক হিন্দু বৃদ্ধ এবং এক যুবক দাঁড়ানো। সাথে একজন বয়স্কা মহিলা এবং দু'জন তরুণী। তরুণী দু'জন দেখতে রাজকুমারীর মতো। তাদের তাঁবুর সামনে একটি মশাল জ্বলছে।

আলেমও তাদের তাঁবুর সামনে একটি মশাল জ্বালিয়ে এর হাতল মাটিতে পুঁতে দিয়ে সবাইকে নিয়ে শুয়ে পড়লেন। ক্লান্তির আবেশে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল অল্প সময়ের মধ্যেই।

মাঝরাতে নারী ও পুরুষের আর্তচিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল সবার। আলেম ও সাথীরা সবাই উঠে তরবারী হাতে নিলেন বিপদাশঙ্কায়। জ্বলন্ত মশালের আলোয়

দেখতে পেলেন, তাদের দিকে এগিয়ে আসছে পাশের তাঁবুর বৃদ্ধ হিন্দু ও বয়স্কা মহিলা। কিন্তু তাদের সাথের দু' যুবতীকে দেখা গেল না।

আলেম ও সাথীরা তরবারী উঁচিয়ে ওদের দিকে অগ্রসর হলে ওরা পাশ ফিরে দৌড়াতে উদ্যত হলো। আলেমের সাথীরা সমস্বরে ওদের হুঁশিয়ার করে বললো, "পালাতে চাইলে নির্ঘাত মরতে হবে, জীবন বাঁচাতে চাইলে দাঁড়াও।"

মৃত্যুভয়ে ওরা দাঁড়িয়ে গেল। আলেম ও সাথীরা তাদের কাছে গেলে জীবন ভিক্ষা চাইল তারা। আর ভয়ে কাঁপতে লাগল। অনেক কষ্টে আলেম তাদের বুঝালেন, "আমরা তোমাদের হত্যা নয়, সাহায্য করতে চাই। বলো, তোমরা পালাচ্ছিলে কেন?"

"তোমাদের সাথীরা আমাদের সবকিছু নিয়ে গেছে। আমাদের সাথে থলে ভর্তি স্বর্ণমুদ্রা ছিল, অনেক দামী গহনা ছিল, সবই ওরা নিয়ে গেছে। তোমাদের সাথীরা মেয়ে দু'টিকেও নিয়ে গেছে।" ভয়ার্তকণ্ঠে বলল বৃদ্ধ।

"মেয়ে দু'জন তোমার কি হয়?"

"ওরা আমার মেয়ে। এ আমার ছেলে, আর এ আমার স্ত্রী। আমরা বেরা থেকে পালিয়ে এসেছি। বেরা মুসলমানরা দখল করে নিয়েছে। আমরা হিন্দু।"

"গযনীর মুসলমানরা কি তোমাদের ঘরবাড়ি লুটপাট করেছে? শহরে গণহত্যা চালিয়েছে? তোমাদের মেয়েদের নির্যাতন করেছে?"

"না-না, তা নয়।" বলল বৃদ্ধ। "বিজয়ী সুলতান তো নির্দেশ দিয়েছেন, কোন হিন্দুর ঘরে কেউ যাবে না, কোন নারীকে কেউ লাঞ্ছিত করো না। সকল নাগরিকের মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধানের নির্দেশ দিয়েছে সুলতান। কিন্তু আমার এই মেয়ে দু'টো খুব সুন্দরী। বলাতো যায় না, বিজয়ী সৈন্যরা আবার আমার মেয়েদের লাঞ্ছিত করে কি-না। এই আশঙ্কায় আমি তাদের নিয়ে পালিয়ে এসেছি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, বেরাতেই আমরা নিরাপদ ছিলাম।

হুজুর! দয়া করে আপনার সাথীদের কাছ থেকে আমার মেয়ে দু'টিকে উদ্ধার করে দিন। ওরা ওদের মেরে ফেলবে। আমার অনেক সোনাদানা ওরা নিয়ে গেছে, সব আপনারা নিয়ে নিন তবুও আমাদেরকে এদের হাত থেকে রক্ষা করুন। আমার সাথে যা আছে তাও আপনাদের দিয়ে দেবো। তবুও আপনারা আমার মেয়ে দু'টির প্রতি একটু দয়া করুন।"

বৃদ্ধ হিন্দুর কথা শুনে আলেম বুঝতে পারলেন কারামাতীরাই এই অপকর্মের হোতা। কারণ, কারামাতীদের কাছে জীবন মানে ভোগ আর সম্ভোগ। ওরা বেঁচেই

থাকে পাপকর্মের জন্য। সুন্দরী মেয়ে দু'টিকে দেখে ওরা আর লোভ সামলাতে পারেনি। ওদের কাছে নারীভোগ পাপ নয়, পুরুষের অধিকার।

"তোমাদের কাছে কি অস্ত্র নেই?" হিন্দুদের জিজ্ঞেস করলেন আলেম।

"মালপত্রের সাথেই ছিল আমাদের তরবারী। ওরা আমাদের উপর এভাবে হামলে পড়ল যে, আমরা তরবারী হাতে নেয়ার সুযোগ পেলাম না। ওরা আমাদের মারপিট করে সব ছিনিয়ে নিয়েছে। নিরুপায় হয়ে আমরা এখন বেরার দিকে ফিরে যাচ্ছিলাম, এ সময় আপনারা আমাদের দাঁড়াতে বললেন।"

আলেম তার তিন সাথীকে বললেন, "এই হিন্দুকে আমাদের এ কথা বুঝাতে হবে যে, মুসলমানদের কাছে নারীর ইজ্জত ধর্ম বর্ণের উর্ধ্বের বিষয়। মুসলমান যে কোন ধর্মের নারীর ইজ্জত রক্ষার্থে জীবন বাজী রাখতে কুণ্ঠাবোধ করে না। নারীর মর্যাদা রক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী কর্তব্য। আজ আমাদের একথা প্রমাণের সময় এসেছে যে, মুসলমানরা কর্তব্য পালনে কতটুকু নিষ্ঠাবান। আমাদের চোখের সামনে দু'টি অসহায় নারীর ইজ্জত লুণ্ঠিত হবে আর আমরা নিশ্চুপ বসে থাকবো তা হতে পারে না। আশা করি তোমরা এদের ইজ্জত রক্ষায় জীবন বাজী রাখতে পিছপা হবে না। আমি তোমাদের সাথে আছি। এসো এক সাথে পাষণ্ডদের রুখে দাঁড়াই, আল্লাহ্ আমাদের মদদ করবেন।"

আলেম সাথীদের বললেন, "কেউ আবেগপ্রবণ হয়ে তাড়াহুড়ো করো না। আগে ওদের অবস্থা পরখ করে নাও, তারপর সুযোগ মতো আঘাত হানো। ওদের দেখে মনে হয় প্রশিক্ষিত সৈনিক।"

আলেম ও সাথীরা ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন কারামাতীদের তাঁবুর দিকে। ওদের তাঁবুটি ছিল একটা টিলার ঢালে। আলেম টিলার পাশ ঘেঁষে পিছন দিক থেকে দেখে নিলেন ওদের অবস্থা। মশাল জ্বলছে, কারামাতী চার পাষণ্ড দুর্বাঘাসের উপর বসে মদ গিলছে আর অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ছে। তরুণী দু'জন সম্পূর্ণ নিরাবরণ। মদের সুরাহী ওদের হাতে। যেই ওদের পানপাত্র খালি হয়ে যাচ্ছে মেয়ে দু'টো আবার ঢেলে দিচ্ছে। কারামাতীরা মদে অভ্যস্ত। এই মদ ও পানপাত্র ওদের সাথেই ছিল কিন্তু নিজেদের মুসলমান বুঝাতে এরা গতদিন মদ বের করেনি।

দীর্ঘক্ষণ আলেম ও সাথীরা কারামাতী হায়েনাদের অপকর্ম দেখলেন। যুবতী দু'টোকে নিয়ে এরা কাবাবের মতো টানাটানি করছে। একজন ছেড়ে দিচ্ছে তো আরেকজন আবার কোলে টেনে নিচ্ছে। সেই তালে চলছে সুরাপান। এক পর্যায়ে কারামাতী কমান্ডার উঠে দাঁড়িয়ে গেল। বেশি মদ পানের কারণে ওর পা দুটো

টলছিল। দাঁড়িয়ে নিজের কাপড় খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল কমান্ডার। আর একটি মেয়েকে পাঞ্জায় নিয়ে ঘাসের উপর শুইয়ে দিয়ে হামলে পড়ল তার উপর। আলেম সাথীদের উদ্দেশ্যে বললেন, "আঘাত হানো।"

সাথীরা সবাই এক সাথে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কারামাতীরা ছিল মদে চুরচুর। আঘাত প্রতিরোধের কোন সুযোগ পেল না কেউ। আলেমের তরবারীর প্রথম আঘাতেই কমান্ডারের মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। যে তরুণীকে নিয়ে কারামাতী কমান্ডার আদিমতায় মেতে উঠেছিল সে একটা চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। কারামাতীর রক্তে স্নাত হয়ে গিয়েছিল মেয়েটি। আলেমের সাথীরা অন্য তিন নরপশুরও ইহলীলা সাঙ্গ করে দিল।

বেহুঁশ তরুণীর চোখে মুখে পানির ঝটকা দেয়া হলে সে জ্ঞান ফিরে পেল। উভয় তরুণীকে বলা হলো কাপড় পরে নিতে। ঘটনার আকস্মিকতায় ওরা নির্বাক হয়ে পড়েছিল। ওরা ভেবেছিল, চার নরপশুর পাঞ্জা থেকে তারা আরেক দল পাষণ্ডের কব্জায় পড়েছে। কিন্তু তাদের ধারণা পাল্টাতে বেশি সময় লাগল না। অল্প সময়েই তারা বুঝতে পারল, এরা হায়েনারূপী মানুষ নয়, ঘোর এ দুঃসময়ে তাদের জন্যে রহমতের দূত।

আলেম দু' হিন্দু পুরুষকে বললেন, "তোমরা তোমাদের ছিনিয়ে নেয়া মালপত্র মুদ্রা ও অলংকারাদি ওদের আসবাব থেকে বের করে নাও। প্রয়োজনে ওদের উট ঘোড়াসহ সবকিছুই তোমরা নিয়ে যেতে পার।"

হিন্দুরা কারামাতীদের দেহ ও গাঠুরী তল্লাশী করে তাদের সোনা গহনা ও মুদ্রা উদ্ধার করল। আলেম হিন্দু বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, "এতো স্বর্ণমুদ্রা ও অলংকার নিয়ে প্রহরী ও সওয়ারী ছাড়া এ পথে পা বাড়ালে কেন?"

হিন্দু বৃদ্ধ জানাল, "মুসলমান বিজয়ীরা বেরা থেকে কোন হিন্দুকেই বাইরে যেতে এবং ভেতরে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। তাই আমাদের লুকিয়ে ছাপিয়ে আসতে হয়েছে। কোন সওয়ারী সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।"

"এখন তোমরা আমাদের হেফাযতে থাকবে। তোমরা ইচ্ছা করলে আমাদের সাথে বেরায়ও ফিরে যেতে পার, আর চাইলে আমরা তোমাদেরকে মুলতান পর্যন্ত পৌছে দিতে পারি।" বললেন আলেম।

বৃদ্ধ হিন্দু কিছু স্বর্ণমুদ্রা ও অলংকার আলেমের সামনে রেখে বলল, "এখন যেহেতু আমরা উট ও ঘোড়া পেয়ে গেছি, মুলতান যেতে আর অসুবিধা হবে না। আপনারা আমাদের প্রাণ রক্ষা করেছেন। মেহেরবানী করে এই নজরানা কবুল করলে কৃতজ্ঞ হবো।"

"হু, তোমরা কি আমাদেরকে ভাড়াটে খুনী ভেবেছো!" ক্ষুব্ধকণ্ঠে গর্জে উঠলেন আলেম। "সম্পদের লিপ্সা থাকলে তরবারীর আঘাতে তোমাদের সবকিছু আমরা ছিনিয়ে নিতে পারতাম। এসব রাখো। আজ রাত আমাদের এখানে আরাম করো। তরুণীদের ঝর্ণায় নিয়ে গা ধুইয়ে আনো। জানোয়ারটার রক্তে ওদের শরীর মেখে গেছে।"

আলেম ও সাথীদের এই সৌজন্য ব্যবহার ছিল হিন্দুদের কাছে অকল্পনীয়। আলেম একথা বলার পর যুবকটি তরুণী দু'টিকে ঝর্ণায় নিয়ে গেল রক্ত মাখা শরীর পরিষ্কার করাতে।

আলেম হিন্দু বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন, "বেরার অবস্থা কি?" বৃদ্ধ বলল, "বেরার অবস্থা খুবই শোচনীয়। বেরার বাইরে হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছে। যুদ্ধে উভয় বাহিনীর অর্ধেকের বেশি সৈন্য মারা গেছে। রাজা বিজি রায় আত্মহত্যা করেছেন।" বৃদ্ধ আরো বলল, "মুসলমান সৈন্যসংখ্যা এখন এতো কম যে যদি কোন বহিঃশত্রু আক্রমণ করে বসে তাহলে সুলতান মাহমূদ বেরাকে রক্ষা করতে পারবেন না।"

"কার পক্ষ থেকে আক্রমণ আশঙ্কা রয়েছে?"

"আক্রমণ করলে রাজা আনন্দ পাল করতে পারেন। শুনেছি, পেশোয়ারের কাছে আনন্দ পাল সুলতান মাহমূদের অগ্রাভিযান রুখে দেয়ার জন্যে পথ রোধ করেছিলেন। কিন্তু সুলতানের বাহিনী নদী পেরিয়ে আনন্দ পালের সৈন্যদেরকে এভাবে ঘিরে ফেলে যে বহু কষ্টে জীবন নিয়ে পালিয়ে গেছেন আনন্দ পাল। এখন রাজধানীতে রাজা আনন্দ পালের ছেলে শুকপাল রয়েছে। ইচ্ছে করলে সে বেরা আক্রমণ করতে পারে।"

"আচ্ছা! আপনারা কোত্থেকে এসেছেন?" আলেমকে জিজ্ঞেস করল হিন্দু বৃদ্ধ।

"মুলতান থেকে এসেছি আমরা। আমরা মুলতানের অধিবাসী।"

"তাহলে তো আপনারা অবশ্যই কারামাতী। আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী।"

"না, আমরা কারামাতীদের দুশমন। তুমি আমাদের সাথে নির্ভয়ে কথা বলতে পার, আমরা তোমাদের নিরাপত্তার ওয়াদা করেছি। তোমাদের কোন ক্ষতি করবো না, ক্ষতি করতেও কাউকে দেবো না।" বললেন আলেম।

আলেমের কথা শুনে ম্লান হয়ে গেল হিন্দু বৃদ্ধের চেহারা। আলেম লক্ষ্য করলেন, বয়স্কা মহিলাকে এই লোকটি নিজের স্ত্রী পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু দেখে

মনে হয় না এরা স্বামী-স্ত্রী। ইতোমধ্যে ঝর্ণা থেকে রক্তমাখা শরীর পরিষ্কার করে হিন্দু যুবকের সাথে ফিরে এসেছে দু' যুবতী। আলেম গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলেন ওদের। যুবকটির চেহারা ও অবয়বের সাথে তরুণীদের কোন মিল নেই। তরুণী দু'টির রাজকুমারীর মতো অবয়ব। গায়ের রঙও ওদের ফর্সা আর ওদের কথিত মা নিকষ কালো। মা মেয়ে এবং ভাই বোন ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেমন না আছে বয়সের সামঞ্জস্য, না আছে ওদের চেহারার আদল অভিব্যক্তির মিল। বস্তুত বয়স্কা মহিলাটিকে ওদের সেবিকা বলেই মনে হয়। আর যুবকটি ওদের কোন হুকুম বরদার।

"এই মৃত বদমাশগুলো তোমাদের পালিয়ে যেতে দিয়েছিল, আমরা তোমাদের যেতে দেবো না। এদের মতো আমরা তোমাদেরকেও হত্যা করব। আর মেয়ে দু'টিকেও নিয়ে যাবো। এই মহিলাকে রেখে যাবো এখানেই। যেন কোন হিংস্র জানোয়ার ওকে খেয়ে ফেলে। যদি আমাদের মিথ্যা বলো, তোমাদের এই পরিণতিই বরণ করতে হবে। আর যদি সত্য কথা বলো, তাহলে তোমাদের সসম্মানে গন্তব্যে পৌছে দেয়া হবে। এই মেয়ে দু'টি তোমার কন্যা নয়, আর এই যুবক ওদের ভাই নয়, এই মহিলাও ওদের মা নয়। ঠিক নয় কি? আমরা তোমাদের জীবন বাঁচিয়েছি, তোমাদের নিরাপদে গন্তব্যে পৌছে দেয়ার ওয়াদা করেছি অথচ তোমরা আমাদের সাথে মিথ্যা পরিচয় দিচ্ছো। তোমরা কি বলোনি, কারামাতীরা তোমাদের সুহৃদ?"

আলেমের কথায় পাণ্ডুর হয়ে গেল হিন্দু বৃদ্ধের চেহারা। সে বলল, হ্যাঁ, বলেছিলাম। ওদেরকে এ কথা বলার কারণেই ওরা আমাদের ছেড়ে দিয়েছিল।

"দেখো, রাজা-বাদশাহ-যুদ্ধ-ক্ষমতা এসবের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা ব্যবসায়ী, ব্যবসা আমাদের পেশা। তোমরা সঠিক পরিচয় দিলে আমরা আমাদের কৃত অঙ্গীকার পালন করবো।"

আপনারা আমাদের জীবন রক্ষা করেছেন। আমাদের বখশিশ পর্যন্ত নেননি। আমাদের মুখে সত্য কথা শুনে যদি আপনারা খুশি হন তবে মনে করব আপনাদের কিছুটা হলেও কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পেরেছি। তাহলে শুনুন, আমি এদের পিতা নই, ওই বয়স্কা মহিলাও এদের মা নয়। আসলে এই তরুণী দু'জনের সেবিকা সে। যুবকটি এদের সেবক।

"সত্য ঘটনা বলো। অবশ্যই বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে তোমরা মুলতান যাচ্ছিলে?" জিজ্ঞেস করলেন আলেম।

"আপনার ধারণা ঠিক। আমরা মুলতানের শাসক দাউদ বিন নসরের কাছে এ পয়গাম নিয়ে যাচ্ছিলাম যে, সুলতান মাহমূদের কাছে এখন সৈন্যসংখ্যা খুবই কম। দাউদ যদি এ মুহূর্তে বেরা আক্রমণ করে তাহলে সুলতান মাহমূদ বেরা কব্জায় রাখতে ব্যর্থ হবে। কারণ, দাউদ যদি বেরা ঘেরাও করে তাহলে বেরাতে যে তিন হাজার হিন্দু সৈনিক বন্দী রয়েছে এবং মন্দিরগুলোতে যেসব হিন্দু যোদ্ধা লুকিয়ে রয়েছে এবং যেসব হিন্দু নাগরিক সুলতানের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সুযোগে নিজের বাড়িঘরে রয়েছে সবাই একসাথে বিদ্রোহ করে সুলতানের মোকাবেলায় ঝাঁপিয়ে পড়বে। অভ্যন্তরীণ ও বহিঃআক্রমণের মুখে মুষ্টিমেয় সৈন্য দিয়ে কিছুই করতে পারবে না সুলতান। সুলতানকে পরাজিত করার এ এক মোক্ষম সুযোগ। আমরা এ সংবাদ নিয়েই মুলতান যাচ্ছিলাম।"

"তোমাদেরকে কে পাঠিয়েছে?"

"পরাজয়ের পর বিজি রায়ের সেনাবাহিনীর কয়েকজন শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তা মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছে। আমি বিজি রায়ের সরকারের মন্ত্রী ছিলাম। অন্যান্যের মতো আমিও মন্দিরে আত্মগোপন করেছিলাম। মন্দিরেই আমরা গোপনে সলাপরামর্শ করে ঠিক করি, এ মুহূর্তে যে করেই হোক দাউদ বিন নসরকে বেরা আক্রমণে রাজি করানো জরুরী। সবাই মিলে আমাকেই এ কাজে প্রতিনিধিত্ব করতে সাব্যস্ত করলেন। দাউদের জন্য উপহার হিসেবে সোনা গহনা, মুদ্রা ছাড়াও দেয়া হলো এই মেয়ে দু'টিকে। এরা রাজমহলের প্রশিক্ষিত রক্ষিতা। নারী, সম্পদ ও ক্ষমতার প্রতি আজন্ম লিপ্সা দাউদের। ওর এ চরিত্রের কথা ভালভাবে জানে হিন্দুরা। তাই দাউদের সাথে তারা অর্থ ও নারীর ভাষায়ই কথা বলে। এই মেয়ে দু'টি বিজি রায়ের পরাজয়ের পর মন্দিরেই আত্মগোপন করেছিল। তাদেরকে বহু বলে কয়ে বুঝানো হলো যে, তাদেরকে দাউদের কাছে একটি মিশনে পাঠানো হচ্ছে। তারা নিজেদেরকে বিলিয়ে দিয়ে যে ভাবেই হোক দাউদকে যেন বেরা আক্রমণে রাজী করায়। হৃতরাজ্য উদ্ধার ও ধর্মের খাতিরে মেয়েরাও রাজী হয়।

আপনি যেসব সোনা গহনা দেখেছেন, এগুলো ছাড়াও আমাদের কাছে আরো মণিমুক্তা রয়েছে। এগুলো ডাকাতরা খুঁজে পায়নি। আপনাকে আমি অনুরোধ করছি, আমাদের কাছ থেকে কিছু সম্পদ আপনারা রেখে দিন। আপনারা আমাদের জীবন রক্ষা করেছেন।" বলল হিন্দু বৃদ্ধ।

"আলেম বৃদ্ধকে ধমকের সুরে বললেন, তোমাকে নিঃশেষ করে দিচ্ছি, সোনা গহনা টাকার কথা আমার সামনে আর বলবে না। এসবের প্রতি আমাদের লোভ

নেই। রাজ্য রাজা আর যুদ্ধের যে কাহিনী বলছো, তাতেও আমাদের কিছু যায় আসে না। আমাদের কাছে বড় বিষয় হলো, তোমাদেরকে নিরাপদে মুলতান পৌঁছে দেয়ার অঙ্গীকার পালন করা। তোমাদের রাজার পরাজয় ও আত্মহত্যার পরও কি তোমাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা পরাজয় মেনে নিতে পারেনি?" বৃদ্ধের অন্তরের আরো গভীর থেকে সত্য বের করার জন্যে কৌশলের আশ্রয় নিলেন আলেম।

"পণ্ডিতেরা হিন্দু-মুসলমান বিরোধকে ধর্মের অংশ মনে করছেন। পণ্ডিতেরা হিন্দুদের বলছে, মাহমূদ গযনবীর অবস্থান যদি বেরায় মজবুত হয়ে পড়ে তবে শুধু যে আমরা রাজ্যহারা হলাম তাই নয়, গোটা ভারত থেকে হিন্দুত্ববাদ বিলীন হয়ে যাবে। মুহাম্মদ বিন কাসিমের মতো সারা ভারতে সুলতান মাহমূদও ইসলাম ছড়িয়ে দেবে। তাই মুসলমানদের অগ্রগতি রোধ করা প্রত্যেক হিন্দুর ধর্মীয় কর্তব্য। ধর্মের জন্য প্রত্যেক হিন্দু নারী-পুরুষের জীবন বাজী রাখতে হবে। মুসলমানদেরকে হত্যা করা আজ হিন্দুদের প্রধান পুণ্যের কাজ। আপনি মুসলমান, আপনার কাছে হয়তো আমার কথা পীড়াদায়ক মনে হবে, কিন্তু আমি আপনাকে সত্য বলার অঙ্গীকার করেছি, এজন্য প্রকৃত সত্যই বলে দিলাম। এখন আপনি ইচ্ছা করলে আমাদের হত্যাও করতে পারেন, ইচ্ছা করলে ছেড়ে দিতে পারেন।"

এই হিন্দু বৃদ্ধ ও যুবক কোন সামরিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোক ছিল না, ছিল গোড়া হিন্দু। ধর্মের ভাবাবেগে সোনা গহনা ও তরুণী দু'টিকে সাথে নিয়ে রাস্তার বিপদাপদের কথা না ভেবেই ধর্মীয় মিশনে বেরিয়ে পড়েছিল। সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে এতো সহজে এরা ভড়কে যেতো না এবং ভীত-বিহ্বল হয়ে কঠিন সত্যগুলো এত সহজে প্রকাশ করত না। আলেম ওদেরকে অভয় দিলেন, বললেন, "তোমাদের ভয় নেই, আমরা তোমাদের উপর কোন জুলুম করবো না।" আলেম আরো বললেন, "তোমরা এখন নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারো, আমার লোকেরা তোমাদের পাহারা দেবে।"

এদের কাছে একজন সাথীকে প্রহরায় নিযুক্ত করে অপর দুজনকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে আলেম পরামর্শে বসলেন। দীর্ঘ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন, এদেরকে মুলতানের পথে ছেড়ে দিবেন এবং তারা দ্রুত বেরায় পৌঁছে সুলতানকে জানাবেন মুলতানের অবস্থা। একথাও বলবেন, সুলতান যেন মন্দিরে লুকিয়ে থাকা হিন্দু সৈনিক ও দুষ্কৃতকারী পণ্ডিতদের গ্রেফতার করেন আর বিজি রায়ের ছেলে ও দাউদের আক্রমণ সম্পর্কে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন।

দরবেশকে অপহরণকারী কারামাতীরা মাঝ রাতে রওয়ানা হয়ে তীব্রগতিতে পথ চলে দিনের শেষ ভাগেই মুলতান পৌঁছে গিয়েছিল। এরা দরবেশকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় দাউদের সামনে ফেলে দিয়ে বললো, "হুজুর! এই সেই চার-কুমারী দুর্গের ঘাতক। এই লোকটিই সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করে প্রহরীকে হত্যা করেছে।" তারা কিভাবে দরবেশের কাছ থেকে রহস্য জেনেছে এবং তাকে অপহরণ করেছে সবিস্তারে সব জানাল।

দাউদ বিন নসরকে যখন একথা জানাল যে, দরবেশের সাথে আরো চার ব্যক্তি ছিল এবং তারা বেরার পথে রয়েছে। তখন দাউদ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে গর্জে উঠল, "ওদেরকেও ধরে নিয়ে আসলে না কেন?"

কমান্ডার শুধু একে নিয়ে আসতে নির্দেশ দিয়েছিল। কমান্ডার এই খুনীর সাথীদের সাথেই বেরা যাচ্ছে।

এ খবর শুনে দাউদ দশ বারোজন চৌকস সৈনিককে শক্তিশালী ঘোড়া নিয়ে দ্রুত দরবেশের অপর সাথীদেরকেও ধরে নিয়ে আসার নির্দেশ দিল। নির্দেশ পেয়েই তারা রওয়ানা হয়ে গেল দরবেশকে অপহরণকারী দুই সৈনিককে সাথে নিয়ে। এরা দ্রুতগামী ঘোড়া নিয়ে চোখের পলকে শহর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাতের দ্বিপ্রহর। আলেম ও তার দুই সাথী একজনকে পাহারায় নিযুক্ত করে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ অনেকগুলো অশ্বখুরের আওয়াজ শোনা গেল। দ্রুতই শব্দটা এগিয়ে এলো তাঁবুর দিকে। পাহারাদার তার সাথী ও হিন্দুদেরকেও জাগিয়ে দিল। আলেম জেগেই আঁচ করলেন বিপদাশঙ্কা। তিনি দ্রুত প্রস্তুতি নিয়ে মেয়েদেরকে টিলার আড়ালে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যে মশালবাহী কয়েকজন অশ্বারোহী এদিকটায় কি যেন খুঁজতে লাগল। যেখানে কারামাতীদের লাশ পড়েছিল মশালের আলোয় নজরে পড়ল ওদের। কাছে গিয়ে ওরা ওদের চেহারা পরখ করে এদিক সেদিক তাকাল। অনতিদূরেই ছিল ওদের উট ও ঘোড়াগুলো বাঁধা। উট ও ঘোড়া দেখে ওদের বুঝতে বাকী রইল না অবশ্যই ধারে কাছে মানুষ রয়েছে। এদের সাথে আরো এসে যোগ হলো আট দশজন অশ্বারোহী। সবাই সমস্বরে হুশিয়ার ধ্বনি দিতে শুরু করল কাউকে না দেখে। চিৎকার করে বললো, যারাই এখানে আছো বেরিয়ে এসো। না হয় কাউকেই জীবিত রাখা হবে না।

কয়েকবার এমন হুমকি দেয়ার পরও যখন কোন সাড়া পেল না তখন খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিল। টিলার চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল সবাই। প্রথমেই তাদের নজরে পড়ল মেয়ে দু'টি। মেয়ে দু'টিকে তারা ধরে ফেললো। বয়স্ক হিন্দু

দু'জনও বেরিয়ে আসলো আড়াল থেকে। অশ্বারোহীরা বলল, আমরা মুলতানের শাসক দাউদ বিন নসরের লোক তোমাদের এগিয়ে নিতে এসেছি। কিন্তু দরবেশকে অপহরণকারী দুই কারামাতী বলল, "আমরা যাদের খোঁজে এসেছি, এরা সেই লোক নয়। ওদের সাথে কোন নারী ছিল না।"

"এদেরকে কারা হত্যা করেছে?" কারামাতীদের লাশের দিকে হিন্দুদেরকে জিজ্ঞেস করল এক অশ্বারোহী।

"আমরা জানি না।" বলল বৃদ্ধ হিন্দু। "আমরা বেরা থেকে এসেছি। দাউদ বিন নসরের জন্য একটি পয়গাম নিয়ে মুলতান যাচ্ছিলাম, আমরা এখানে তাঁবু খাটানোর আগে থেকেই লাশগুলো পড়েছিল।"

"মিথ্যা বলছো তোমরা।" হুমকির স্বরে বলল দলনেতা। "কি পয়গাম নিয়ে মুলতান যাচ্ছো তোমরা?"

"আমাদের মুলতান যেতে দাও, যা বলার তা তোমাদের শাসক দাউদকেই বলব, আর কাউকে বলা যাবে না।" বলল বৃদ্ধা।

এক অশ্বারোহী তাদের বিছানাপত্র দেখে চেঁচিয়ে উঠল। "এখানে তো অনেক বিছানা। লোক তো দেখা যাচ্ছে কম। নিশ্চয়ই আরো লোক এখানে শুয়েছিল, তারা কোথায়?"

"এই মেয়েদের ন্যাংটা করে ফেলো।" নির্দেশ দিল কমান্ডার। "বুড়ো দু'টিকে ঘোড়ার পিছনে বেঁধে টেনে-হেঁচড়ে মুলতান পর্যন্ত নিয়ে যাও। মেয়েদেরকে টিলার আড়ালে নিয়ে চল। দেখবে অল্পের মধ্যে এদের দেমাগ ঠিক হয়ে যাবে।"

মেয়েরা দেখতে পেল দৈত্যের মতো চৌদ্দজন অশ্বারোহী। চার পাঁচজন কমান্ডারের নির্দেশে তাদেরকে ন্যাংটা করতে অগ্রসর হলে মেয়ে দুটো চিৎকার শুরু করল। ততক্ষণ পর্যন্ত হিন্দু বৃদ্ধ ও যুবক আলেম ও তার সাথীদের সম্পর্কে মুখ খুলেনি।

যেই ওরা মেয়েদের কাপড় ধরে টানাটানি শুরু করল তখন আড়াল থেকে আওয়াজ এলো, "সাবধান! মেয়েদের গায়ে হাত তুলবে না, আমাদের গ্রেফতার করতে পার, এদেরকে আমরাই খুন করেছি।"

দৃঢ় পায়ে ওদের সামনে এগিয়ে এলেন আলেম। তিনি মেয়েদের বেইজ্জতি দেখে ওদের সামনে আত্মপ্রকাশ করলেন। সাথীরা তার অনুগামী হলো। আলেম বললেন, "অযথা মেয়েদের উত্ত্যক্ত করো না। তোমাদের শাসকের কাছে নিয়ে চলো আমাদেরকে। যা বলার মুলতানের দরবারেই বলব সব।"

* * *

মুলতানের রাজদরবার। দাউদের রোষাগ্নিতে পতিত দরবেশ। বিস্ময়কর সেই প্রহরী হত্যার নায়ককে নিজেই জিজ্ঞেস করছিল দাউদ।

"তুমি কিভাবে সুড়ঙ্গ পথে ঢুকলে? প্রহরীকে হত্যা করলে কেন?"

"আমি তোমার এই প্রহরীকে হত্যা করেছি একথা প্রমাণ করতে যে, মৃত কুমারীদের জীবন্ত করে উপস্থিত করা এবং জিনকে বেঁধে রাখার ক্ষমতা মুলতান শাসকের নেই।" "দৃঢ়কণ্ঠে দাউদের জবাব দিল দরবেশ। "এ বিষয়টিও আমি প্রমাণ করতে চেয়েছি যে, এখানে কোন জিন-দানব নেই, কোন ভূত-প্রেতও নেই। কারামাতীদের এই দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং প্রতারণা।"

প্রচণ্ড আক্রোশে দরবেশের চেহারায় একটা চপেটাঘাত করল দাউদ। বলল, "এতো বড় স্পর্ধা! আমার দরবারে দাঁড়িয়ে আমার কেরামত সম্পর্কে কটূক্তি করছো তুমি! তুমি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছো! জানো! তোমার জীবন-মৃত্যু এখন আমার হাতের মুঠোয়! আমার হাত থেকে তোমাকে এখন কে বাঁচাবে?"

"মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ আমাকে বাঁচাবেন।" দৃঢ়কণ্ঠে বললেন দরবেশ। "দাউদ! ফেরাউন ক্ষমতার দম্ভে খোদা দাবী করেছিল। তার পরিণতির কথা তুমি জান। তোমার পরিণতি ফেরাউনের চেয়েও ভয়ংকর হবে দাউদ! আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমার দিন শেষ হয়ে এসেছে, অচিরেই তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে।"

আবারো কষে একটা থাপ্পড় মারল দাউদ। ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল, "আমার পায়ের নীচের একটি পিঁপড়ার চেয়েও নিকৃষ্ট তুমি। তোমার সাথে তর্ক করতেও আমার ঘৃণা হয়। একথা তোমাকে বলতেই হবে, তোমার সাথে কে কে ছিল এবং বেরায় কোন উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলে?"

"আমি একা। আল্লাহ্ ছাড়া আমার আর আপন কেউ নেই।" বলল দরবেশ। "তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব হলো, আমি বেরা যাচ্ছিলাম ঠিক তবে কেন যাচ্ছিলাম তা কখনও বলবো না।"

"তোমরা মাহমূদ গযনবীকে একথা বলতে যাচ্ছিলে যে, সে যেন মুলতান দখল করে কারামাতী শাসন ধ্বংস করে দেয়।" বললো দাউদ। "তুমি তো আমার কারামাতী দেখলে, তুমি বিজন প্রান্তরে একটা কথা বললে আর এতো দূরে থেকেও আমরা তা জেনে গেছি। তুমি আমার প্রশ্নের জবাব না দিলে পস্তাবে। তোমার হাড্ডি থেকে আমরা গোশ্ত আলাদা করে ফেলব। একটু পরে তুমি চিৎকার করে আমার কথার জবাব দেবে কিন্তু তখন আর তোমার জবাব আমরা শুনবো না। আজ রাত তোমাকে চিন্তা-ভাবনা করার অবকাশ দেয়া হলো। কয়েদখানায় বসে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা কর। আগামীকাল তোমাকে জবাব

দিতে হবে, তোমার সাথে আর কে কে ছিল। সুড়ঙ্গ পথে তুমি কিভাবে প্রবেশ করেছিলে এবং সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দা মুলতানে কতজন আছে এবং এরা কোথায় থাকে?"

"ঠিক আছে, এসব প্রশ্নের জবাব না হয় আগামীকালই শুনবে। কিন্তু আজ শুনে রাখো, ক্ষমতার তখ্‌ত কারো জন্যে স্থায়ী নয়। ক্ষমতার মোহে পড়ে পৃথিবীতে বহু লোক ধ্বংস হয়েছে। তোমার মতো লোকেরা ক্ষমতার মসনদে বসে যখন মাথায় রাজমুকুট পরে তখন আল্লাহ্‌র ক্ষমতার কথাটি ভুলে যায়। তোমার মতো শাসকেরাই ক্ষমতায় বসে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়, জুলুম-অত্যাচার চালায়। কিন্তু আল্লাহকে কেউ ধোঁকা দিতে পারে না। আল্লাহ্‌ সব সময় মজলুমদের পক্ষে, জালেমদের বিরুদ্ধে। তুমি মিথ্যা পয়গাম্বরী দাবী করে আল্লাহ্‌র সত্যধর্ম ইসলামকে বিকৃত করেছো, স্বাধীন মানুষকে দাসে পরিণত করেছো। ধর্মের আশ্রয়ে নারীদের সম্ভ্রম লুটে নিয়ে তুমি ধর্মকে কলংকিত করেছো। তোমার মিথ্যা প্রকাশ করে দেয়ার জন্যই আমি সুড়ঙ্গ পথে প্রবেশ করে তোমার নিযুক্ত প্রহরীকে খুন করেছি। তুমি মহাপাপী। তোমার পাপ আল্লাহ্‌ কখনও ক্ষমা করবেন না।"

গর্জে উঠল দাউদ। "নিয়ে যাও একে! বন্দিশালায় আটকে রাখো।"

কয়েকজন রক্ষী দৌড়ে এসে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে চলল দরবেশকে। দরবেশের ভরাট কণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল, "দাউদ! তোমার মিথ্যা দাবী ও পাপাচারের দিন শেষ। তোমার মসনদের উপরে আমি জহরের বজ্রপাত দেখতে পাচ্ছি ...! দাউদ, আল্লাহ্‌র গজবকে তুমি বন্দী করতে পারবে না। আল্লাহ্‌র গজব তোমাকে ধ্বংস করবেই।"

"জাঁহাপনা! আমাকে অনুমতি দিন ওর ধৃষ্টতা জীবনের জন্যে খতম করে দেই।" দাউদকে নিশ্চুপ দাঁড়ানো দেখে বলল এক দরবারী। সে আরো বলল, "কারামাতী আদর্শের অপমান আপনাকে নীরবে সহ্য করতে দেখে আমি আশ্চর্য হচ্ছি জাঁহাপনা!"

"মুলতানে আমার হাজারো শত্রু বেড়ে উঠেছে। আমার আস্তিনের মধ্যে রয়েছে কালসাপ। ওর কাছ থেকে আমাকে জানতে হবে, কে কোথায় রয়েছে। নয়তো একে তো আমি দরবারেই শেষ করে দিতে পারতাম।"

"এর সাথে যারা ছিল তারাও হয়তো ধরা পড়বে।" বলল এক দরবারী।

"উধাও হয়ে যেতে পারে।" বলল দাউদ। এদের চেয়েও আমার দৃষ্টি এখন মাহমূদের দিকে। মাহমূদের গতিবিধি সম্পর্কে বেরা থেকে একটা নিশ্চিত খবর

পাওয়া খুব জরুরী। তার এক সেনাপতিকে হাত করে আমরা ফাঁদে ফেলতে পেরেছিলাম, কিন্তু আমাদের সে ধোঁকা ব্যর্থ হয়ে গেছে। খবর পেয়েছি, আমাদের নীল নক্‌শা ফাঁস হওয়ার ফলে সে আত্মহত্যা করেছে। বিজি রায় পরাজিত হয়ে আত্মাহুতি দিয়েছে। মাহমূদ গযনীর হাতে সৈন্য কম বলেও তার মাথায় বুদ্ধি আছে। অথচ হিন্দুস্তানে সৈন্যের অভাব নেই কিন্তু বুদ্ধির ঘাটতি রয়েছে প্রচুর।"

সুলতান মাহমূদ বেরা জয় করে বিজয়ের তৃপ্তির চেয়ে প্রকট সৈন্য ঘাটতিতে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। সাম্রাজ্য বিস্তার তার নেশা নয়, ধন-সম্পদ, মণি-মুক্তা অর্জনের লোভও তার নেই। বেরা ছিল হিন্দুস্তানের মূল ভূখণ্ডের প্রথম শহর। বেরায় মুসলিম অধিবাসীর সংখ্যাও খুব কম ছিল না কিন্তু অধিকাংশ মসজিদ মন্দিরে রূপান্তরিত দেখে তার অন্তর কেঁদে উঠেছিল। তিনি বেরার কোথাও ইসলামের কোন অবিকৃত চিহ্ন দেখতে পেলেন না।

বেরা দখলের পর সর্বপ্রথম পণ্ডিতদের দল সুলতানকে স্বাগত জানাতে আসল। পণ্ডিতরা সুলতানের সামনে এসে দু' হাত জোড় করে প্রথমে তাকে নমস্কার জানাল এরপর কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে প্রণাম করল। বিজয়ের পর পেশোয়ারের পণ্ডিতরাও এভাবেই তাকে অভিবাদন জানিয়েছিল। সুলতানকে সিজদা করতে দেখে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন; ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন, "দাঁড়াও তোমরা! আমি খোদা নই। এভাবে কোন মানুষকে সিজদা করা এবং সিজদা গ্রহণ করা শির্‌ক। আমি তোমাদের শহর দখল করেছি বটে কিন্তু শহরের অধিবাসীদের প্রভু হয়ে যাইনি। আমাদের ধর্মে আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে সিজদা করা হারাম। তোমরা আমাকে গুনাহগার করছো। তোমরা কি বলতে চাও, তা বল।"

"জাঁহাপনা! আমরা আপনার কাছে আমাদের জীবন ও মন্দিরের মর্যাদা ভিক্ষা চাচ্ছি।" দু'হাত জোড় করে নিবেদন করল পণ্ডিতগণ।

"এখানকার মসজিদগুলোর যে সম্মান তোমরা দিয়েছো, মন্দিরের সে রকম মর্যাদাই কি তোমরা চাও?" পণ্ডিতদের বললেন সুলতান। "তোমরা যেমন এখানকার মুসলমানদের মর্যাদা দিয়েছিলে সে রকম মর্যাদা কি তোমরা চাচ্ছো? তোমাদের রাজমহল থেকে হিন্দু নারীর চেয়ে মুসলমান মেয়েই বেশি উদ্ধার করা হয়েছে। তোমরা যদি ধর্মের খাঁটি অনুসারী হতে তাহলে মেয়েদের এভাবে বেইজ্জতি বরদাশ্‌ত করতে না। নারীর ইজ্জত সম্ভ্রম লুণ্ঠন করাই কি তোমাদের ধর্ম?"

"মহামান্য মহারাজ! আমাদের করার কিছুই ছিল না।" বলল বড় পণ্ডিত। "আমাদের দেশে মহারাজার হুকুম ধর্মের বিধানের মতোই পালনীয়।"

"তবে তোমাদের দেশে ধর্ম মহারাজার গোলাম। আর তোমাদের মতো যারা ধর্মের কাণ্ডারী, ধর্মের পাহারাদার তারা ধর্মকে মহারাজাদের পায়ের নীচে সোপর্দ করেছো।" বললেন সুলতান। পণ্ডিত ও দুভাষীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তার একান্ত এক সেনাধ্যক্ষকে বললেন, "আমাদের ধর্মের বহু শাসক ও আলেমদের মধ্যেও এ ব্যাধি রয়েছে। আমাদের শাসকশ্রেণী, আমীর, শরীফ ও ধর্মীয় পণ্ডিতেরাও নিজেদের অপকর্ম আড়াল করতে ধর্মকে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। শাসকরা নিজেদের অপকর্ম আড়াল করতে নিজেদেরকে ইসলামের খাদেম বলে দাবী করে।"

"মুলতানের শাসক দাউদ বিন নসরও এই ব্যাধিতে আক্রান্ত।" বললো সেনাধিনায়ক।

সুলতান ও সেনাধিনায়কের মধ্যে কথোপকথন হচ্ছিল ফারসী ভাষায়। বেরার পণ্ডিতেরা ফারসী জানতো না। তাই তাদের পক্ষে সুলতানের কথা বুঝার কোন উপায় ছিল না।

সুলতান দোভাষীর মাধ্যমে বললেন, পণ্ডিতদের বলে দাও, তোমাদের দেবদেবী যদি সত্য হয়ে থাকে তবে তাদের বল তোমাদের জীবন, মান-সম্মান ও ধর্মকে যেন তারা রক্ষা করে। দেব-দেবীদের বলো, তারা নিজেদের রক্ষা করুক। আমি গুনাহ্গার বলছি, তোমাদের দেবদেবীগুলোকে যদি মন্দির থেকে বাইরে ফেলে দেই, তোমরা দেখতে পাবে, একজন গুনাহ্গার ব্যক্তির হাত থেকেও এরা নিজেদের রক্ষা করতে পারবে না। ওরা আবার মানুষের অপরাধের শাস্তি দিবে কিভাবে?

দোভাষী যখন স্থানীয় ভাষায় পণ্ডিতদের উদ্দেশ্যে সুলতানের কথা ব্যক্ত করল, পণ্ডিতদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল।

সুলতান বললেন, "আমি জানি, ধর্মের বরকন্দাজ সেজে মন্দিরগুলোতে তোমরা কতো জঘন্য অপকর্ম কর। তোমাদের ধর্মের মেয়েরাই তোমাদের ইবাদাতখানাগুলোতে সম্ভ্রম নিয়ে বাঁচতে পারে না। এজন্যই কি তোমরা কাদা-মাটি, ইট-পাথর দিয়ে দেবদেবী বানিয়ে রেখেছো, যাতে ওরা তোমাদের কোন অপকর্মে বাধা দিতে না পারে? তোমরা আমার কাছে তোমাদের ইজ্জত, সম্পদ ও মর্যাদা রক্ষার আবেদন নিয়ে না এলেও আমি কোন নারীর ইজ্জত ও কোন নাগরিকের জীবন সম্পদের ক্ষতিসাধন হতে দিতাম না। বেকসুর মানুষের জীবন সম্পদ রক্ষা করা আমার আল্লাহ্র হুকুম। আমাকে এসব থেকে আল্লাহ্

বিরত রাখেন। আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনেই আমি এখানে এসেছি। সব কাজ আমি আল্লাহ্‌র বিধান মতো সম্পাদন করার চেষ্টা করি।"

চকিতে দোভাষীর দিকে ফিরে সুলতান বললেন, "ওইসব পণ্ডিতদের তুমি জিজ্ঞেস কর, ওরা মন্দিরের ভেতরে পালিয়ে আসা হিন্দু সৈনিক, মন্ত্রী ও বড় বড় কর্তাব্যক্তিদের লুকিয়ে রাখেনি তো? ওদের জিজ্ঞেস কর, মন্দিরের ভেতরে বসে পণ্ডিতেরা আমাদের বিজয়কে নস্যাত করার জন্যে চক্রান্ত করবে না এমন গ্যারান্টি কি তারা দিতে পারবে?"

"না মহারাজ!" দোভাষীর কথা শুনে হাতজোড় করে বলল বড় পণ্ডিত। "আমরা আপনার গোলাম। মন্দিরে আপনার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র হচ্ছে না।"

"ওরা কোথায়?" ডানে বামে তাকিয়ে বললেন সুলতান। "যাদেরকে লাহোরের পথ থেকে ধরে আনা হয়েছে ওদেরকে এখানে হাজির কর।" একটু পরেই পিঠমোড়া করে হাত বাঁধা দু'জনকে দরবারে হাজির করা হলো।

পণ্ডিতদের উদ্দেশ্যে সুলতান বললেন, "তোমরা কি চেন এদের?" বন্দীদের বললেন, "তোমরা এদেরকে বল কেন তোমাদের গ্রেফতার করা হয়েছে?"

"এই পণ্ডিতরাই আমাদেরকে লাহোর পাঠিয়েছিল। লাহোরের রাজা আনন্দ পালের পুত্র শুকপালের কাছে পণ্ডিতেরা আমাদেরকে এ সংবাদ দিয়ে পাঠিয়েছিল যে, বেরা বিজয়ী সুলতান মাহমূদের সৈন্যবল একেবারেই কম। এখনই বেরা আক্রমণ করে বিজি রায়ের পরাজয় ও আনন্দ পালের পলায়নের প্রতিশোধ নিতে তারা শুকপালের বেরা আক্রমণের জন্যে অধীর অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। এরা আমাদের কাছে বলে দিয়েছিল, বেরায় যে বিপুল পরিমাণ হিন্দু সৈনিক বন্দী হয়েছে, আক্রমণ হলে তারা বিদ্রোহ করে সুলতানের বাহিনীর জন্যে ভয়ংকর হয়ে উঠবে।"

নিজ নিজ অপরাধের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দিল দুই কয়েদী।

"সন্দেহজনক অবস্থায় এদেরকে আমার সৈন্যরা পথ থেকে গ্রেফতার করেছে।" বললেন সুলতান। "আমরা এ কথাও জানতে পেরেছি, তোমরা মুলতানে দাউদের কাছেও এ ধরনের খবর পাঠিয়েছ।"

"তোমরা আমার কাছে জীবনের নিরাপত্তা চাইতে এসেছো। হে মূর্তিপূজারীরা! মনে রেখো, তোমরা আমার সৈন্যদের অগ্রাভিযান রুখতে পারবে না। তোমাদের দেব-দেবীদের বলো না, তারা আমার বিজয়কে নস্যাৎ করে দিক। তোমরা যেমন মিথ্যুক, প্রতারক, তোমাদের দেব-দেবী বিশ্বাসও ভিত্তিহীন

কাল্পনিক। তোমাদেরকে আমি এতটুকু সুযোগ দিতে পারি, তোমরা তোমাদের মূর্তিগুলো কাঁধে নিয়ে শহর থেকে চলে যাও। অন্যথায় তোমাদের স্বধর্মীয় বন্দীদের দিয়েই আমি এগুলো গুড়িয়ে দেবো। আমি যে সত্য ধর্ম নিয়ে এসেছি তা যদি গ্রহণ কর তবে নিরাপদে সসম্মানে এখানে বসবাস করতে পারবে। তোমরা তো কায়া ও দেহ পূজারী; এসব ত্যাগ করে এখন রূহ ও আত্মাকে সমৃদ্ধ কর, আল্লাহ্র দেয়া নেয়ামত আত্মাকে খোরাক দাও। এতো দিনতো শুধু দেহের স্বাদ মেটালে এখন আত্মার স্বাদ মেটাও। সম্পদ, অর্থ আর সোনা-দানাতো খুব জমিয়েছো। এসবের মধ্যে সুখ নেই। আল্লাহ্র রহমতের সুখে সুখী হও। যাও! আমার প্রস্তাব গ্রহণ করবে কি-না চিন্তা করে দেখো, এরপর আমাকে জবাব দাও।"

পণ্ডিতরা হতাশ হয়ে চলে গেলে সুলতানকে একজন আলেম বলল, "মাননীয় সুলতান! এরা গোড়া হিন্দু। এরা আপনার কাছে ইসলাম গ্রহণ করতে আসেনি, এসেছে আপনাকে ধোঁকা দিতে। এরা দেহ পূজারী, নিজেদের স্বার্থে এরা ধর্মকে ব্যবহার করছে।"

"ব্রাহ্মণরা ইসলামের ঘোর শত্রু। এরা জানে, ইসলামে জাত-পাত নেই, উঁচু-নীচু নেই। সবাই সমান। কিন্তু এরা ধর্মের নামে সমাজে শ্রেণীবৈষম্য তৈরি করে রেখেছে। এরা জানে ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের প্রভুত্ব শেষ হয়ে যাবে।"

এই আলেমের নাম হলো সাঈদুল্লাহ। তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের অধিবাসী। সেই সময়ে মুহাম্মদ বিন কাসিমের উত্তরসূরীদের মধ্যে যে স্বল্পসংখ্যক পরহেযগার লোক এ অঞ্চলে ছিলেন তন্মধ্যে সাঈদুল্লাহ্ উল্লেখযোগ্য। সুলতান মাহমূদের বেরা বিজয়ের খবর শুনে তিনি তাকে স্বাগত জানাতে হাজির হন। সুলতান মাহমূদ আলেম ও জ্ঞানীদের সম্মান করতেন। তাঁর দরবারে আলেমগণ সব সময়ই কদর পেতেন।

মৌলভী সাঈদুল্লাহ্ সুলতানকে বললেন, "এ অঞ্চলে মুহাম্মদ বিন কাসিমের একজন অনুসারী দীর্ঘদিন ধরে এমন অভিযানের জন্যে অধীর অপেক্ষা করছে। তাদের প্রত্যাশা ছিল, কোন ন্যায়পরায়ণ মুসলিম নেতা যদি এ অঞ্চলে অভিযান চালায় তবে তারা জীবনবাজী রেখে বেঈমান কারামাতী ও হিন্দু-মুশরিকদের পদানত করতে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে, যাতে মুহাম্মদ বিন কাসিমের হৃতগৌরব পুনরুজ্জীবিত করে আবার এ অঞ্চলকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আনা যায়।

মাননীয় সুলতান! হিন্দুরা স্বভাবজাত ধোঁকাবাজ। ব্রাহ্মণরা নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখতে হেন কোন অপকর্ম ও অপকৌশল নেই যা তারা করতে পারে না। আপনি দেখলেন তো, একদিকে ওরা আপনাকে পরাজিত করতে চক্রান্তের জাল বিছিয়েছে, অপরদিকে আপনার দরবারে এসে আপনার পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রাণভিক্ষা চাইছে। এদেরকে বিশ্বাস করা কঠিন। দৃশ্যত আনুগত্যের ভান করবে কিন্তু অন্তরালে আপনার প্রশাসনকে নিঃশেষ করে দেয়ার জন্য ইঁদুরের মতো কাটতে থাকবে। এরা ইসলাম গ্রহণ করলেও দুশমনী ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হতে পারবে না। ভেতরে ভেতরে ঘুণের মতো মুসলিম শাসনকে দুর্বল করতে থাকবে। ফোকালা করে দেবে আপনার প্রশাসনকে।"

"আমাদের শক্তির খুঁটি ও শিকড় তো আমাদের জাতি-ভাইয়েরাই কাটছে। ক্ষমতালিপ্সু ও দুর্নীতিপরায়ণ মুসলিম শরীফ শ্রেণীই তো আমাদের প্রশাসনকে ফোকলা করে দিচ্ছে। পারস্পরিক ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ অমিত সম্ভাবনাকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। যে সৈন্যদের কর্তব্য ছিল মুশরিক পৌত্তলিকদের নির্মূল করা, তারা ভ্রাতৃঘাতি লড়াইয়ে নিজেদেরকে ধ্বংস করছে। আপনি দেখুন, এ অঞ্চলের সব মুসলিম রাজ্য ও সৈনিক যদি ঐক্যবদ্ধ হয় তবে এক অভিযানেই সারা ভারত জয় করা সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, রাজধানী থেকে দূর অভিযানে বেরুলে সব সময় আমি উৎকর্ণ থাকি কখন না খবর আসে, প্রতিবেশী কোন মুসলিম শাসক গযনী আক্রমণ করেছে। আমাদের জ্ঞাতি শাসকরা ঈমান আমল নিলাম করে ফেলেছে। রাসূল আকরাম (সা.) যাদের হাতে ইসলাম রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, যারা মুসলিম সেনাদের পৃষ্ঠপোষকতা করার কথা তারা নিজেরাই ঈমান বিক্রি করে দিয়েছে। এরা শির্‌ক নির্মূল করার পরিবর্তে শিরকের পৃষ্ঠপোষকতা করছে।"

"মাননীয় সুলতান! আপনাকে আমরা এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি, দীর্ঘদিন ধরে বৈরী শক্তির মোকাবেলা ও অমুসলিম শাসনাধীনে থেকেও ঈমানকে আমরা বুকে পুষে রেখেছি, আপনি এখান থেকে চলে গেলেও মুসলমানের ঈমান রক্ষার জিহাদ আমরা অব্যাহত রাখবো। ইনশাআল্লাহ্।"

"এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ঈমান ব্যাপারী তো মুলতানের ক্ষমতার অধিকারী দাউদ। সে তো রীতিমতো ঈমান বিক্রির মেলা বসিয়েছে।"

"জ্বী হ্যাঁ, আমরা শুনেছি, মুলতানের শাসক দাউদ বিন নসর ও হিন্দুরা মিলে সাংঘাতিক চক্রান্ত করছে, মুসলমানরা দলে দলে ঈমানহারা হচ্ছে।"

"সেই খৃস্টানের দেমাগের প্রশংসা করতেই হয়, হতভাগা মুসলমানদের ঈমান হরণের সাংঘাতিক এক ফেরকা তৈরি করেছে। যারা কারামাতী নামে মুসলিম পরিচয় দিয়ে বেঈমানীর বাজার গরম করেছে। দাউদ কারামাতীর ইসলামের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। ধর্ম কর্ম নিয়ে ওর কোন মাথাব্যথা নেই। তার সবচেয়ে বড় চাহিদা ক্ষমতা আর ভোগ-বিলাসিতা।"

* * *

এদিকে আলেম ও তার সাথীদের বন্দী করে ফেলল কারামাতীরা। আলেম দেখলেন, চৌদ্দজন সৈনিকের সাথে মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হওয়া মানে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। এর চেয়ে ওদের অপকর্ম সম্পর্কে দাউদকে বললে হয়তো একটা সুরাহা হবে। তাই তিনি মোকাবেলা না করে স্বেচ্ছায় গ্রেফতারী বরণ করে নিলেন। সাথীরাও তার অনুগামী হলো।

কারামাতী সৈনিকরা তাদের হাত বেঁধে ফেলল। হিন্দু কাফেলাসহ সবাইকে নিয়ে রওয়ানা হলো মুলতানের উদ্দেশে।

দিনের অপরাহ্নে মুলতানের উপকণ্ঠে পৌঁছে গেল তারা। লোকজন দেখতে পেল চৌদ্দজন সৈনিকের একটি কাফেলা। তাতে তিনজন নারী দু'জন হিন্দু এবং চারজন বন্দী। বন্দীদের হাত বাঁধা। দর্শকরা আশ্চর্য হলো আলেমকে দেখে। কারণ, মুলতানে তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। আলেমের সাথী যুবকরাও অনেকের পরিচিত। কি বিস্ময়! তাদেরকে সৈনিকেরা হাত বেঁধে আনল কোত্থেকে? কি অপরাধ করেছে এরা?

যারাই এই কাফেলাকে দেখছিল, আলেমকে বন্দী দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করছিল, "এরা কি করেছে, বন্দী করা হলো কেন?"

"হত্যা! এরা হত্যা করেছে?" বলল এক সৈনিক।

"কাকে হত্যা করেছে?"

"সেনাবাহিনীর লোক হত্যা করেছে।"

"আমরা সৈন্য হত্যা করিনি ডাকাত হত্যা করেছি।" চিৎকার দিয়ে বললেন আলেম।

"আমরা এই মহিলার সম্ভ্রম হরণকারী চার কারামাতীকে হত্যা করেছি।" উচ্চ আওয়াজে বলল বন্দী এক যুবক।

"চুপ কর!" ধমকে বলল এক সৈনিক।

"আল্লাহ্‌র আওয়াজকে তোমরা শক্তি দিয়ে বন্ধ করতে পারবে না।" চিৎকার দিয়ে বলল অপর বন্দী যুবক।

অবস্থা বেগতিক দেখে সৈনিকরা তাদেরকে পেটাতে শুরু করল। তারাও আর উচ্চবাচ্য করল না।

দাউদকে খবর দেয়া হলো, দরবেশের সাথীদের গ্রেফতার করে আনা হয়েছে। আরো বলা হলো, আমাদের যে চার গোয়েন্দা বেরা যাচ্ছিল দরবেশের সাথীরা তাদেরকে খুন করেছে। সেই সাথে এ খবরও দেয়া হলো, দু'জন পুরুষ ও তিনজন হিন্দুর একটি কাফেলা বেরা থেকে পয়গাম নিয়ে এসেছে।

সবার আগে হিন্দুদেরকে ডেকে পাঠালো দাউদ। হিন্দু বৃদ্ধ দরবারে এসে দাউদকে কুর্নিশ করে দুই তরুণীকে উপঢৌকন হিসেবে পেশ করল। সেই সাথে দাউদের পায়ের কাছে একটি চামড়ার থলে মেলে ধরল। দাউদ একবার তরুণীদের আরেকবার পায়ের কাছে স্তূপীকৃত স্বর্ণমুদ্রা দেখছিল। তরুণীদ্বয় তাদেরকে বরণ করে নিতে মুচকি হাসি ও সলজ্জ আনুগত্য ও অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলল অবয়ব জুড়ে। একে তো এরা সীমাহীন সুন্দরী, তদুপরি কাউকে কাবু করতে এদেরকে দীর্ঘ ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল দক্ষরূপে। কোন্ কাজে কিসের জন্যে তাদেরকে কার কাছে পাঠানো হচ্ছে সে কথা তাদেরকে আগেই বলে দিয়েছিল পণ্ডিতেরা। তাই অল্পক্ষণের মধ্যে দাউদের মনে কামাগ্নি জ্বালিয়ে দিল তরুণী দু'টি। ওদের পটলচেরা চাউনী ও মোহনীয় ভঙ্গিতে বেসামাল হয়ে পড়ল দাউদ।

বৃদ্ধ হিন্দু জানাল, "আমি বিজি রায়ের সেনাবাহিনীর দ্বিতীয় কমান্ড ইন চীফ ছিলাম। মহারাজার পরাজয়ের পর আমরা মন্দিরে আশ্রয় নিই। পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলে মন্দিরের মধ্যে রাজকোষের অধিকাংশ স্বর্ণ, রৌপ্য লুকিয়ে ফেলা হয়েছিল। কিভাবে তাদের পরাজয় ঘটল এবং সুলতান মাহমূদের অবস্থা এখন কিরূপ সবই সবিস্তারে জানাল বৃদ্ধ। তার কাছে তাকে কোন উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে তাও ব্যক্ত করল। বলল, লাহোর ও বাটান্ডাতেও পয়গাম পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকেও সৈন্য আসবে। তখন আপনার কাজ আরো সহজ হয়ে যাবে। হিন্দু বৃদ্ধ আরও বলল, আপনি যদি শাসন টিকিয়ে রাখতে চান তবে আপনাকে বেরা আক্রমণ করতেই হবে। বেরা আক্রমণ করলে আপনি শুধু শত্রুমুক্ত হবেন না, অঢেল সম্পদও আপনার কব্জায় আসবে।

খুব গম্ভীরভাবে বৃদ্ধের কথা শুনছিল দাউদ। বৃদ্ধ বলা শেষ করার পরও দাউদের কাছ থেকে সে কোন প্রতিক্রিয়া পেল না। হিন্দু বৃদ্ধ জানতো, যুদ্ধবিগ্রহ কারামাতীদের ধাতে নেই। এই বেঈমান গোষ্ঠী চক্রান্তের ফসল। চক্রান্তই এদের প্রধান হাতিয়ার। ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও ইসলামের মোড়ক এঁটে কুফরী কর্মই

এদের টিকে থাকার প্রধান সহায়ক। কেননা, ইসলামের নামে কুফরী মতবাদ প্রচার করে খাঁটি মুসলমানদের ঈমান হারা করতেই খৃস্টান, হিন্দু ও ইহুদীরা এদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে ক্ষমতায় টিকিয়ে রেখেছে। কারামাতীদের এসব দুর্বলতা ও দাউদের সাহস সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিল হিন্দু বৃদ্ধের। তাই সে বলল, "মহামান্য মুলতানের অধীশ্বর বাটান্ডা ও লাহোরের সৈনিকদের আপনার সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। আপনি বিলক্ষণ জানেন, আপনার ক্ষমতা আমাদের সহযোগিতায় টিকে রয়েছে। এও জানেন, চারপাশে হিন্দু রাজা মহারাজাদের বেষ্টনীর মধ্যে আপনার অবস্থান। হিন্দুরা যদি আপনার সহযোগিতা না করে আপনাকে আর্থিক সাহায্য না দেয় তাহলে ক্ষমতা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আপনার উপায় থাকবে না। আপনি যদি বেরা অভিযান না করেন তাহলে আমরা এটাই বুঝব, আপনি আমাদের মিত্র নন, গজনী শাসকের মিত্র। তখন আমরা আপনার সাথে সব সম্পর্ক ছিন্ন করব, সব সহযোগিতা বন্ধ করে দেব এবং কারামাতীদেরকে জানিয়ে দেবো আপনার পয়গাম্বরীর গূঢ় রহস্য ও প্রতারণার গোপন কথাও ফাঁস করে দেবো।"

দাউদ হিন্দু বৃদ্ধের কুশলী চালে ঘাবড়ে গেল। বলল, "দেখুন! আপনি নিজেও একজন সেনাধিনায়ক। প্রায় শত মাইল দূরে গিয়ে কোন শহর অবরোধ করার মতো সৈন্যবল আমার নেই, বড় জোড় এখানে কেল্লাবন্দী হয়ে লড়াই করতে পারব।"

"শত মাইল দূরে হলেও আপনাকে সেনাভিযান করতেই হবে। আমরা আপনার সৈন্যদের সুলতান মাহমূদকে ধোঁকা দেয়ার জন্য ব্যবহার করবো। আপনার অগ্রাভিযান দেখেই মাহমূদ বেরা শহর ছেড়ে বাইরে চলে আসবে, আপনাকে অবরোধ করার সুযোগ সে দেবে না। কারণ, সে জানে অবরোধের জের পোহাবার সামর্থ তার নেই। মাহমূদ শহর থেকে বেরিয়ে এলেই লাহোর ও বাটান্ডার সৈন্যরা তাকে ঘিরে ফেলবে। আপনার কিছুই করতে হবে না। সে লাহোর ও বাটান্ডার সৈন্যদের মোকাবেলাই তো সামলাতে পারবে না। সে আপনার দিকে আসার সুযোগই পাবে না। এর আগেই খেল খতম হয়ে যাবে। আমরা আপনাকে এই ওয়াদা দিচ্ছি যে, মাহমূদকে বন্দী করে আপনার হাতে তুলে দেবো।"

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল দাউদ। এমতাবস্থায় তার দৃষ্টি পড়ল পায়ের কাছে পড়ে থাকা স্বর্ণমুদ্রায়; দৃষ্টি মুদ্রা থেকে সরিয়ে দুই তরুণীর দিকে ফেরাল দাউদ। তরুণীদের দিকে তাকানোর পর তার চিন্তাক্লিষ্ট চেহারা বদলে গেল। তার

অভিব্যক্তিতে তখন প্রকট হয়ে উঠল যুদ্ধবিগ্রহ ও যুদ্ধাভিযান ইত্যাকার বিষয়াদির প্রতি বিতৃষ্ণা। তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল, সে হিন্দু বৃদ্ধকে এখান থেকে তাড়াতে পারলেই বাঁচে।

"আমার বাহিনীকে কখন রওয়ানা করতে হবে?" বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করল দাউদ।

"প্রস্তুতি শুরু করে দিন আপনি।" বলল বৃদ্ধ। "আমি এখন বেরা যাচ্ছি, সেখানে আমি লাহোর ও বাটান্ডার সৈনিকদের আগমন সংবাদ জানতে পারবো। তাদের সেনাবাহিনী রওয়ানা হওয়ার খবর পেয়েই আমি আপনাকে দ্রুত সংবাদ পাঠাবো। আপনি রসদপত্র গরুর গাড়িতে বোঝাই করে রাখুন, যাতে খবর পাওয়া মাত্র অভিযানে বেরিয়ে পড়তে পারেন।"

দাউদ বিন নসর হিন্দু আগন্তুকদের আপ্যায়নে শরাব ও কাবাব আনার নির্দেশ দিলে তার এক দরবারী স্মরণ করিয়ে দিল, বন্দীদের নিয়ে বাইরে সৈন্যরা অপেক্ষা করছে। বন্দীদেরকে হাজির করার নির্দেশ দিলে তাদেরকে হাজির করা হলো।

"তোমাদেরকে বেশি কথা বলার সুযোগ দেবো না।" আলেম ও তার সাথীদের উদ্দেশ্যে বলল দাউদ। "তোমাদের এক সাথী চার-কুমারী দুর্গে আমার এক প্রহরীকে হত্যা করেছে। তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। তোমরাও তার সাথে ছিলে। এ ছাড়াও তোমরা আমার চৌকস চারজন সৈন্যকে হত্যা করেছো। তা কি ঠিক নয়? কেন তোমরা এদেরকে হত্যা করলে?"

"এর জবাব আমার কাছে শুনুন, মহামান্য মহারাজ!" বলল বৃদ্ধ হিন্দু। এরা যদি এ চার পাষণ্ডকে হত্যা না করতো তাহলে এই সোনার মুদ্রা আর এই তরুণীরা আপনার কাছে পৌছাতে পারতো না। আমরা তো কিছুতেই বুঝতে পারতাম না, এরা আপনার সৈনিক কিনা। হিন্দু বৃদ্ধ চার কারামাতী হত্যার ইতিবৃত্ত সবিস্তারে জানাল দাউদকে এবং বলল, এই বুযুর্গ ব্যক্তি ও তার সাথীরা উদ্ধার না করলে স্বর্ণ ও মেয়েগুলোর চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যেতো না।

আমরা তো এদের কাণ্ড দেখে ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, একদল হায়েনার কবল থেকে আরেক দলের পাল্লায় পড়লাম। কিন্তু এই বুযুর্গ আলেম তরুণীদের কাপড় পরালেন, আমাদের নিশ্চিন্ত করলেন। আমরা তাকে উপঢৌকন পেশ করলাম। তিনি আমাদের উপঢৌকন গ্রহণেও অস্বীকৃতি জানালেন। এমতাবস্থায় মধ্যরাতে আপনার এই সৈন্যরা আমাদের ধরে নিয়ে আসে।"

দাউদ তাকাল বন্দীদের দিকে। আলেম বললেন, "কিছুতেই আমাদের বুঝার উপায় ছিল না, এরা আপনার সৈনিক। আমরা তো এই নিরপরাধ মেয়েগুলোর জীবন বাঁচানোর জন্যে এদেরকে হত্যা করেছি।"

"বন্দী ওই বুড়োর সাথে তোমাদের কি সম্পর্ক?" আলেমকে জিজ্ঞেস করল দাউদ। "আমি জানি, তোমরা সুলতান মাহমূদের সাথে সাক্ষাৎ করতে বেরা যাচ্ছিলে।"

"তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।" বললেন আলেম। "আমরা বেরা যাচ্ছিলাম ঠিক কিন্তু আমরা জানি না, সুলতান মাহমূদ কোথায় থাকে। আমরা ব্যবসায়ী, ব্যবসার কাজেই যাচ্ছিলাম।"

"মহামান্য আমীর! এরা আমাদের জীবন বাঁচিয়েছে, মেয়েদের ইজ্জত রক্ষা করেছে, আপনার আমানতকে হেফাযত করেছে। আমাদের উপঢৌকন পর্যন্ত গ্রহণ করেনি। আমি এদেরকে মুক্ত করে দিয়ে আপনার দ্বারা পুরস্কৃত করতে চাই।" বলল বৃদ্ধ হিন্দু।

তরুণী দু'জনের দিকে তাকাল দাউদ। তরুণীরা কয়েকবার বলল, "হ্যাঁ, এদেরকে ছেড়ে দেয়া হোক। যদি এরা পশুগুলোকে হত্যা না করতো...।"

"ছেড়ে দাও এদের...।" স্মিত হাস্যে নির্দেশ করল দাউদ। দাউদের নির্দেশে আলেম ও তার সাথীদের মুক্ত করে দেয়া হলো।

* * *

দু' তিন রাত পরের ঘটনা। সেই পুরনো হাভেলীতে আবার গভীর রাতে মিলিত হলেন আলেম ও তার সাথীরা। দরবেশ ও আলেম গ্রেফতার হয়ে আলেম ও তার তিন সাথী মুক্ত হওয়ার পর তাদের অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। তদুপরি তারা করণীয় নির্ধারণে চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখে মিলিত হতেন নিয়মিত। এ রাতেও একে একে মিলিত হলেন সবাই। আলোচনার বিষয় ছিল দরবেশকে মুক্ত করা। দরবেশকে মুক্ত করার কোন ব্যবস্থাই দেখা যাচ্ছিল না। তাকে জেলখানার কোন জায়গায় কোন ঘরে রাখা হয়েছে কোন ধারণা নেই তাদের। বিগত দু'দিন তাদের কয়েকজন জেলখানার দেয়াল পরখ করে দেখেছে। হুক ছুঁড়ে দেয়ালের উপর উঠে তাকে মুক্ত করার চিন্তাও জানবাজ যুবকরা করেছিল। কিন্তু তাতে বৃথা জীবনহানি ঘটতে পারে বিধায় আলেম তাতে সাড়া দিলেন না। আলেম তাদের বুঝালেন, বাস্তব ও ফলপ্রসূ কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায় কি না তা ভেবে দেখো।

এসব ভাবনায় আলেমের সময় ক্ষেপণে কিছুটা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এক যুবক। বলল, "আমাদের বুযুর্গ সাথী জল্লাদের তরবারীর নীচে মৃত্যুর প্রহর গুনছে, এ কথাটি আপনারা অনুধাবন করছেন না কেন? আমাদের কারো জীবন চলে গেলেও তাতে আপত্তি নেই, তবুও তাঁকে মুক্ত করা একান্ত কর্তব্য।"

আলেম তাকে সান্ত্বনা দিতে বললেন, "দেখো, আমরা দরবেশকে মুক্ত করতে গিয়ে ব্যর্থ হলে দরবেশকে তখনি জল্লাদের হাতে খুন হতে হবে। জীবন মরণের মালিক আল্লাহ্। আমরা যা কিছু করছি আল্লাহ্র জন্য করছি। ধৈর্য ধরো, আল্লাহ্ অবশ্যই একটা সুরাহা করবেন।"

হঠাৎ কে যেনো কড়া নাড়ল দরজায়। সবাই সতর্ক হয়ে গেলেন পালানোর জন্য। কারণ, গ্রেফতার ও মুক্তির পর তাদের পদে পদে বিপদাশঙ্কা আরো বেড়ে গিয়েছিল। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে দরবেশ সবার ঠিকানা বলে দিতে পারেন এমন আশঙ্কাও তাদের আলোচনায় ছিল।

দু'জন হাতে খঞ্জর নিয়ে পায়ে পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। একজন দরজার শিকল খুলে দিয়ে দরজার আড়ালে চলে গেল। অন্যজন অপর পাল্লার আড়ালে লুকাল নিজেকে। ভেতরে এক লোক প্রবেশ করল। বন্ধ করে দিল দরজা। আগন্তুক তাদেরই একজন।

"এখানে ক'জন আছে?" জিজ্ঞেস করল আগন্তুক।

"আটজন।" জবাব দিল একজন।

"সবাই বাইরে চলে এসো। দরবেশকে চারজন সৈনিক এদিকে নিয়ে আসছে। আমরা ইচ্ছে করলে দরবেশকে এখন মুক্ত করতে পারি। এখন শহর একেবারে জনশূন্য। কাজটি করার এখনি উপযুক্ত সময়।"

কয়েদখানায় দরবেশের হাড়গুড়ো করে ফেলেছিল অত্যাচার চালিয়ে। তবুও তার মুখ থেকে তার সাথী ও অন্য কারো পরিচয় ও ঠিকানা বের করতে পারেনি জালেমরা। ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত শত্রু চিহ্নিত করতে অন্য পন্থা উদ্ভাবন করল। রাতের দ্বিপ্রহরে দরবেশকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তার স্ত্রী-সন্তানকে শাস্তি দিয়ে তাদের কাছ থেকে অন্যদের পাত্তা উদ্ধার করবে। এ উদ্দেশ্যে রাতের অন্ধকারে চার সিপাহী তাকে বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য রওয়ানা হয়েছিল। দরবেশের ঘর ছিল পুরনো হাভেলী থেকে অনেকটা আগে।

আলেম ও তার সাথীদের সবাই হাতে লোহার ডাণ্ডা নিয়ে পায়ে পায়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। রাস্তায় একটু অগ্রসর হওয়ার পরই তারা সিপাহীদের

দেখতে পেল। সিপাহীদের দেখেই তারা অন্ধকারে লুকিয়ে গেল। যেই তাদের পাশ দিয়ে দরবেশকে নিয়ে সিপাহীরা যেতে লাগল অমনি অতর্কিতে সবাই সিপাহীদের মাথায় আঘাত করল। উপর্যুপরি আঘাতে ওরা চিৎকার দেয়ার অবকাশও পেল না, জ্ঞান হারিয়ে চার সিপাহী লুটিয়ে পড়ল। দরবেশের হাত-পা বাঁধা ছিল শিকলে। তাকে ধরাধরি করে তুলে নিয়ে সাথীরা সবাই অন্ধকার গলির মধ্যে আড়াল হয়ে গেল। গলিপথ ছিল নীরব নিস্তব্ধ। কেউ এই মহা অপারেশন দেখতে পেল না।

দাউদের দরবার থেকে মুক্তি পেয়ে বাড়িতে এসেই আলেম এক ব্যক্তিকে বেরায় এ সংবাদ দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যে, মুলতানের শাসক দাউদ বেরা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাকে রাজী করানোর জন্যে হিন্দুরা নারী ও সোনাদানা উপঢৌকন পাঠিয়েছে। অনুরূপ সংবাদ লাহোর ও বাটান্ডাতেও পাঠানো হয়েছে। তিন তরফ থেকেই আক্রমণ আশঙ্কা রয়েছে সুলতানের।

সুলতানের কাছে অবশ্য এ সংবাদ অপ্রত্যাশিত নয়। তিনি এ সংবাদ পাওয়ার আগেই দু'জন হিন্দু সংবাদবাহককে বন্দী করে ষড়যন্ত্রের খবর জানতে পেরেছেন। এরপর মন্দিরে তল্লাশী চালিয়ে বিজি রায়ের বহু সেনা অফিসারকে গ্রেফতার করা হলো। ষড়যন্ত্রকারী পণ্ডিতদেরও আটক করা হলো। সব হিন্দুকে শহরের বাইরে ময়দানে জড় করে মন্দিরের সকল মূর্তি ওদের সামনে রেখে দেয়া হলো। সমবেত সকল হিন্দুর উদ্দেশ্যে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন সুলতান :

"তোমাদেরকে আমি এখানে একত্রিত করে এ বিষয়টি বুঝাতে চাচ্ছি, তোমাদের হাতের তৈরি মাটি ও ইট পাথরের এসব মূর্তির কিছু করার ক্ষমতা নেই। এদের যদি ক্ষমতা থাকে তবে বল, তারা নিজেদেরকে রক্ষা করুক। এদের ধ্বংস প্রত্যক্ষ কর। সব ছেড়ে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত কর, যে আল্লাহ্ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি আমাদের জীবন মরণের মালিক।"

সুলতানের নির্দেশে হিন্দুদের সামনেই সকল মূর্তি গুড়িয়ে টুকরো টুকরো করা হলো।

বেরা দখল করেই সুলতান দ্রুত পেশোয়ারে এই বলে দূত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, "যত কম সংখ্যকই হোক দ্রুত সৈন্য পাঠাও, রসদের দরকার নেই।"

সেইদিন থেকে সুলতানের প্রতিটি প্রহর কাটতো সাহায্যকারী সৈন্যাগমনের অপেক্ষায়। পথ ছিল দীর্ঘ। তাছাড়া শত্রু বেষ্টিত এলাকা দিয়ে অনেক ঘুরো পথে শত্রুদের দৃষ্টি এড়িয়ে সহযোগীদের পৌঁছাতে যথেষ্ট বিলম্ব হওয়াটাই স্বাভাবিক

ছিল, কিন্তু সমূহ বিপদাশঙ্কায় সহযোগী সৈন্যদলের আগমনের বিলম্ব অস্থির করে তুলেছিল সুলতানের মন। কারণ, দু'টি অপ্রত্যাশিত যুদ্ধে সুলতানের অধিকাংশ সৈন্য শহীদ হয়ে গিয়েছিল। সৈন্য ঘাটতি পূরণ করার কোন ব্যবস্থাও ছিল না। অবশ্য বেরায় মুসলমান যথেষ্ট ছিল, কিন্তু হিন্দুরা মুসলমানদেরকে দাসে পরিণত করেছিল। সেনাবাহিনীতে মুসলমানদের মোটেও নেয়া হতো না। শুধু তাই নয়, তরবারী, অস্ত্র চালনা ও অশ্বারোহণ করা ছিল মুসলমানদের জন্য নিষিদ্ধ।

বেরায় সুলতানের অবস্থা হয়েছিল শিকারীদের পাল্লায় আহত বাঘের মতো। নিজের দেশ থেকে অনেক দূরে সুলতান। চতুর্দিকে শত্রু। অবস্থা এমনই করুণ যে, শুধু যে তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে পরাজিত হবেন তাই নয়, জীবনাশঙ্কাও প্রকট হয়ে উঠেছিল তার। অবশিষ্ট সৈনিক ও কর্মকর্তাদের মনে বিরাজ করছিল চরম হতাশা।

"বন্ধুগণ! আমি তোমাদের জীবন নিয়ে জুয়া খেলা শুরু করিনি।" সকল কমান্ডারকে একত্রিত করে একদিন বললেন সুলতান। "উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে আমি সচেতন। তবে জেনে রেখো এবং মনে সাহস রেখো, আমরা কখনও পালিয়ে যাবো না, পরাজিতও হবো না। আল্লাহ্ সঠিক সময়ে ঠিকই আমাদের সাহায্য করবেন। ইতোমধ্যে আমাদের অধিকাংশ আহত যোদ্ধা সুস্থ হয়ে উঠেছে, দু' একদিনের মধ্যেই সহযোগী সৈন্যরা এসে পড়বে। ইনশাআল্লাহ, আমাদেরকে অবশ্যই মুলতান অভিযান করতে হবে। এখানে আমরা বসে থাকলে মুলতানের সৈন্যরা আমাদের ঘেরাও করে ফেলবে এবং আনন্দ পাল ও বিজি রায়ের সৈন্যরাও এদের সাথে যোগ দিবে। আর আমরা মুলতানে অভিযান চালালে ওদের পরাজিত করা কোন দুষ্কর ব্যাপার হবে না তা তোমরা জান। কারণ, মুলতানের সৈন্যদের যুদ্ধের কোন অভিজ্ঞতা নেই। মুলতান জয় করে নিলে ওখানকার সৈন্যদের দ্বারা আমাদের উপকার হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। শত পাপাচারী হলেও ওরা মুসলমান তো?"

সকল কয়েদীকে পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন সুলতান। যাতে ওরা চলতে পারে কিন্তু পা তুলে দৌড়াতে না পারে। অপরদিকে বেরার সকল মসজিদে আযান এবং বেদখল হওয়া মসজিদগুলোকে আবাদ করার নির্দেশ দিলেন আর বললেন, "পুরুষরা মসজিদে এবং মেয়েরা বাড়িতে কুরআন খতম ও মুসলমানদের কল্যাণে নফল নামায পড় এবং দু'আ করতে থাক।"

বেরায় সুলতান যখন সহযোগী সৈন্যাগমনের অধীর অপেক্ষায় উদ্বিগ্ন তখন লাহোরে চলছে অন্য কাণ্ড। লাহোরের রাজা আনন্দ পাল সুলতানের পথরোধ

ভারত অভিযান (৮)—৭

করতে গিয়ে এমনভাবে পরাজিত হলো, সে রাভী নদী পেরিয়ে কাশ্মীরের পথে পালিয়ে গেল। লাহোরে তার স্থলাভিষিক্ত ছিল রাজকুমার শুকপাল। শুকপালের অধীনেও বহু সৈন্য রিজার্ভ ছিল। এরা এ পর্যন্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু রাজার সৈন্যরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে বিচ্ছিন্নভাবে দু'জন চারজন করে রাজধানীতে ফিরে এসে পরাজয়ে নিজেদের নিরপরাধ সাব্যস্ত করতে মুসলিম সৈন্যদের সম্পর্কে ভীতিকর বর্ণনা দিচ্ছিল। তাদের কথাবার্তায় মনে হতো, গযনী বাহিনীর সৈন্যরা মানুষ নয়, এগুলো জিনের মতো। তাদের কথা শুনে যুদ্ধে না যাওয়া সৈন্যদের মধ্যেও ভীতি ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজকুমার শুকপাল ও তার মা রাণী প্রেমদেবী এসব সংবাদে চরম উদ্বিগ্ন ছিল। তারা রাজা আনন্দ পালের ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিল কিন্তু সপ্তাহ চলে যাওয়ার পরও তার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। কেউ বলতেও পারল না কোনদিকে গেছে রাজা।

আনন্দ পালের ছিল তিন স্ত্রী। প্রেমদেবীর পুত্র শুকপাল ছাড়াও তার আরো বৈমাত্রেয় ভাই ছিল। রাজার নিরুদ্দেশে প্রেমদেবীর উদ্বেগ ছিল না, তার দৃষ্টি ছিল রাজার অবর্তমানে পুত্র শুকপালকে সিংহাসনের অধিকারী করা।

একদিন শুকপালের কাছে খবর গেল, বেরা থেকে একটি দল জরুরী বার্তা নিয়ে এসেছে। তাদেরকে তখনি রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে ডেকে নেয়া হলো। এরা ছিল বেরার মন্দিরে লুকিয়ে থাকা সামরিক অফিসার ও পণ্ডিতদের প্রেরিত সংবাদ বাহক। এই সংবাদ বাহকরা বাটান্ডায় আনন্দ পালের দ্বিতীয় রাজধানীতে খবর পৌছালে সেখানকার কর্তাব্যক্তিরা তাদেরকে বলল, এখানে সেনাভিযান পরিচালনা করার মতো কর্তৃত্ববান কেউ নেই, আপনারা লাহোর যান। সেখানে রাজার পুত্র শুকপাল রয়েছেন। তিনি ইচ্ছা করলে অভিযান পরিচালনা করতে পারেন। সংবাদ বাহকরা বেরার পরিস্থিতি জানিয়ে তাকে বেরা আক্রমণের প্রস্তাব করল। শুকপাল সংবাদের গুরুত্ব অনুধাবন করে তার মাকে জানাল। শুকপালের মা প্রেমদেবী সংবাদ শুনে সাথে সাথেই সেনাপতি রাজ গোপালকে ডেকে পাঠাল।

সেনাপতি রাজ গোপাল বেরা আক্রমণে অস্বীকৃতি জানাল। রাজ গোপাল আত্মপক্ষ সমর্থনে বলল, "যে বাহিনীর পথরোধ করতে গিয়ে রাজা আনন্দ পাল পরাজিত হয়ে হারিয়ে গেছেন, পথে বিপুল জনবল হারানোর পরও যারা অগ্রাভিযান চালিয়ে রাজা বিজি রায়ের মতো প্রতিষ্ঠিত ও সর্বাত্মক প্রস্তুত একটি বাহিনীকে পরাজিত করে রাজধানী দখল করেছে, তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে হলে ওদের চেয়ে তিনগুণ সৈন্য প্রয়োজন। আমাদের ততো

সৈন্য নেই। তাছাড়া বেরা পর্যন্ত পৌঁছাতে অন্তত দু'টো বড় নদী আমাদের পেরিয়ে যেতে হবে। আমাদের এখন যে সৈন্য রয়েছে এদের মানসিক শক্তিও ভঙ্গুর। রাজকুমার শুকপাল ছেলে মানুষ। এমতাবস্থায় এতো বড় ঝুঁকি না নিয়ে মহারাজা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।"

"মহারাজার অনুপস্থিতির সুযোগটুকুই আমি নিতে চাই সেনাপতি।" বলল রাণী প্রেমদেবী। "বেরায় মাহমূদের মুষ্টিমেয় যে সৈন্য রয়েছে এরা আমাদের বাহিনীর আক্রমণে মোটেও দাঁড়াতে পারবে না। এ অভিযানে আমাদের বাহিনী বিজয়ী হলে এই বিজয় আমার পুত্রের সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হবে। তা আমার ছেলের সিংহাসনের অধিকারী হওয়ার সহায়ক হবে। আর যদি পরাজয় ঘটে তবে সেই পরাজয় হবে আমার। কেননা, সেনাবাহিনী কমান্ড থাকবে আমার হাতে। তাতে শুকপালের কোন ক্ষতি হবে না।"

"শুকপাল সাথে থাকবে বটে তবে তাকে রাখতে হবে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাঝে। তার জন্য বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে।" বলল রাজরাণী প্রেমদেবী।

রাজগোপাল! তুমি কি বুঝতে পারছো না, আমাদের আগে যদি দাউদ বেরা দখল করে নেয় আর মাহমূদ ও দাউদ মিলে বেরাকে ইসলামী রাজ্যে পরিণত করে তবে এ অঞ্চলে গযনীর দু'টো ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। বলাতো যায় না, দাউদ আর যাই হোক মুসলমান তো, সে মাহমূদের সাথে যদি মিত্রতা গড়ে তোলে।"

"দাউদ সেনাভিযান করবে এমনটা আমি কল্পনাও করতে পারি না।" বলল সেনাপতি রাজগোপাল। "ধন-সম্পদ, ভোগ-বিলাস আর মদ-নারীতে আকণ্ঠ ডুবে থেকে সে তো ধর্মকেই ভুলে গেছে, সে কোন দিন যুদ্ধের সাহস করার কথা নয়। গযনীর সৈন্যরা যুদ্ধ করে ঈমানের জোরে। দাউদ আমাদের কাছে ঈমান বিক্রি করে ফেলেছে, তার পক্ষে গযনী বাহিনীর মোকাবেলা করা অসম্ভব।"

রাজগোপালকে অন্য কক্ষে নিয়ে গেল প্রেমদেবী। প্রেমদেবীর বয়স তখন প্রায় পঁয়ত্রিশ। কিন্তু তার শরীর, সৌন্দর্য তখনও কুমারীর মতো অটুট। সে রাজগোপালের চোখে চোখ রেখে বলল, "রাজগোপাল! ভুলে গেলে, শুকপাল যে তোমারই সন্তান। মহারাজাকে মানুষ শুকপালের বাবা বলে সে আমার স্বামী বলে। রাজরাণী হওয়ার পরও তোমাকেই আমি হৃদয়ের স্বামী বানিয়ে রেখেছি। মহারাজা আনন্দ.পাল লাহোরের এ যুদ্ধে তোমাকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু আমি তাকে বলেছি, রাজধানীতে একজন অভিজ্ঞ সেনাপতি থাকা দরকার। তুমি

তার সাথে গেলে নিশ্চয়ই নিহত হতে...। রাজগোপাল! তোমার সন্তানকে সিংহাসনে আসীন করাতে উদ্যোগী হও। আমি চাই, তোমার সন্তান শুকপাল মাহমূদকে কয়েদ করে লাহোরে নিয়ে আসুক। রাজগোপাল! তোমাকে আমার প্রেমের দোহাই দিয়ে বলছি, তুমি অভিযানে আপত্তি করো না।"

সুলতান মাহমূদ জানতেন, পেশোয়ার থেকে সহযোগী বাহিনীর এতো তাড়াতাড়ি পৌঁছা সম্ভব নয়। তবুও তিনি শহর প্রাচীরের উপরে উঠে অধীর উদ্বেগে উত্তর-পশ্চিম দিকে তাকিয়ে থাকতেন। ধুলো উড়তে দেখলেই সহযোগী বাহিনী এসে গেছে বলে তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠত।

* * *

মুলতানের শাসক দাউদ বিন নসর উপঢৌকন হিসেবে প্রাপ্ত দুই তরুণী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তরুণীদ্বয় পান পাত্রে ঢেলে দিচ্ছিল সুরা, আর আয়েশী ভঙ্গিতে গলাধঃকরণ করছিল দাউদ। এমতাবস্থায় দাউদকে খবর দেয়া হলো, প্রহরী হত্যাকারী কয়েদীকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পথে প্রহরীদেরকে বহু লোকজন আক্রমণ করে আসামী ছিনতাই করে নিয়ে গেছে। মদে মাতাল দাউদ নির্দেশ দিল, ওরা ঘুষ খেয়ে কয়েদীকে ছেড়ে দিয়েছে। ওদেরকে কয়েদখানায় বন্দী করে রাখো। আর কয়েদীর ঠিকানা তালাশ করে ওর স্ত্রী সন্তান ধরে এনে বন্দী করো। কিন্তু দরবেশের বাড়ি তালাশ করে সৈন্যরা ওখানে কোন মানুষকেই দেখতে পেল না।

একদিন সকালে উত্তর-পশ্চিম দিকের বদলে উত্তর-পূর্ব দিকে ধুলো উড়তে দেখলেন। সুলতান ধুলো দেখেই বুঝতে পারলেন কোন সেনাবাহিনী এদিকে আসছে। তিনি ভাবলেন, আমার সহযোগী বাহিনী হয়তো এসে পড়েছে। তিনি দৌড়ে শহর প্রাচীর থেকে নেমে এলেন মুলতান রওয়ানা হওয়ার জন্য। তিনি মুলতান পৌঁছাতে অধীর অপেক্ষায় ছিলেন। তার গন্তব্য ছিল মুলতানেরই দিকে। কিন্তু পথিমধ্যে বিজি রায় তার পথরোধ করার কারণে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করতে হলো।

তিনি সেনাপতিদের ডেকে বললেন, "সহযোগী বাহিনী এসে গেছে। অতএব আমরা আগামীকালই রওয়ানা হচ্ছি।" এমন সময় এক অশ্বারোহী গোয়েন্দা খবর নিয়ে এলো, "কোন এক শত্রুবাহিনী আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে! বাহিনীতে হাতি ও বহু সংখ্যক অশ্বারোহী ছাড়াও পদাতিক সৈন্য রয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে এরা হিন্দু। কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না কোন রাজা বা মহারাজার সৈন্য এরা।"

সুলতান মাহমূদ চিৎকার দিয়ে উঠলেন এই বলে, তোমরা বসো, আমি নিজেই ওদের দেখে আসছি। তিনি দ্রুত একটি ঘোড়ায় চড়ে ঘন জঙ্গলে ঢুকে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর একটি উঁচু টিলার উপর দাঁড়িয়ে তিনি অগ্রগামী বাহিনীকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তিনি কয়েকবার জায়গা বদল করে শত্রুবাহিনীর জনবলের আন্দাজ করতে চেষ্টা করলেন এবং তার সাথে আগমনকারীকে বললেন, "আমরা ওদেরকে অবরোধের সুযোগ দেবো না, তাহলে মুলতানের বাহিনী এসে সেই অবরোধকে আরো দীর্ঘায়িত করবে। তুমি জলদী যাও। কৃষক ও মুসাফির বেশে কয়েকজন গোয়েন্দাকে পাঠিয়ে দাও, যাতে তারা এরা কার সৈন্য এবং এদের উদ্দেশ্য কি সে সম্পর্কে নিশ্চিত খবর নিয়ে আসতে পারে।"

শহরে ফিরে এসেই সুলতান নিজের স্বল্প সৈন্যদেরকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করছিলেন। এমন সময় তাকে আবার খবর দেয়া হলো উত্তর-পশ্চিম দিকেও ধুলো উড়তে দেখা যাচ্ছে। তিনি দৌড়ে শহর প্রাচীরের উপর উঠলেন। তাকে এ দুশ্চিন্তা পেয়ে বসেছিল যে, এটি কি পেশোয়ারের সহযোগী বাহিনী না রাজা আনন্দ পালের বাহিনী! দুশ্চিন্তায় তার চেহারায় ঘাম দেখা দিল। তিনি একবার উত্তর-পশ্চিম কোণে একবার পূর্ব-উত্তর কোণের উড়ন্ত ধুলোর দিকে তাকাচ্ছিলেন। উত্তর-পশ্চিম কোণে ছিল নদী। তার চিন্তাশক্তি বিদ্যুতের মতো তীব্র গতিতে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করছিল। নদীর দিক থেকে উর্ধ্বশ্বাসে শহরের দিকে ছুটে এলো একজন অশ্বারোহী। কাছে পৌঁছতেই তাকে সুলতানের নিকটে আসার জন্য ইঙ্গিত করা হলো। অশ্বারোহী কাছে পৌঁছে সালাম দিয়ে জানাল, মাননীয় সুলতান! সহযোগী বাহিনী এসে পড়েছে।

সাথে সাথে সুলতান বললেন, "ওদেরকে নদীর তীরেই থামতে বল।" আরো বললেন, "অন্য কাউকে পাঠাও, এ লোকটি ক্লান্ত হয়ে গেছে।"

রাতে সুলতান নিজেও শয্যা গ্রহণ করলেন না, অন্য কাউকেও ঘুমাতে দিলেন না। ইত্যবসরে তার কাছে খবর পৌঁছল, উত্তর-পূর্বের বাহিনী আনন্দ পালের কিন্তু রাজা আনন্দ পাল নেই, তার ছেলে শুকপাল বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই সংবাদের ঘণ্টা তিনেক পর আবার সংবাদ এলো, লাহোরের বাহিনী শহর থেকে তিন মাইল দূরে থেমে গেছে কিন্তু তারা তাঁবু ফেলেনি। বোঝা যায়, রাতেই তারা শহর অবরোধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এ সংবাদ জানার পর দু'জন অশ্বারোহীকে সাথে নিয়ে রাতেই সুলতান সহযোগী বাহিনীকে যেখানে থামতে বলেছিলেন সেখানে চলে গেলেন। পেশোয়ারের সহযোগী বাহিনী ও লাহোরের আনন্দ পালের সৈন্যের মাঝে ব্যবধান ছিল মাইল পাঁচেক। তন্মধ্যে ছিল ঝিলাম নদী।

সহযোগী বাহিনীর অধিনায়ককে বুকে নিয়ে সুলতান বললেন, "তোমরা আমার জন্যে আল্লাহ্‌র রহমত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছো। তোমরা আজ না পৌঁছলে আমি বুঝতে পারছিলাম না আমাদের অবস্থা কি হতো?"

"ভাই নু'মান! আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোন! তোমার অবস্থান থেকে মাইল পাঁচেক দূরে রাজা আনন্দপালের সৈন্যরা অবস্থান করছে। ওরা রাতের শেষভাগে কিংবা ভোরে শহর অবরোধ কিংবা আক্রমণ করবে। বেলা উঠার আগেই তুমি সৈন্যদের নদী পার করিয়ে ওপারে নিয়ে যাবে। কিন্তু কোন শোরগোল করবে না। দিনের আলোতে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকবে আর উঁচু জায়গায় বসে শত্রু সেনাদের পর্যবেক্ষণ করবে। আমি ওদেরকে শহর অবরোধ করার সুযোগ দেব না। একদল পদাতিক সৈন্যকে ওদের দিকে এগিয়ে দেবো, ওরা ওদের মুখোমুখি হয়ে পিছিয়ে আসবে। আর ওরা আমাদের দিকে এগিয়ে আসবে। তোমার সামনে থাকবে এদের একবাহু, ইচ্ছে করলেই তুমি ওদের পিছনে চলে যেতে পারবে। আমি ওদের সম্মুখ দিক ও বাম বাহু সামলাবো।"

শুকপাল ও সেনাপতি রাজগোপাল রাত পোহাতে দেয়নি। ফজরের নামায থেকে সালাম ফেরাতেই সুলতানকে খবর দেয়া হলো, শত্রুবাহিনী অগ্রসর হচ্ছে। তাকে আরো বলা হলো, শত্রুবাহিনীর আগমন দেখে মনে হচ্ছে, তারা শহর অবরোধ করবে। শহরের কাছে এসে ওরা অবরোধ বিস্তৃত করছে, আরো ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে সুলতানের পরিকল্পনা বেকার হয়ে গেল। তিনি পদাতিক বাহিনী পাঠিয়ে ওদেরকে এগিয়ে এনে সুবিধামতো জায়গায় অবস্থান নেয়ার সুযোগ পেলেন না।

সুলতান মাহমূদ শহর প্রাচীরে উঠে দেখলেন, শহর থেকে এক মাইলের মতো দূরে—এগিয়ে আসছে শত্রুবাহিনী। তিনি কমান্ডারদের নির্দেশ দিলেন, অশ্বারোহীদেরকে দু'ভাগে ভাগ করে দুই প্রান্তে আক্রমণ করো। অশ্বারোহীরা প্রস্তুতই ছিল। দ্রুত শহর থেকে অশ্বারোহীরা বেরিয়ে দু'দিকে শত্রুবাহিনীর দুই বাহুর দিকে চলে গেল।

রাজগোপাল সুলতানের বাহিনীকে অগ্রসর দেখে বিদ্যুৎগতিতে তার বাহিনীর বিস্তৃতি রুখে সুলতানের অশ্বারোহীদের ঘেরাও করে ফেলার চেষ্টা করল। সুলতানের অশ্বারোহীরা বিজলীর গতিতে আঘাত করল শত্রুবাহিনীর বাহুতে। সুলতান শহর প্রাচীরে দাঁড়িয়ে সবই প্রত্যক্ষ করছিলেন। তিনি দ্রুত অশ্বারোহী বাহিনীর পিছনে পদাতিক বাহিনীকে পাঠালেন বাম বাহুতে আঘাত হানতে। সুলতানের নির্দেশ মতো উভয় দল পশ্চাদপসরণ শুরু করল। এতে শত্রুবাহিনী

পদাতিক বাহিনীর দিকে ঝুঁকে পড়ল। ভেঙে গেল ওদের অবরোধ চেষ্টা। শত্রুবাহিনীর পশ্চাদদেশ এখন নদীর তীরে অপেক্ষমাণ সুলতানের সহযোগী বাহিনীর সামনে।

নু'মান ছিলেন অভিজ্ঞ সেনাপতি। অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তারা আক্রমণ চালাল পিছন দিক থেকে। শত্রুবাহিনী আর পালিয়ে যাওয়ার অবকাশ পেল না। ওদের আহত হাতিগুলো তাদের জন্য হয়ে উঠল যমদূত।

বেলা তখন উপরে উঠে গেছে। হিন্দুদের ঢাকঢোল নাকারার আওয়াজ, হাতির চিৎকার আর ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি ও মুসলিম বাহিনীর তকবীরে আকাশ কেঁপে উঠছে। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। সুলতান মাহমূদ নগর প্রাচীরে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন। তার দৃষ্টি ছিল রাজকুমার শুকপালকে বহনকারী হাতির উপর। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, হিন্দুদের পতাকা বহনকারী সওয়ার শহরের দিকে এগিয়ে আসছে। হতাহত হচ্ছে হিন্দুরা। মুসলমানরা ঝটিকা আক্রমণ করে দ্রুত জায়গা বদল করছে। এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করে শুকপাল ও হিন্দুদের পতাকাবাহী হাতি সোজা এগিয়ে আসল শহর প্রাচীরের দিকে। সুলতান দেখলেন, হাতির উপরে রাজকীয় আসনে বসা এক যুবক। হাতিটি আহত হয়ে অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছিল। শতচেষ্টা করেও মাহুত এটিকে শহরের দিকে আসার গতি ফেরাতে পারেনি। আহত হাতি শহর প্রাচীরের প্রধান গেটে এসে থামতেই এক সাথে কয়েকটি তীর এসে বিদ্ধ হলো হাতির গায়ে। ভয়ংকর চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে উঠল হাতি। মাহুত এক লাফে হাতি থেকে নেমে দৌড়ে পালাল। সুলতান বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দিলেন, "হাতিটিকে ধরে ফেল।"

যুবককে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, সেই হবে আনন্দ পালের ছেলে রাজকুমার শুকপাল। পতাকাবাহী ছাড়া তার সাথে আর কেউ ছিল না। বেসামাল হাতির আর্তচিৎকারে হাতি থেকে নেমে পড়ল শুকপাল। সে শহর প্রাচীরের গায়ে গা ঘেঁষে ভয়ে কাঁপতে লাগল। সুলতান নির্দেশ দিলেন, ওকে ধরে উপরে নিয়ে এসো।"

সুলতান এগিয়ে গেলেন শোকপালের দিকে। হাত ধরে বললেন, "ভয় পেয়ো না। তোমার কিছু হবে না। তোমার সাহসের প্রশংসা করতেই হয়। তবে গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে আসার আগে বাবাকে তোমার জিজ্ঞেস করে আসা উচিত ছিল, গযনী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে কত মূল্য দিতে হয়। এখানে দাঁড়িয়ে তোমার সৈন্যদের পরিণতি দেখো।"

শুকপাল দেখলো, তার বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে মুসলমানদের হাতে কচুকাটা হচ্ছে। ওদের গর্বের হাতিগুলো সেনাদের পিষে মারছে আর মুসলিম সৈন্যরা তকবীর দিয়ে ময়দানে একক প্রাধান্য বিস্তার করেছে। সেনাপতি রাজগোপালকে কোথাও দেখতে পেল না শুকপাল। শঙ্কায় কাঁপতে লাগল রাজকুমার।

"আমার সাথে কি ব্যবহার করা হবে?" সুলতানকে জিজ্ঞেস করল রাজকুমার।

"নিজের ভাগ্য নিজেই নির্ধারণ কর। তোমার ক্ষেত্রে আমি হলে তুমি কি সিদ্ধান্ত নিতে। তবে এর আগে এ ব্যাপারটি বুঝে নাও, তোমাদের হাতে গড়া মূর্তিগুলো তোমাদের কোনই সাহায্য করতে পারে না। এসব মিথ্যা দেবদেবী ছেড়ে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে মানো, তাঁর ইবাদত কর। এই আল্লাহ্ আমাকে দুরবস্থার মাঝেও এ নিয়ে তৃতীয় বিজয় দান করেছেন।"

"আপনি আমার ধর্মের প্রতি বিতৃষ্ণ।" বলল শুকপাল।

সুলতান মৌলভী সাঈদুল্লাহকে ডেকে বললেন, "এই যুবককে আপনার কাছে রাখুন। সে কয়েদীও নয়, আযাদও নয়। এখন সে তার ধর্মের প্রতি আস্থাহীন। তাকে খুব যত্ন করুন।"

বিজয়ের তিনদিন পর সুলতান মুলতানের উদ্দেশে রওয়ান হওয়ার ঘোষণা দিলেন। তার সামনে দু'শ মাইলের দীর্ঘ সফর। সুলতান সকল কয়েদীকে পায়ের শিকল মুক্ত করে গলায় বেড়ী পরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। কাফেলা দ্রুত চলার জন্য গরুর গাড়িগুলো যেখানে বালু ও চড়াইয়ে আটকে যেতো কয়েদীদের ঠেলে তুলতে নির্দেশ দিতেন। কাফেলা অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছিলো।

এদিকে মুলতানের কারামাতী শাসক লাহোর ও বাটান্ডার সৈন্যদের রওয়ানা হওয়ার সংবাদের অপেক্ষায় ছিল। যুদ্ধে অনিচ্ছা সত্ত্বেও হিন্দুদের "নিমক হালাল" করতে বাধ্য হয়েই সে বেরা আক্রমণের জন্যে তৈরি হয়ে সংবাদের অপেক্ষায় ছিল। তার কাছে আর লাহোর বাহিনীর সংবাদ পৌঁছল না।

বেরা থেকে যুদ্ধে যাওয়ার কোন সংবাদ এলো না বটে তবে তার গোয়েন্দারা তাকে খবর দিল, এক বিশাল বাহিনী দ্রুতগতিতে মুলতানের দিকে আসছে। দাউদ খবর পেয়ে দৌড়ে দুর্গের উপরে একটি মিনারে উঠে অগ্রসরমান সৈন্যদের দেখতে লাগল, ততক্ষণে সুলতানের বাহিনীকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। অল্পক্ষণের মধ্যে সুলতানের সৈন্যরা মুলতানের সীমানায় প্রবেশ করল। দাউদ তার বাহিনীকে দুর্গ প্রাচীরে মোকাবেলার জন্য দাঁড় করিয়ে প্রধান গেট বন্ধ করে

সেখানকার পাহারা মজবুত করতে নির্দেশ দিল। দেখতে দেখতে সুলতানের বাহিনী মুলতান শহর অবরোধ করে ফেলল।

সুলতানের পক্ষ থেকে দাউদকে কয়েকবার শহর গেট খুলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করার প্রস্তাব দেয়া হল। বলা হলো, গেট খুলে না দিলে শহরের প্রতিটি ইট খুলে ফেলা হবে এবং সকল কারামাতীকে হত্যা করা হবে।

সুলতান মাহমূদকে বলা হয়েছিল, কারামাতীরা নিবীর্য ও সাহসহীন। এরা পাপাচারে লিপ্ত বিলাসী ও আরামপ্রিয়। কিন্তু শহরে প্রবেশের প্রতিটি আক্রমণ ওরা ভয়ংকরভাবে ব্যর্থ করে দিচ্ছিল। কয়েকটি হামলা এভাবে ব্যর্থ করে দেয়ার পর সুলতানের ভুল ভাঙল।

টানা সাতদিন অবরোধ করে রাখার পরও কারামাতীরা শহরে প্রবেশ রোধে কঠোর অবস্থান বজায় রাখল। সুলতান বললেন, "এভাবে অবরোধ দীর্ঘায়িত করার সুযোগ নেই। আমাদের হাতে সময়ও নেই। তোমাদেরকে আল্লাহ্ কঠিন মুহূর্তেও বিজয়ী করেছেন এবারও করবেন। প্রাচীর ডিঙাতে এবং ভাঙতে চরম আঘাত হানো, এরা পাপাচারী। এরা তোমাদের ঠেকিয়ে রাখবে কোন শক্তি দিয়ে!"

সুলতান শহর দুর্গের প্রধান ফটক ও প্রাচীর ভাঙতে গাছ কেটে দু'টি হাতির গায়ে বেঁধে হাতি দৌড়িয়ে আঘাত করতে নির্দেশ দিলেন। ঝুলন্ত গাছ নিয়ে হাতি শহর ফটকে আঘাত হানছিল। এভাবে কেটে গেল আরো তিনদিন। হাতি ও মানুষ মিলেও প্রধান গেট ভাঙতে সক্ষম হলো না। দরজার কাছাকাছি গেলেই উপর থেকে কারামাতীদের তীরবৃষ্টি বর্ষণে মুজাহিদরা হতাহত হচ্ছিল। প্রধান ফটকের দিকে কারামাতীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে অন্যদিকেও প্রাচীর ভাঙার চেষ্টা চলছে। শহরের ভেতরে অবরুদ্ধ লোকেরা আতংকিত হয়ে ভয়াবহ চেচামেচি শুরু করেছে। আর গেটের বাইরে মুসলিম সৈন্যদের তকবীর ধ্বনি ও হাতি-ঘোড়ার চিৎকারে ভয়াবহ এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। শহরের ভিতরের মুসলিম নাগরিকরা যখন জানতে পারল, গজনীর সুলতানের বাহিনী মুলতান আক্রমণ করেছে তখন তারা ভেতর থেকে প্রধান গেট খুলে ফেলার জন্যে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়লে কারামাতীরা তাদের সবাইকে শহীদ করে ফেলে।

চতুর্থ দিন দাউদ বিন নসর ভীত হয়ে বছরে বিশ লাখ দিনার কর দেয়ার অঙ্গীকার করে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠাল সুলতানের কাছে। কিন্তু সুলতান যখন শুনলেন, ভেতরের মুসলমানরা দরজা খোলার চেষ্টা করলে তাদের সবাইকে হত্যা করা হয়েছে, তখন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে তিনি কমান্ড নিজের হাতে নিয়ে

আখেরী হামলা চালালেন। মুসলিম যোদ্ধারা মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল গেট ভাঙতে। কয়েক জায়গা ভেঙেও ফেলল। দুরাচারী কারামাতীদের গণহত্যার নির্দেশ দেয়া হলো। সুলতান নিজেই এতো কারামাতী হত্যা করলেন যে, জমাট রক্তে তরবারীর হাতলে তার হাতের মুষ্টি এভাবে আটকে গিয়েছিল, মুষ্টি আর খুলতে পারছিলেন না। দীর্ঘক্ষণ গরম পানিতে ভিজিয়ে রাখার পর তার হাতের মুষ্টি খোলা সম্ভব হয়েছিল।

কারামাতীরা সেদিন ইতিহাসের শেষ লড়াই করেছিল সুলতান বাহিনীর মোকাবেলায়। সেদিন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় ওরা শেষ রক্তবিন্দু ঢেলে দিয়েছিল। কারামাতী নারীরাও অস্তিত্ব রক্ষায় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, কিন্তু মুসলিম বাহিনীর ক্রোধের মুখে তারা ছিটকে পড়ে গেল। সেদিনের যুদ্ধে কারামাতীদের রক্তের বন্যায় মুলতান শহর ভেসে গিয়েছিল।

দাউদ বিন নসর সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কোথাও তাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। দাউদের লাপাত্তা হওয়ার সাথে সাথে মুলতানের জমিন থেকে চিরতরে কারামাতী শাসন ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হলো। কারামাতী শাসন এখন এক ইতিহাস। সুলতান মাহমূদ মুলতান দখল করে কেরামতীদের স্বর্ণ-মন্দির ধ্বংস করে দিলেন। ওদিকে ভেতর থেকে দরজা খুলে দেয়ার অভিযানে মুলতানের সেই দরবেশ, আলেম ও তাদের সহকর্মীবৃন্দ জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

মুলতান অভিযান শেষ করে তখনও স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারেননি সুলতান। তিনি এর পুনর্গঠন ও মুলতানকে গজনী শাসনাধীনের মজবুত ঘাঁটি তৈরির ব্যাপার নিয়ে ভাবছিলেন। এ মুহূর্তেই হেরাতের গভর্নর আরসালানের কাছ থেকে পয়গাম এলো– কাশগরের রাজা এলিখ খান গজনী আক্রমণ করেছে। খবর শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন সুলতান।

তিনি আবু আলী মঞ্জুরীকে মুলতানের গভর্নর নিযুক্ত করে দ্রুত বেরায় পৌঁছলেন। বেরা এসে জানতে পারলেন, শুকপাল মুসলমান হয়ে গেছে। সে এখন সুলতানের গোলাম ও বৎস হয়েই থাকতে চাচ্ছে। সুলতানের মন তখন গজনীতে। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে গজনী আক্রমণের সংবাদে। তিনি গভীরভাবে অগ্রপশ্চাৎ ভাববার অবকাশ পেলেন না। শুকপালের আনুগত্য ও মুসলমান হওয়ার কারণে তাকে বেরার গভর্নর ঘোষণা করলেন। যদিও তাকে জানানো হলো, হিন্দুরা অবিশ্বস্ত, ওদের উপর এতোটা বিশ্বাস করা ঠিক হবে না

কিন্তু কারো কথা শোনার সময় তার ছিল না। ঘোষণা সেরেই তিনি গজনীর পথে পা বাড়ালেন ...।

সুলতান মাহমূদের সামনে এখন শত্রুকবলিত রাজধানী গজনী। অপরদিকে বেরায় নিজের নিয়োজিত হিন্দুজাদা শুকপাল। যার রক্তে রয়েছে অবিশ্বাস, প্রতারণা ও মিথ্যার মিশ্রণ। সুলতানের অনাবশ্যক পুরস্কার ও উদারতার প্রতিদান কিভাবে শোধ করবে শুকপাল? দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে শ্রান্ত, ক্লান্ত সহযোদ্ধা ও সুলতান কিভাবে উদ্ধার করবেন শত্রুকবলিত রাজধানী?

নগরকোটের নর্তকী

নগরকোট ছিলো হিন্দুস্তানের এক বিখ্যাত দুর্গ। সেই যুগ ছিল দুর্গ শাসনের। নগরকোট দুর্গের ভগ্নস্তূপ এখনও বিদ্যমান। তৎকালীন হিন্দুস্তানের দুর্গগুলো একটির চেয়ে আরেকটি ছিলো নানা কারণে বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। বিখ্যাত নগরকোট দুর্গের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিলো এর শক্ত কাঠামো, বিশাল বিস্তৃতি। মধ্যে অবস্থিত বিশাল মন্দিরটি ছিলো নগরকোট দুর্গের প্রধান আকর্ষণ। মন্দিরটিই ছিলো দুর্গের ভেতরে আরেক দুর্গসম। মন্দিরের মধ্যে অসংখ্য কক্ষ ছিলো। ভেতরে ঢুকলে অচেনা মানুষ হারিয়ে যেতো। মন্দিরের ভেতরে ছিলো গোপন কক্ষ, সুড়ঙ্গ পথ। নগরকোট মন্দিরের মধ্যে ঘোড়া-হাতি হারিয়ে গেলেও খুঁজে পাওয়া ছিলো দুষ্কর। বিশাল এই মন্দিরের নিরাপত্তার জন্যে এটিকে ঘিরে তৈরি হয় বিশাল দুর্গ। যা তৎকালীন মহাভারতের দুর্গগুলোর মধ্যে ছিলো অন্যতম।

এই দুর্গ ছিলো মহাভারতের বিখ্যাত শহর কাংরার নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের উপর। পাহাড়ের উপর থাকার কারণে এটি ছিলো সুরক্ষিত। এই দুর্গে আক্রমণ করতে হলে পাহাড়ের উপর উঠতে হতো। দুর্গে অবস্থানরত নিরাপত্তা রক্ষীরা পাহাড়ের উপর থেকে তীর ছুঁড়ে এবং বড় বড় পাথর গড়িয়ে দিয়ে যে কোনো হামলাকারীকেই পরাস্ত করে দিতো। যার ফলে কারো পক্ষে এই দুর্গ দখল করা ছিলো দুষ্কর।

সুলতান মাহমূদ গজনবী যখন পেশোয়ার, বেড়া ও মুলতান দখল করে নিলেন তখন মহাভারতের হিন্দু রাজা-মহারাজাদের টনক নড়ে। তাদের কাছে মনে হলো, বিজয়ী সুলতান মাহমূদ মূর্তিপূজারী ভারতের বুকে খঞ্জর বিদ্ধ করেছেন। সুরক্ষিত হওয়ার ফলে নগরকোট মন্দিরের গুরুত্ব আরো বেড়ে গেলো। মন্দির যেমন ছিলো গুরুত্বপূর্ণ তদ্রূপ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণও

ছিলো হিন্দুদের কাছে পূজনীয়। নগরকোট মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রাধাকৃষ্ণ কট্টর ব্রাহ্মণ।

রাজা-মহারাজারা শাসন করতো নিম্নবর্ণের হিন্দুদের, আর পুরোহিত রাধাকৃষ্ণ শাসন করতো রাজা-মহারাজাদের। অবতারের মতোই সকল বর্ণের হিন্দু রাধাকৃষ্ণকে সম্মান করতো, তার পায়ে মাথা ঠুকে প্রণাম জানাতো। সাধারণত মন্দিরে যেসব ঘটনা ঘটে থাকে, নগরকোট মন্দিরে সেসব কখনো ঘটতো না। পুরোহিত রাধাকৃষ্ণ নগরকোট মন্দিরে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছিলো যে, সেখানে হিন্দু পূজারীরা পূজা-পার্বন ছাড়া অন্যকিছু ভাবতেও পারতো না। নগরকোট মন্দিরে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর পূজারীদের যাতায়াত ছিলো বটে, কিন্তু কোনো নারীর পক্ষে কোনো পণ্ডিতের সংস্পর্শে আসার অনুমতি ছিলো না এবং নারী-পুরুষ একত্রে পূজায় শরীকও হতে পারতো না।

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর পূজারী পুরোহিত রাধাকৃষ্ণের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে চাইতো, কিন্তু পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ কোনো নারীকে শরীর স্পর্শ করতে দিতো না। নারী, শিশু, কিশোরী, যুবতী আর বৃদ্ধ যাই হোক না কেনো, কারো পক্ষেই প্রধান পুরোহিত রাধাকৃষ্ণের কাছে যাওয়ার অনুমতি ছিলো না। সে নারী সংস্পর্শ থেকে নিজেকে দূরে রাখাকে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য বলে বিশ্বাস করতো।

মন্দিরে বড় পুরোহিত রাধাকৃষ্ণের আরো কয়েকজন সহকারী পুরোহিত ছিলো। নারীর সংস্পর্শ থেকে তাদেরকে রাধাকৃষ্ণ দূরে থাকার জন্যে নির্দেশ দিতো। কঠোরভাবে তাদেরকে নারী সঙ্গ থেকে দূরে রাখতো। রাধাকৃষ্ণ মনে করতো, নারীই পৃথিবীতে সকল অনিষ্টের মূল। পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ বিশ্বাস করতো, নারীর মধ্যে এমন জাদুকরী ক্ষমতা রয়েছে, সে জাদু যদি কোনো পুরুষকে পেয়ে বসে তাহলে সেই পুরুষ আর কোনো ভালো কাজ করতে পারে না। সে পাপ ছাড়া ভালো কিছুর কথা ভাবতেও পারে না।

এই বিশ্বাস থেকে রাধাকৃষ্ণ যৌবনে সংসার ত্যাগ করে হিমালয় পাহাড়ের কোলে হিন্দুদের পবিত্র গঙ্গা নদীর উৎসস্থলে চলে গিয়েছিলো। দীর্ঘ পনের বছর রাধাকৃষ্ণ বিজন প্রান্তরে দেব-দেবীর পূজা করে কাটিয়েছে। ততোদিনে তার রিপু তাড়না মরে যায়। তার মনে কোন কামনা-বাসনা আর বাকি থাকেনি। দীর্ঘ সাধনার পর গঙ্গা প্রবাহের পথ ধরে লোকালয়ে এগুতে থাকে রাধাকৃষ্ণ। নগরকোটে পৌঁছে পাহাড়ের উপর এ বিশাল মন্দির দেখে স্থানটি তার কাছে খুবই

ভালো লাগে। মন্দিরের সেবায় লেগে যায়। এক পর্যায়ে কঠোর সাধনাবলে নিজেকে উন্নীত করে প্রধান পুরোহিতের মসনদে।

প্রধান পুরোহিত রাধাকৃষ্ণের বয়স এখন ষাটের কাছাকাছি। এতোগুলো বছর পাড়ি দিয়ে এলেও তার চেহারা-শরীরে বয়সের ছাপ পড়েনি। শরীরের শক্ত বাঁধনের ফলে চেহারার কোথাও বলিরেখা দখল পায়নি। নিরামিশভোজী রাধাকৃষ্ণ কোনো জীবজন্তুর গোশ্‌ত ভুলেও আহার করে না। পূজা-পার্বন আর সেই ভোরবেলায় গঙ্গাজলে স্নান শীত-বর্ষা-হেমন্ত কোনো ঋতুতেই বিন্দুমাত্র ত্রুটি করে না। কঠোর নিয়ম-নীতি মেনে চলার কারণেই নগর মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হিসেবে সবাই তাকে বরণ করেছে। সাধারণ হিন্দুদের কাছে সে শুধু মন্দিরের পুরোহিতই নয়, এক জ্যান্ত দেবমূর্তিও।

তার হাঁটা-চলা, চাহনী, বলায় রয়েছে দারুণ সম্মোহনী শক্তি। রাজা-মহারাজাদের চেয়েও তার চলন-বলনে রয়েছে ঐশ্বর্যের বহিঃপ্রকাশ। সে গর্বভরে সবাইকে বলতো, দুনিয়ার খেল-তামাশা, আমোদ-প্রমোদ, নারীর স্পর্শ থেকে আমার দেহ-মন পবিত্র। তাই শত বছর পর্যন্ত আমার শরীর এমনই থাকবে। সে গর্ব করে বলতো, যে তার দেহ-মনকে পবিত্র করে নিতে পারে, তার শরীর সবসময় থাকে তরতাজা। জগতের রোগ-শোক জড়া তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

মহাভারতের হিন্দু ধর্মীয় অঙ্গনে সে ছিলো একটা স্তম্ভ। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারত ছিলো তার কণ্ঠস্থ। তার ভাষায় ছিলো জাদুকরী ক্ষমতা। মানুষ তাকে বাস্তব অবতার বলে পূজা করতো। ভাবতো, নগরকোট মন্দিরের প্রধান পুরোহিত সনাতন ধর্মের বাস্তব নতুনা। রাজা-মহারাজাদেরকে সে দাপটের সাথে শাসন করতো। যেসব রাজা-মহারাজাকে সাধারণ প্রজারা পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতো, সেসব রাজা-মহারাজা তার পায়ে মাথা ঠুকে প্রণাম জানাতো। তারা এই পণ্ডিতের সান্নিধ্যে এলে নিজেদের ক্ষমতা ও দাপট তার পদমূলে সঁপে দিতো।

নগরকোট মন্দির ছিলো সোনাদানা, মণিমুক্তা, হীরা-জহরতের ভাণ্ডার। সারা ভারতের রাজা-মহারাজারা প্রাণ খুলে নগরকোট মন্দিরে নিয়মিত নজরানা পাঠাতো। মণিমুক্তা, হীরা-জহরত, সোনাদানা পাঠাতে পারাকে তারা সৌভাগ্যের পরিচায়ক ভাবতো। নগরকোট অঞ্চলের সকল কৃষক, জমিদার নিয়মিত মন্দিরে খাজনা দিতো। কারণ, এ অঞ্চলের সব জমির মূল মালিকানার অধিকারী ছিলো মন্দির। বিশাল এই সম্পদ পুরোহিত রাধাকৃষ্ণ না নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করতো,

না সম্পদে কোন পুরোহিতকে হাত দিতে দিতো। এসব সম্পদের ব্যাপারে সে বলতো, এ সম্পদের মালিক ভগবান। ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানেই খরচ হবে এ সম্পদ। মন্দিরের বিশাল আয়ের একটি অংশ প্রধান পুরোহিত রাধাকৃষ্ণ অতি দরিদ্র হিন্দু প্রজাদের মাঝে ব্যয় করতো, আর কিছু বরাদ্দ থাকতো গরীব হিন্দুদের শিক্ষা-দীক্ষায়। বাকি সম্পদের ব্যাপারে তার কথা ছিলো, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রতা রক্ষায় ব্যয় হবে মন্দিরের সব ধন-রত্ন।

১০০৭ খৃস্টাব্দ মোতাবেক ৩৯৮ হিজরী সনের ঘটনা। সুলতান মাহমূদ বর্তমান আটকাবাদে তৎকালীন লাহোরের প্রতাপশালী রাজা আনন্দ পালকে সম্মুখ সমরে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। লজ্জাজনকভাবে তৃতীয়বারের মতো পরাজিত হয়ে রাজা আনন্দপাল কাশ্মীরের দিকে পালিয়ে যায়। দীর্ঘদিন পর্যন্ত রাজা আনন্দ পাল আর নিজের রাজধানীতে ফিরে আসেনি। এরপর সুলতান মাহমূদ বেরায় রাজা বিজি রায়কে চরমভাবে পর্যুদস্ত করেন। বিজি রায়কে পরাজিত করার পরই মুলতানে হামলা করে হিন্দু ও খৃস্টানদের ক্রীড়নক কারামতিদের দুর্ভেদ্য দুর্গ চিরতরে ধ্বংস করে দেন। সেই সাথে মুলতানকে গজনী সালতানাতের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। বেরার অপর যুদ্ধে আনন্দ পালের ছেলে শুকপাল পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু সুলতানের অনুপস্থিতিতে সেনাবাহিনীকে ধোঁকা দিয়ে পুনরায় ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত করায় সুলতান মাহমূদ নিজে গজনী থেকে ফিরে এসে শুকপালের চক্রান্ত ভণ্ডুল করে দিয়ে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ১০০৭ খৃস্টাব্দে মহাভারতের বুকে ইসলামের ঝাণ্ডা নতুন করে উড্ডীন হওয়ার ফলে নগরকোট মন্দিরের প্রধান পুরোহিত পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের খাওয়া-দাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। সুলতান মাহমূদের অপ্রতিরোধ্য অগ্রাভিযান এবং বেরা, পেশোয়ার ও লাহোর যুদ্ধে হিন্দু রাজাদের শোচনীয় পরাজয়বরণের সংবাদ নিয়মিত পাচ্ছিলো। এ কথাও তার অজানা ছিলো না যে, রাজা আনন্দ পাল পরাজিত হওয়ার পর রাজধানীতে না ফিরে কাশ্মীরের দিকে পালিয়ে গেছে। এ সংবাদ শুনে নগরকোটের প্রধান পুরোহিত পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ হিন্দুস্তানের সকল রাজা-মহারাজাকে নগরকোটে ডেকে পাঠায়। পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের ডাকে উজান, কাশ্মীর, কনৌজ, গোয়ালিয়ার, আজমীরের রাজাসহ সকল রাজা-মহারাজা উপস্থিত হয়।

"তোমরা কি আরাম-আয়েশ আর বিলাস-ব্যসনের ফল এখনো পাওনি? না এখনো আরো পাওয়ার বাকি আছে?" নগরকোট মন্দিরের রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসে রাজা-মহারাজাদের উদ্দেশ্যে বললো পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ। তোমাদের এই লজ্জাজনক

পরাজয়ের কারণ তোমরা তোমাদের রাজপ্রাসাদগুলোকে স্বর্গে পরিণত করেছো। তোমরা ঘুমোতে যাও তো নারী সেবিকারা তোমাদের ঘুম পাড়িয়ে দেয়। তোমাদের ঘুম থেকে জাগানোর সময় হলে নারী সেবিকারাই তাদের নরম হাতের স্পর্শে তোমাদের ঘুম ভাঙ্গায়। তোমাদের স্নানের প্রয়োজন হয়, তাও নারী সেবিকারাই সারিয়ে দেয়। নারীর স্পর্শ আর নারীর সহযোগিতা ছাড়া তোমরা এক কদম চলতে পারো না। সেবিকাও তো এমন যারা সুন্দরী-রূপসী। তোমাদের তৃষ্ণা পেলে তো মিষ্টি শরাব দিয়েও তৃষ্ণা মেটাতে পারো।

"আনন্দ পাল বলেই না পরাজিত হয়েছে। আমার বিরুদ্ধে এই ম্লেচ্ছোর বাচ্চা আসুক না...।"

'আনন্দ পাল নয়, ভারতের প্রত্যেক রাজার জন্যই এটি পরাজয়।" গর্জে উঠলো পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ। "বলছো কি? তোমরা কি হিন্দু নও! এই পরাজয় কি তোমাদের মোটেও স্পর্শ করেনি? গজনীর এক মুসলিম যোদ্ধা তোমাদের এক জাতি ভাইকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করার অর্থ হলো, গোটা হিন্দু ধর্মের পরাজয়। আনন্দ পালের পরাজয় তোমাদের পরাজয়। আমার পরাজয়। বেরা, মুলতান, লাহোরের মন্দিরগুলো কি তোমাদের বিবেচনায় পবিত্র নয়?"

মুসলমানরা দেব-দেবীর মূর্তিগুলোকে মন্দির থেকে বাইরে ফেলে এগুলোর উপর দিয়ে ঘোড়া দাবড়িয়ে পায়ে পিষে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। এগুলোর সাথে কি তোমাদের ধর্মের কোনোই সম্পর্ক নেই। যেখানে শঙ্খধ্বনি বাজতো, যেখানে বাজতো ঘণ্টা, যেখানকার তরুলতা আকাশ-বাতাস মন্দিরের গুণকীর্তন শুনতো, সংস্কৃতি ও ধর্মের শ্লোক ধ্বনিত হতো; সেখানে আজ ধ্বনিত হয় 'আযান'!"

পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের শ্লেষাত্মক কথায় রাজা-মহারাজাদের সমাবেশে নেমে এলো পিনপতন নীরবতা। পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ বলছেন, "ওখানকার মুয়াজ্জিনের আযান এতোটা দূরে বসেও আমার কানে বিদ্ধ হয়। কষ্টে আমি রাতে ঘুমাতে পারি না। হরেকৃষ্ণ ও হরেরামের পরিবর্তে আমার কানে বাজে আযানের ধ্বনি। আমি এখন মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করতে ভয় পাই। দেব-দেবীদের চোখে-মুখে ক্ষোভ দেখছি। আমার মনে হয়, এ মন্দির, এ দুর্গ, এ পাহাড় সবই যেনো ক্ষোভে কাঁপছে। তোমরা কি চাও যে মুসলমানরা এখানে এসে আমাদের এই দেব-দেবীগুলোকেও গুঁড়িয়ে দিক। এ মন্দিরেও ধ্বনিত হোক ওদের 'আযান'।"

"এমনটি হতে দেয়া হবে না মহারাজ!" সমবেত সকল রাজা-মহারাজার কণ্ঠে সমস্বরে উচ্চারিত হলো। "আমরা আমাদের সবকিছু উৎসর্গ করে দেবো।

কিন্তু কোনো মুসলমান এদিকে এলে তাকে আর জীবিত ফিরে যেতে দেবো না।”

“ওরা এখান থেকে ফিরে যাওয়ার জন্য আসবে না। ওরা এখানে আসবেই। আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি। আমার দৈবজ্ঞান এ কথাই বলছে। তোমরা তো সুন্দর প্রমোদবালা আর নর্তকীদের নিয়ে আমোদে ডুবে রয়েছো। তোমরা কি লক্ষ্য করছো, মুসলমান বিজয়ীরা কি তোমাদের মতো সুন্দরী ললনাদের সঙ্গে রাখে? তোমরা এই পবিত্র মন্দিরেও ভোগের সকল উপকরণ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছো!

বলতে পারো, আমার কেনো ঘুম আসে না? আমি গভীর রাতে গঙ্গামাতার নির্মল পানিতে ডুব দিয়ে ভগবানের কাছে কান্নাকাটি করি কেন? আমার তো কোনো রাজ্য নেই, রাজধানী নেই। কিন্তু তারপরও আমার এতো উদ্বেগ, এতো দুশ্চিন্তা কেনো? তোমরা যদি পরিস্থিতি আমার চোখে দেখো, আমার জ্ঞানে চিন্তা করো, তাহলে সারা মহাভারত তোমাদের নিজের দেশ মনে হবে। মনে রেখো, মাহমূদ গজনবী কোনো দেশ দখলের জন্য লড়ছে না। হিন্দু ধর্মের অস্তিত্ব বিলীন করা আর এখানে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার যুদ্ধ। মুহাম্মদ বিন কাসিমের হাতে ভারতের হিন্দু রাজার পতন ঘটলেও পরে আমাদের বাপ-দাদারা এ দেশ থেকে ইসলামকে বিতাড়িত করেছিলেন। অথচ আজ আবার ইসলাম ঝড়ের বেগে ধেয়ে আসছে। আর তোমরা এখনো গভীর বিলাস ঘুমে ডুবে আছো।

ধর্মকে না হয় তোমরা ভুলেই গেলে। কিন্তু তোমাদের নিজেদের কথা কি একটু ভেবেছো? তোমরা যদি পরাজিত হও, তোমরা কোথায় যাবে? তোমাদের শবদেহের সৎকার করার কেউ থাকবে? জীবিত থাকলে বাকি জীবনটা মুসলমানদের কারাগারে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হবে। আর তোমাদের স্ত্রী-কন্যাদের সাথেও সেই আচরণই করা হবে, এসব নর্তকী-বাইজীদের সাথে তোমরা যা করে থাকো।”

পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের বক্তব্য শুনে রাজা-মহারাজাদের চৈতন্যোদয় হলো। তাদের ভ্রান্তি দূর হয়ে যায়। তাৎক্ষণিক তারা ভুলে যায় পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-ভেদাভেদ। তারা চরম উত্তেজনায় সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে থাকে। তারা সম্মিলিত হিন্দু বাহিনী গঠন করে বেরা ও মুলতানের মাঝে মুসলিম বাহিনীকে ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা আঁটে।

আবেগ নয়, আকল দিয়ে কাজ করো। সবাই মিলে একক সেনাবাহিনী তৈরি করে মুলতানের দিকে অভিযান শুরু করো। আর মুসলিম সুলতানকে সেখানকার কোনো পাহাড়ের গিরি খাদে আটকে ফেলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করো। তাকে উন্মুক্ত ময়দানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পেরেশান করে তোলো। তাহলে বেরা ও মুলতান এমনিতেই তোমাদের দখলে চলে আসবে। তোমরা যদি পেশোয়ারে মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হও তাহলে তোমাদের মোকাবেলায় থাকবে মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য। বেরা ও মুলতান থেকে পাঠানো সাহায্যকারীদের তোমরা পথিমধ্যেই আটকে দিতে পারবে।

রাজা-মহারাজাদের বৈঠকে কিছুক্ষণ সামরিক কৌশল নিয়ে কথাবার্তা হলো। সকল রাজা-মহারাজাই আনন্দ পালের শূন্যতা অনুভব করছিলো। পণ্ডিত তাদের জানালো, "জানতে পেরেছি সে কাশ্মীরে আছে। তাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হবে। তোমরা প্রত্যেক রাজ্যে ঘোষণা করে দাও, মুসলমানদের এ দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য, অনেক রসদপত্র, বাহন, অস্ত্র, পোশাক ও তাঁবুর প্রয়োজন। এ জন্যে প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। ধর্ম ও দেব-দেবীদের মর্যাদা রক্ষা তহবিলে প্রত্যেকের উচিত উদার হস্তে দান করা। আর প্রত্যেক যুবককে সোৎসাহে সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্যে আহ্বান জানাও।"

"লাহোরে আমরা দু'বার দু'টি কুমারী বলী দিয়েছি, তবুও অদৃষ্টের চাকা ঘুরলো না। দু'টি নরবলীই ব্যর্থ হয়েছে। মুসলমানরা বিজয়ী হয়েছে আর আমরা হেরেছি। মনে হয় ভগবান আমাদের প্রতি খুব অসন্তুষ্ট।" বললো এক রাজা।

"কবুল না হওয়ার কারণ হলো, এসব কুমারী সতী-সাধ্বী ছিলো না।" বললো স্তম্ভিত রাধাকৃষ্ণ। "আমি পণ্ডিতদের জানি, এরা দীর্ঘদিন এই কুমারীদ্বয়কে হেফাজতের নামে দেবতাদের আমানতের খেয়ানত করেছে। এমন পাপী পণ্ডিতদের হাতে ব্যবহৃত কুমারী বলী দিলে দেবতারা তা গ্রহণ করে না। আমিও এ কথা ভাবছি। দেবতার চরণে এক পবিত্রা কুমারী বলী দেয়া দরকার। এ কুমারী তোমাদের কারো নর্তকীর মধ্য থেকে দিতে হবে। নর্তকী হতে হবে যুবতী, সুন্দরী, রূপসী এবং সে হবে মুসলমান। তাকে হতে হবে রাজার খুব প্রিয়জন।"

"নর্তকীরা তো আর পবিত্র হয় না মহারাজ। আর আপনি বলছেন তাকে মুসলমানও হতে হবে।" বললো এক রাজা।

"হ্যাঁ, আমি এ জন্যই বলছি, তাকে কোনো পণ্ডিত নিজের কাছে রাখেনি তা নিশ্চিত করতে হবে। পণ্ডিতের কাছে রক্ষিতা না হলে তাকেই আমি পবিত্র মনে

করি। আমি সেই নর্তকীকে আমার তত্ত্বাবধানেই মন্দিরে রাখবো। এরপর দেখো, এই কুমারী বলী দেবতারা কবুল করে কিনা। নর্তকীকে আমি বাছাই করবো।"

সারা হিন্দুস্তানের সকল হিন্দু রাজ্যজুড়ে হাটে-মাঠে, অলিতে-গলিতে, মন্দিরে-ভজনালয় সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়লো এ খবর– মুসলমানরা তুফানের মতো মহাভারতের একটির পর একটি দুর্গ জয় করছে। মুসলমানরা পেশোয়ার থেকে মুলতান পর্যন্ত সকল হিন্দু তরুণীদের ধরে নিয়ে সেনাদের যৌন দাসীতে পরিণত করছে। মন্দিরগুলো মুসলমানরা আস্তাবলে পরিণত করছে। যেসব হিন্দু সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছে, এরা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়েছে এবং পঙ্গু হয়ে গেছে। এদের প্রতি দেবতারা অভিশাপ করেছে। যদি সকল হিন্দু রাজা-প্রজা মিলে মুসলমানদের প্রতিরোধ না করে, তাহলে সকল হিন্দু দেবতার অভিশাপে ধ্বংস হয়ে যাবে।

এসব প্রচারণায় সকল হিন্দুর মনে দেব-দেবীর অভিশাপের ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। মন্দিরগুলোতে পুরোহিতরা ধর্মালোচনার চেয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদগারের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। সকল পূজারী ও হিন্দু নারী-পুরুষের মধ্যে মুসলমানদের সম্পর্কে পচণ্ড ঘৃণা ছড়িয়ে দেয়। সবচেয়ে বেশি আতংক ছড়িয়ে দেয়া হয় নারীদের মাঝে। এর ফল দাঁড়ায়, (ঐতিহাসিক গরদিজী, উতবী এবং আবুল কাসেম ফারিশতার ভাষায়) হিন্দু নারীরা তাদের রক্ষিত গহনাপত্র বিক্রি করে টাকা-পয়সা সরকারী কোষাগারে জমা দিতে থাকে। যেসব নারীর গহনাপত্র ছিলো না, তারা সূতা কেটে উপার্জিত অর্থ রাজকোষে জমা করতে থাকে। অতি দরিদ্র হিন্দু মেয়েরা শ্রম বিক্রি করে অর্জিত অর্থ রাজা-মহারাজাদের সামরিক তহবিলে জমা দিতে থাকে। সারা হিন্দুস্তানের হিন্দুদের মধ্যে এমন এক উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ে যে, সবাই অর্থ উপার্জন আর তা সরকারী তহবিলে জমা করার চিন্তায় পেরেশান হয়ে যায়। হিন্দু যুবকরা নিজেদের ঘোড়া সাথে নিয়ে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য উদগ্রীব সময় কাটায়।

এ উন্মাদনা ছিলো মহাভারতের হিন্দুদের মনে। বিষয়টি এমন যে, পাহাড়ী আগ্নেয়গিরি তার ভূগর্ভস্থ লাভা উদ্‌গিরণ করতে চাচ্ছে। আর ভেতর থেকে আগুন-পাথর বের করে দিচ্ছিলো তার লেলিহান শিখা। দেখে মনে হচ্ছিলো, এ পাহাড় যদি এখন ভেঙ্গে পড়ে তাহলে তার আগ্নোৎপাতে সারা দুনিয়া জ্বলেপুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে।

সুলতান মাহমূদ গজনবী এই মানব অগ্নেয়গিরির পাদদেশেই অবস্থান করছিলেন। তিনি সেসব মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াই করে পুনরায় ফিরে

এসেছেন, যারা তার আশা-আকঙ্ক্ষা এবং তার বিশ্বাসের প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করে। এসব ঈমান বিক্রেতাদের আক্রমণ থেকে গজনী সালতানাতকে রক্ষার জন্য সীমান্ত এলাকায় প্রচুর সংখ্যক সৈন্য যদি প্রহরায় নিয়োগ না করতে হতো, তাহলে এরা ভারত অভিযানে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারতো। বেরা ও মুলতান যুদ্ধে সুলতান মাহমূদের বহু সৈন্য নিহত হয়েছিলো। সৈন্য ঘাটতিতে তিনি নতুন সৈন্য ভর্তি করে অনেকাংশে পূর্ণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু ভারত অভিযানের জন্য তা ছিলো অপর্যাপ্ত।

অব্যাহত বিজয়ের পরও সুলতান কখনো নিজের শক্তি-সামর্থের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আস্থায় আত্মশ্লাঘা অনুভব করতেন না। তিনি এমনটিও কখনো ভাবেননি যে, হিন্দু রাজা-মহারাজারা তাকে বিনা প্রতিরোধে ছেড়ে দেবে। সুলতান নিজের সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করার জন্য একটু অবকাশ চাচ্ছিলেন। রাজা আনন্দপালের পক্ষ থেকেই তিনি প্রত্যাঘাতের বেশি আশংকা করছিলেন। ভারতের সকল রাজা-মহারাজা সম্মিলিতভাবে তার বিরুদ্ধে আঘাত হানতে পারে এ চিন্তাও তিনি মাথায় রেখেছিলেন।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় পাওয়া যায়, সুলতান মাহমূদ তার বাহিনীকে বিজয়ের আনন্দে বিভোর হয়ে অবকাশ যাপনের সুযোগ দেননি। তিনি পুনরায় সৈন্যদেরকে অধিকতর কঠিন সামরিক কৌশল রপ্ত করাতে মনোযোগী ছিলেন এবং সৈন্যদেরকে শৃঙ্খলা রক্ষার প্রতি যত্নবান করে তোলেন। সেনাবাহিনীকে নতুন করে উচ্চতর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করা এবং কমান্ড ও নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলার প্রতি অভ্যস্ত করে তোলার কাজটি করতেন সেনাবাহিনীতে নিয়োজিত ইমামগণ। তাছাড়া সুলতান মাহমূদের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য ছিলো, তিনি যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (মালে গনীমত) থেকে কখনো সেনাদের বঞ্চিত করতেন না। পক্ষান্তরে বিজিত এলাকায় সেনাবাহিনীর যথেচ্ছাচার ও লুটপাটও তিনি বরদাশত করতেন না।

তিনি গোয়েন্দা বাহিনী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিভিন্ন রাজধানীতে বসবাসকারী স্থানীয় মুসলমানরা সুলতানের গোয়েন্দাদের সম্ভাব্য সহযোগিতা করতো। অবশ্য এসব মুসলমানদের মধ্যে ঈমান বিক্রেতাও ছিলো। এরা প্রায়ই মুসলমান গোয়েন্দাদের ধরিয়ে দিতো। তদুপরি সুলতানের গোয়েন্দা ব্যবস্থা এতোটুকু মজবুত ছিলো যা দ্বারা তিনি কোনো রাজধানীতে হিন্দু রাজা-মহারাজারা কি করছে, এসব খবর তার কাছে সময় মতোই পৌছে যেতো। কিছু সংখ্যক সৈন্যের অনুরোধে রাজা আনন্দ পাল কাশ্মীর থেকে তার রাজধানী লাহোরে ফিরে এলো।

সে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছিলো বলে সুলতান মাহমূদের সাথে সন্ধি চুক্তি করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। এমনকি আনন্দ পাল এক দূত মারফত সুলতান মাহমূদের কাছে সন্ধি প্রস্তাব পাঠিয়ে ছিলো।

এ ব্যাপারে বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবং সুলতান মাহমূদের এসব অভিযানের প্রত্যক্ষদর্শী আলবেরুনী লিখেছেন, রাজা আনন্দ পালের পক্ষ থেকে এমন সময় এক দূত সন্ধি প্রস্তাব নিয়ে হাজির হলো, যখন সুলতান কাশগড় সীমান্তে আক্রমণকারী এক মুসলিম ক্ষমতালিপ্সুর সাথে জীবনপণ যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। সেই যুদ্ধ এতোটাই কঠিন হয়ে পড়েছিলা যে, সুলতানের কাছে কখনো বিজয় সুদূরপরাহত মনে হতো। এমন সংকটজনক পরিস্থিতির সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিলো আনন্দ পালের কাছে। এই পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পরও আনন্দ পাল সুলতানের কাছে এই বলে পয়গাম পাঠায় :

"আমি জানতে পেরেছি, তুর্কীরা আপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং বিদ্রোহ খোরাসান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। আপনি সম্মত হলে আমি পাঁচ হাজার অশ্বারোহী, দশ হাজার পদাতিক এবং একশ' জঙ্গী হাতি নিয়ে আপনার সহযোগিতার জন্য আসতে প্রস্তুত। তাছাড়া আপনি সম্মতি দিলে আমার পরিবর্তে আমার ছেলেকে এর চেয়েও দ্বিগুণ সৈন্যসহ পাঠাতে প্রস্তুত। আমার এই প্রস্তাবকে আপনি যেভাবেই মূল্যায়ন করুন না কেনো, আমি তাতে দুঃখিত নই। কারণ, আপনি আমাকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছেন। আমি চাই না আপনার উপর অন্য কেউ বিজয়ী হোক।"

এ পয়গাম ও প্রস্তাব থেকে অনুমান করা যায়, রাজা আনন্দ পাল সুলতান মাহমূদের সামরিক দক্ষতা ও রণকৌশলের প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল ও ভীত ছিলো। সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে পুনর্বার যুদ্ধ করার মতো সাহস আনন্দ পাল হারিয়ে ফেলেছিলো।

অবশ্য সুলতান মাহমূদ শুধু কৌশলি সেনাপতিই ছিলেন না; মেধা ও দূরদর্শিতার ক্ষেত্রে তৎকালীন মুসলিম শাসকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তিনি হিন্দুদের কূট-চরিত্র সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। সেই সময় তার সামরিক সহযোগিতার খুবই প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু তিনি এক পরাজিত হিন্দু রাজার সহযোগিতা নিতে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি আনন্দ পালের সামরিক সাহায্যের অন্তরালে এই আশংকাবোধ করছিলেন, আনন্দ পাল হয়তো চাচ্ছে, সুলতান মাহমূদ গযনবী গজনীর মধ্যেই স্বজাতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত থাকুক। তাছাড়া এ আশংকাও উড়িয়ে দেয়ার মতো ছিলো না যে, সাহায্যের নাম করে

কঠিন কোন মুহূর্তে সুলতানের পক্ষ ত্যাগ করে আনন্দ পাল সৈন্যবল নিয়ে প্রতিপক্ষে চলে যাবে।

আনন্দ পাল কি ইতিহাস ও আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একথা জানাতে চায় যে, সুলতান মাহমূদ এক হিন্দু রাজার সহযোগিতায় যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলো?

আনন্দ পালের পয়গাম ও প্রস্তাব নিজ সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের শুনিয়ে এ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন সুলতান। এর মধ্যে যদি অন্য কোন দূরভিসন্ধি নাও থাকে, তবুও এ কথা কিভাবে মেনে নেয়া যায় যে, চরম দু'প্রতিপক্ষের মাঝে এখন মৈত্রী স্থাপিত হয়ে গেছে? যে আমার ধর্মের শত্রু, আমার জাতির শত্রু, তার কোন প্রস্তাবে আমি সম্মত হতে পারি না, তার সহযোগিতার প্রস্তাব গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তিনি আনন্দ পালের দূতকে মৌখিকভাবেই এ বলে জবাব দিলেন যে, তোমার রাজাকে গিয়ে বলবে, "আমাদের সাথে তার কোনো সন্ধি সমঝোতা সম্ভব নয়। আমাদের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন অসম্ভব।"

এ জবাবের পরও আনন্দ পাল লাহোরে ফিরে এলো। সন্ধি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর আনন্দ পালের সামনে একটাই পথ খোলা ছিলো, চূড়ান্ত যুদ্ধ করে পরিণতিতে পৌঁছা। তখনো আনন্দ পালের সৈন্য সামন্তের ঘাটতি ছিলো না। সে রাজধানীতে পৌঁছেই তার সামরিক কমান্ডার, সেনাপতি ও উপদেষ্টাদের নিয়ে বৈঠকে বসলো। বৈঠকে সে জানালো, খুব অত্যল্প সময়ের মধ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হানতে চায়। সে বললো, এবার সে যেভাবেই হোক লড়াই করে সুলতানের কব্জা থেকে বেরা ছিনিয়ে আনতে চায়। কথোপকথনে এ কথাও উঠলো, এতো কম সৈন্য নিয়ে সুলতান মাহমূদ কিভাবে জয়লাভ করবে?

আজ পর্যন্ত কিংবা স্বর্গবাসী মহারাজা জয়পালও সুলতান মাহমূদকে কোন ষড়যন্ত্রের ফাঁদে আটকাতে পারেনি। বললো জয়পালের এক সেনাপতি। আমাদের যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছার আগেই সে খবর পেয়ে যায়। যার ফলে সে তার সেনাবাহিনীকে নিজের মতো করে প্রস্তুত করে নেয়। প্রতিবারই দেখা গেছে, আমরা তার তৈরি ফাঁদে আটকা পড়েছি। এর অর্থ হলো, সে আমাদের অগ্রাভিযানের আগাম সংবাদ পেয়ে যায়। তার গোয়েন্দারা খুবই সতর্ক। এরা হয়তো আমাদের মধ্যেই বসবাস করে।

কিছুসংখ্যক মুসলমান আমাদের এখানে বসবাস করে, এদের মধ্যেই হয়তো গোয়েন্দা রয়েছে। বললো আনন্দ পাল। এ জন্য মুসলমান আবাদী ধ্বংস করে দেয়া দরকার।

এই পদক্ষেপ আমাদের তেমন কোন ফল দেবে না মহারাজ। বললো আনন্দপালের প্রধান উজীর। সেসব লোককে এখান থেকে তাড়িয়ে দিলে গোয়েন্দারাও পালিয়ে যাবে। তার চেয়ে আমাদের উচিত, এমন পদক্ষেপ নেয়া যাতে গোয়েন্দাদের ধরা যায়। এখানকার মুসলমানদের শত্রু বানানো ঠিক হবে না। আপনি তো জানেন, সব মুসলমান গোয়েন্দাগিরি করে না। মুসলমানের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি মুসলমানের দ্বারা স্বার্থকভাবে করানো সম্ভব। আমাদের এ পদক্ষেপ নেয়া দরকার, যাতে মুসলমানরাই আমাদের হয়ে মুসলমান আবাদীর ভেতরের খোঁজ-খবর রাখে। এদের মধ্যে কে কে গোয়েন্দাগিরি করে তাদের খুঁজে বের করতে হবে। অন্তত একজনকে যদি ধরা যায়, তাহলে এ কাজে কারা জড়িত সে তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হবে।

তাহলে এদের ধরার কাজ আজ থেকেই শুরু করো এবং দ্রুত সেনা প্রস্তুতি শুরু করে দাও।

আনন্দ পালের উজির সন্তুষ্টির সাথে জানালো, প্রজারা খুবই সহযোগিতা করছে মহারাজ। মন্দিরে মন্দিরে পুরোহিত পণ্ডিতরা সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করা এবং পুনরায় চূড়ান্ত আঘাত হানার ব্যাপারে জনগণকে উৎসাহিত করছে। জনসাধারণকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। ফলে সেনাবাহিনীতে দলে দলে যুবক ভর্তি হচ্ছে এবং প্রজাসাধারণের পক্ষ থেকে অঢেল ধন-সম্পদ রাজকোষে জমা হচ্ছে।

* * *

রাজা আনন্দ পালের রাজপ্রাসাদে ঘোড়ার দেখাশোনা এবং বেয়াড়া ঘোড়াকে বাগে আনার কাজে নিয়োজিত ছিলো শুয়াইব আরমুগানী নামের এক মুসলমান। সে ছিলো সুঠাম ও স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘদেহী ও অভিজ্ঞ অশ্বারোহী। সে পেশোয়ারের অধিবাসী। রাজা জয়পালের আত্মাহুতির আগে সে লাহোরে আসে। তখন সে ছিলো তরুণ। আর এখন সে পূর্ণ যুবক। সে যে কোনো বেয়াড়া ঘোড়াকে সহজে বাগ মানাতে পারে। এ জন্য রাজা জয়পাল যেমন শুয়াইব আরমুগানীকে ভালবাসতো, রাজা আনন্দ পালও তাকে অত্যধিক পছন্দ করে। ঘোড়া বাগ মানানো ছাড়া আরও বহু গুণের অধিকারী শুয়াইব। যার ফলে রাজ প্রাসাদের সকল মানুষ এমনকি রাজকুমারী ও রাজকুমারদের কাছে শুয়াইব আরমুগানী

ছিলো খুবই প্রিয়পাত্র। তার কণ্ঠ ছিলো মায়াবী এবং কথাবার্তায় ছিলো জাদুমাখা। তার ঠোঁটে সব সময় হাসি লেগে থাকতো। তার বিশ্বস্ততার প্রশ্নে কারো মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিলো না। রাজপ্রাসাদে সে এতোটাই বিশ্বস্ত ও প্রিয়পাত্র ছিলো যে, রাজমহলের সবাই তাকে নামে মাত্র মুসলমান ভাবতো।

রাজা আনন্দ পালের রাজমহলে আরো ক'জন মুসলমান কর্মচারী ছিলো। তারা ছোট ছোট কাজ করতো। রাজা আনন্দ পালের নির্দেশে অতি গোপনে এসব মুসলমানদের পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে দিলো উজির। হিন্দু সেনারা মুসলমানদের ছদ্মবেশে তাদের যাচাই করতে শুরু করলো। তারা সুলতান মাহমূদের পক্ষে আর হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিষোদগার করতো। সেই সাথে মুসলমান মহিলাদের সাথে খাতির জমিয়ে তাদের স্বামী-পুত্রদের মনোভাব ও কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতো। হিন্দু পুরুষরা ছদ্মবেশ ধারণ করে মুসলমান পুরুষদের সাথে সখ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করতো এবং তাদের ভেতরের খবর জানার জন্যে বন্ধুত্বের অভিনয় করতো। অনেক ক্ষেত্রে নিজেদেরকে সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দা বলেই পরিচয় দিতো। এই প্রচেষ্টায় একজন মুসলমানকে গোয়েন্দা সন্দেহে গ্রেফতার করা হলো। সন্দেহের ভিত্তিতে আরো কয়েকজন মুসলমানকে গ্রেফতার করে কারা প্রকোষ্ঠের অন্তরালে কঠিন শাস্তির চাকায় পিষ্ট করতে শুরু করলো।

শুয়াইব আরমুগানী মুসলমান হলেও তার প্রতি কারো সন্দেহ করার অবকাশ ছিলো না। কারণ, সে ছিলো আস্তাবলের প্রধান। ঘোড়া নিয়ন্ত্রণ করা এবং আস্তাবল দেখাশোনার মধ্যে তার কার্যক্রম ছিলো সীমিত। তাকে সন্দেহ করার একটিমাত্র অজুহাত ছিলো যে, সে একাকী থাকতো। পেশোয়ারে তার স্ত্রী-সন্তান থাকলেও তাদের সে কখনো লাহোর আনেনি। সে অবিবাহিত হলে অতোদিনে তার বিয়ে করার প্রয়োজন ছিলো। এদিক থেকে তাকেও সন্দেহ করা যেতো কিন্তু এসব ব্যাপারে তাকে সবাই সন্দেহের বাইরে রেখেছিলো। তার সম্পর্কে অনেকেই জানতো, সে সুলতান মাহমূদ সম্পর্কে খুবই নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে। সে সুলতান মাহমূদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কথা বলে। তাকে কেউ কখনো মসজিদে যেতে দেখেনি। কোন মুসলমানের সাথে মিশতেও তাকে দেখা যায়নি।

এক সন্ধ্যায় তার বসতঘরে সে একাকী বসেছিলো। এমন সময় তার দরজায় কে যেনো টোকা দেয়। সে উঠে এসে দরজা খুলে দেয়। বাইরে দাড়িওয়ালা এক পৌঢ়ের সাথে বোরকা পরিহিতা এক যুবতী দাঁড়িয়ে। পুরুষটি নিজের পরিচয় দিয়ে জানালো, সে পেশোয়ারের অধিবাসী। একজন ব্যবসায়ী। সে ব্যবসায়িক কাজে এখানে এসেছে। তার মা মরা মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে

আসতে হয়েছে। কারণ, বাড়িতে কারো কাছে রেখে আসার মতো লোক তার নেই। মেয়েটির মা দু'বছর আগে মারা গেছে। মেয়েটিও বেড়ানোর জন্য আগ্রহী ছিলো। এ জন্য তাকে আর রেখে আসার চিন্তা করিনি।

লোকটি পেশোয়ারের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলছিল। মুসাফিরদের জন্যে সরাইখানায় থাকার ভালো ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এমন সুন্দরী যুবতী মেয়েকে সরাইখানায় রেখে আসা ঠিক মনে করিনি। শুনেছি, হিন্দু সেনারা হঠাৎ করে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালায় আর সন্দেহের নাম করে মুসলমানদের বন্দী করে। এক লোক আপনার কথা বলে দিলো। বললো, সে খুব ভালো মানুষ। একাকী থাকে। আপনি মেয়টিকে নিয়ে তার বাড়িতে চলে যান। সেই লোকটির মুখে আপনার খুব প্রশংসা শুনলাম। সে-ই আমাকে আপনার বাড়ির পথ দেখিয়ে দিয়েছে। লোকটি বললো, আপনার বাড়িও নাকি পেশোয়ারে।

কোনো মুসলমান অসহায় মুসাফিরের জন্যে তার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতে পারে না। যেখানে একটি মুসলিম তরুণীর ইজ্জতের প্রশ্ন, সেখানে আমি প্রয়োজনে সারারাত পাহারা দিয়েও কাটাতে পারি। মুসলমান অপরিচিত হলেও পর হতে পারে না। আসুন, আপনার মেয়েকে ঘরের ভেতর নিয়ে আসুন। আমার ঘরে কয়েকটি কক্ষ আছে।

লোকটি তরুণী মেয়েটিকে নিয়ে ঘরের ভেতর প্রবেশ করলো। তরুণী বাতির আলোয় যখন তার চেহারার নিকাব ফেলে দিলো, তখন শুয়াইব আরমুগানী তার চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেলো।

মেয়েটি কোনো সাধারণ তরুণী ছিলো না। তার চেহারা ছিলো চাঁদের মতো আকর্ষণীয়। তরুণীর রূপ দেখে আরমুগানীর মুখ থেকে আচমকা উচ্চারিত হলো, আপনি সরাইখানায় না থেকে ভালো করেছেন। ঢেকে রাখার মতো জিনিসকে একটি নয়, সাত পর্দার আড়ালে রাখাই উচিত।

আগন্তুককে বসিয়ে রেখে দৌড়ে বাজারে গেলো আরমুগানী। বাজার থেকে মেহমানদের জন্যে খাবার নিলো। ততক্ষণে তরুণী বোরকা খুলে মাথার উড়নাও খুলে ফেলেছে। বে-নেকাব তরুণীর রূপ-সৌন্দর্য দেখে আরমুগানী আর তরুণীর চেহারা থেকে দৃষ্টি সরাতে পারলো না।

রাজপ্রাসাদের চাকরির সুবাদে কয়েকজন সুন্দরী তরুণী আরমুগানীকে বাহুডোরে বাঁধতে চেয়েছিলো। কিন্তু আরমুগানী কারো বাঁধনেই নিজেকে আবদ্ধ করেনি। রাজা আনন্দ পালের দু'রাজকুমারী আরমুগানীর কাছে অশ্বারোহণ শিখতে আসতো। এরা উভয়েই চেষ্টা করতো তারা নিজে নিজে ঘোড়ার পিঠে

ওঠে বসবে না, আরমুগানী যাতে হাত ধরে তাদের ঘোড়ার পিঠে তুলে দেয়। তারা অশ্বারোহণ শিখে ফেলেছিলো, তবুও বারবার শেখার জন্যে আসতো আর বলতো, এখনো তারা ভালোভাবে অশ্বারোহণ করতে পারে না।

উভয় রাজকুমারী ছিলো সুন্দরী-রূপসী। তাদের পরিষ্কার ইঙ্গিতপূর্ণ আবেদনগুলোও আরমুগানী এভাবে এড়িয়ে যেতো, সে এতোটাই গেয়ো যে এসব বোঝে না। অথবা এমন ভাব করতো যে, তার বুকের মধ্যে পুরুষের আত্মাই নেই।

একবার এক রাজকুমারী ঘোড়া হাঁকিয়ে তাকে সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় নিয়ে যায়। সেখানকার এক নিরিবিলি বনানীতে রাজকুমারী আরমুগানীকে অনুরোধ করে বলে, সে যেনো তার পেছনে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে। কারণ, তার পড়ে যাওয়ার ভয় হচ্ছে। রাজকুমারী প্রথমে বন্ধুত্বের সুরে বললো, আরে এসো না! আমাকে ধরে রাখো। কিন্তু আরমুগানী তার সহ-সওয়ার হতে অস্বীকৃতি জানালো। কয়েকবার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলে রাজকুমারী নির্দেশের সুরে তার ঘোড়ায় চড়তে বলে। এবার মুচকি হেসে আরমুগানী এড়িয়ে গেলো, তবুও একই ঘোড়ার পিঠে রাজকুমারীর সাথে বসতে রাজি হলো না। এতে রাগ করে রাজকুমারী ঘোড়া ফিরিয়ে প্রাসাদে চলে এসেছিলো।

নারীদের ব্যাপারে আরমুগানী ছিলো পাথর। কিন্তু এবার সে নিজের ঘরে আসা মেহমানের তরুণী মেয়েকে দেখে নিজের মধ্যে ঝড় অনুভব করলো। এক প্রবল আকর্ষণ তাকে তরুণীর দিকে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট করতে লাগলো। সে তরুণীর সাথে কথা বলার জন্য মনের মধ্যে তাড়না বোধ করলো। সেই সাথে মনে মনে এ কথাও সে ভাবতে লাগলো, এর মধ্যে তার কোন অসৎ উদ্দেশ্য নেই তো! সে চাচ্ছিলো, তার মেহমান যদি বাইরে চলে যেতো, তবে এখানেই সে তরুণীর সাথে আলাপ জমাতে পারতো। তরুণী যখন শুয়াইব আরমুগানীর দিকে তাকাতো, তখন তার ঠোঁটের কোণার ঈষৎ মুচকি হাসিটা আরমুগানীর মধ্যে এক তাণ্ডব শুরু করে দিচ্ছিলো।

রাতের আহার পর্ব সেরে আরমুগানী মেহমানদের রাত যাপনের জন্য অন্য দু'টি কক্ষ দেখিয়ে দেয়। তরুণী দেখিয়ে দেয়া কক্ষে শুয়ে পড়ে। কিন্তু তরুণীর বাবা ফিরে এসে আরমুগানীর পাশে বসে।

রাতের অবসরে তারা নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলতে থাকে। এক পর্যায়ে মেহমান বলে, আমি মুসলমান হিসেবে সুলতান মাহমূদের অব্যাহত বিজয়ে গর্ববোধ করি। মেহমানের কথাবার্তায় প্রকাশ পাচ্ছিলো, সে সুলতান মাহমূদের

খুবই ভক্ত এবং তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। সে শুধু একজন ব্যবসায়ী নয়, জ্ঞান-গরিমা ও বেশ উঁচুমানের লোক মনে হলো তার আলাপচারিতায়। সে মুহাম্মদ বিন কাসিমের প্রসঙ্গেও আলোচনা করলো। এখনও যদি সেই চেতনায় সুলতান মাহমূদ অগ্রসর হন, তাহলে সারা হিন্দুস্তান মুসলমানদের কব্জায় নিয়ে আসা সম্ভব। মেহমান এই আশংকাও ব্যক্ত করলো, সুলতান মাহমূদের কাছে সৈন্য বাহিনী কম। হিন্দুস্তানের সকল রাজা-মহারাজা মিলে যদি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাহলে সুলতান মাহমূদের পক্ষে পেরে ওঠা অসম্ভব।

আরমুগানী মেহমানের বুদ্ধিদীপ্ত কথায় খুবই খুশি হলো এবং বললো, মুসলমানদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই। সুলতানের সৈন্যরা আল্লাহর উপর ভরসা রেখে যুদ্ধ করে।

"তা ঠিক। কিন্তু শুধু সেনাদের যুদ্ধ করাই যথেষ্ট নয়। সকল মুসলমানেরই উচিত কিছু না কিছু করা। দেখুন, আমরা দু'জন মুসলমান এখানে আছি। আমরা মুসলিম বাহিনীর জন্য কি করেছি? অথচ তারা জীবনবাজি রেখে কাফেরদের দেশে ইসলামের পতাকা তুলে ধরেছে। আর আমি এখানে ব্যবসা করছি, আপনি বেঈমানদের নৌকরী করছেন।" মেহমান বললো।

"এখন করছি বটে। প্রয়োজনে আমি চাকরি ছেড়ে দেবো।"

"না ভাই। চাকরি ছাড়ার প্রয়োজন নেই। আমি আপনাকে দেখতে চেয়েছিলাম, আপনি কোন্ পর্যায়ের মুসলমান। এখন বুঝতে পারছি, আপনি ইসলামের জন্যে মরণ স্বীকার করতে প্রস্তুত। এখন আমি আপনার সাথে মন খুলে কথা বলতে পারবো। আপনি চাকরি ছেড়ে দেয়ার কথা বলছেন। এটা ঠিক হবে না। চাকরিটাকে আপনি সুলতান মাহমূদের স্বার্থে কাজে লাগাতে পারেন। আপনি আস্তাবলের প্রধান এবং প্রশিক্ষক। অশ্বারোহণ প্রশিক্ষক হওয়ার সুবাদে হিন্দু সেনা কর্মকর্তাদের ছেলে-মেয়েরা আপনাকে খুবই পছন্দ করে বলে আমাকে জানিয়েছে সেই লোক– যে লোকটি আমাকে আপনার বাড়ির পথ দেখিয়ে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, শাহজাদীরা ও উজির-মন্ত্রীদের তরুণী মেয়েরাও আপনাকে ভালোবাসে। আপনার আর কিছু করার দরকার নেই, শুধু এতোটুকু জানতে চেষ্টা করবেন, রাজার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? এখানকার প্রস্তুতি ও তৎপরতা দেখে-শুনে সুলতান মাহমূদের কাছে সুযোগ মতো খবর পাঠিয়ে দেবেন।"

"আপনি এ ধরনের কাজ করেন নাকি?"

একটা রহস্যময় হাসি দিয়ে মেহমান বললো, "আসলে আমি যথার্থই একজন ব্যবসায়ী। কিন্তু ব্যবসায়িক কাজে আমার লাহোর আসার কোন প্রয়োজন ছিলো না। আমি উট বোঝাই করে মালপত্র নিয়ে এ জন্যে লাহোর এসেছি যাতে এখানকার পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পারি। রাজা আনন্দ পাল কি করেছে, তার রণপ্রস্তুতি কোন্ পর্যায়ে এবং কবে নাগাদ সে মুসলমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পরিকল্পনা করেছে– এসব জানাই হলো আমার মূল উদ্দেশ্য। ওদিকে সুলতানের কিছুটা সময় দরকার। কাশগরীদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে তার বিপুল সৈন্য হারাতে হয়েছে। সেনাবাহিনীকে পুনরায় তৈরি করার জন্যে তার কিছুটা সময় একান্তই দরকার।"

"আপনাকে কেউ পাঠিয়েছে? না আবেগের টানেই আপনি এ কাজ করছেন?"

"আমি কোনো মাধ্যম হয়ে কাজ করি না। সরাসরি আমার সম্পর্ক সুলতান মাহমূদের সাথে এবং তার প্রধান সেনাপতি আবু আবদুল্লাহ আল-তায়ীর সাথে। এখানে আমার এমন একজন লোকের দরকার যে রাজ-দরবার ও রাজমহলের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্পর্কে খবর রাখে, আর সেই লোকটি আপনি। যে লোকটি আমাকে বাড়ির পথ দেখিয়ে দিয়েছে সে আমার বিশ্বস্ত। সে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে বুঝে-শুনেই আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে।"

"সে কে?"

"সে কথা আমি আপনাকে বলতে পারবো না। তাতে আপনি এমনটা মনে করবেন না আমি আপনাকে বিশ্বাস করছি না। আমি সবই আপনাকে জানাবো কিন্তু আপনাকে এ প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, আপনি আমার কাজে সহযোগিতা করবেন? যদি আপনি আমাকে ধোঁকা দেন তাহলে পস্তাতে হবে।"

মেহমানের এসব কথা শুনে আরমুগানীর মাথা নীচু হয়ে গেলো। সে গভীর চিন্তায় পড়ে গেলো।

"আপনি একটু ভেবে দেখুন। সুলতান মাহমূদের প্রয়োজনে আমি আমার তরুণী মেয়েকে পর্যন্ত ব্যবহার করার জন্যে তৈরি হয়ে গেছি।" প্রচণ্ড আবেগে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললো মেহমান। "এমন রূপসী তরুণী যে প্রয়োজনে পাথর ভেঙ্গে ভেতরের তথ্য বের করে আনতে পারবে। এমনও হতে পারে যে, এখানে আমাদের কোনো নাশকতামূলক তৎপরতা চালাতে হবে।"

"আমার দু'টি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনুন।" বললো আরমুগানী।

"মেয়েদেরকে কখনো এ কাজে ব্যবহার করবেন না। মুসলমান মেয়েরা প্রয়োজনে লড়াই করে, অতীতে বহু ক্ষেত্রে মেয়েরা ময়দানে লড়াই করেছে। কিন্তু গোয়েন্দা কাজের জন্য তাদেরকে কাফেরদের মনোরঞ্জনের জন্যে ছেড়ে দেবেন না। এটা সম্পূর্ণ হারাম। এ ঘৃণ্য কাজ বেঈমানরা করে। মুসলমানরা নারীর ইজ্জত রক্ষার জন্য যুদ্ধ করে- ইজ্জত বিকিয়ে দেয়ার জন্য নয়। দ্বিতীয় কথা হলো, আমি আপনার কোনো সহযোগিতা করতে পারবো না। আমি রাজার খাই, রাজার সেবা করি। রাজা আমাকে এতো পারিশ্রমিক দিচ্ছেন যে তা আমার শ্রমের তুলনায় বহুগুণ বেশি।"

"হু, একদিকে আপনি ইসলামী চেতনা ও মর্যাদার কথা বলেন, আর অপরদিকে বেঈমানদের নিমক হালালী করেন। অথচ আমি শুনেছিলাম আপনি খুবই সাহসী ও নির্ভেজাল ঈমানদার মানুষ।"

"এই উভয়টাই আমার মধ্যে আছে। সাহসও আমার আছে, ঈমানেও কোনো ঘাটতি নেই। কিন্তু তাই বলে মুসলমান নিমকহারাম হয় তা আমি বলতে পারবো না।"

"তাহলে তো তাড়াতাড়ি আমার লাহোর ছাড়া দরকার। কারণ, আপনি আমাকে ও আমার মেয়েকে ধরিয়ে দিতে পারেন। এখানকার বিশ্বস্ত লোকেরা আমাকে বলেছে, সন্দেহ হলেই মুসলমানদেরকে রাজার সৈন্যরা পাকড়াও করছে।"

চকিতে বসা থেকে ওঠে তাক থেকে কুরআন শরীফ নামিয়ে মেহমানের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, পবিত্র কিতাবের শপথ করে বলছি, আমি আপনাকে ও আপনার মেয়েকে কখনো ধরিয়ে দেবো না। আপনার সাথে কোনো ধরনের ধোঁকাবাজি করবো না। এখন আপনি শপথ করে বলুন, এ কাজে আপনি আপনার মেয়েকে কখনো ব্যবহার করবেন না। আর আপনি সুলতান মাহমূদ গজনবীকেও ধোঁকা দেবেন না।"

মেহমান কালবিলম্ব না করে কুরআন শরীফ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করলো। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললো, "মেয়ের ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে আপনি আমার উপর জুলুম করেছেন। আপনি জানেন না আমি কী ভয়ানক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছি। যদি আমি ধরা পড়ে যাই তাহলে আমার মেয়েকে করুণ পরিণতি বরণ করতে হবে। আপনি কি এ মুহূর্তে আমার মেয়ের দায়িত্ব নিতে পারবেন? কিছুক্ষণ তাকে আপনার এখানে রাখতে পারবেন? এ অবসরে আমাকে ব্যবসায়িক কাজে একটু বাইরে কাটাতে হবে।"

"কোনো তরুণী মেয়েকে অনাত্মীয়ের ঘরে রাখা অশংকাজনক কাজ। কিন্তু আমি আপনার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারছি না, আবার গ্রহণ করতেও ভয় পাচ্ছি।"

মেহমান বণিক বসা থেকে ওঠে ঘরের মেঝেতে মাথা নীচু করে পায়চারী করতে থাকে। কিছুক্ষণ ভেবে বললো, "আমি যদি আপনার কাছে আমার মেয়েকে পেশ করি, তাহলে আপনি তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি হবেন? আমি চাচ্ছি, নিজেই ওর বিয়ে পড়িয়ে দেবো।"

"আপনি আমার মধ্যে এমন কি গুণ দেখতে পেলেন যে এমন সুন্দরী মেয়েকে আমার মতো একটা সাধারণ লোকের সাথে বিয়ে দিতে চাচ্ছেন? আমি নিজেকে আপনার মেয়ের জন্য উপযুক্ত মনে করি না।"

"তোমার সবচেয়ে বড় গুণ তুমি গোয়েন্দা নও। এ জন্যই আমি তোমাকে যাচাই করতে চাচ্ছিলাম, তুমি গোয়েন্দাগিরি করো কিনা। তুমি একজন বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী। এদিক থেকে আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ নিরাপদ। কারণ, গোয়েন্দাদের জীবনের কোনো নিশ্চয়তা থাকে না। তারা তাদের স্ত্রী-সন্তানদের সাথে রাখতে পারে না। আমার মেয়ের জন্যে বহু বিত্তশালী পাত্র আছে। পেশোয়ারে অবস্থানকারী এক ডেপুটি সিপাহসালার আমার মেয়েকে বিয়ে করতে আগ্রহী। কিন্তু আমি সম্মতি দেইনি। আমি কোনো বিত্তশালীর কাছে মেয়ে বিয়ে দিতে চাই না। কারণ, ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এক বিবিতে সন্তুষ্ট থাকে না।"

মেহমানের বিয়ের প্রস্তাবের কথা নিজের কানে শুনেও শুয়াইব আরমুগানীর যেনো বিশ্বাস হচ্ছিলো না। কারণ, এই তরুণীকে প্রথম দর্শনে সে তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেছে। মেয়ের বাবা নিজ থেকে বিয়ের প্রস্তাব করায় তার পক্ষে এ ব্যাপার নিয়ে আর ভাবনা-চিন্তা করা অপ্রীতিকর মনে হচ্ছে। তারপরও আরমুগানীর মাথায় বিক্ষিপ্ত ভাবনারা ভীড় করছে।

"আমি আজ সন্ধ্যায় আবার আসবো।" এই বলে আরমুগানীর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মেহমান। এখন আরমুগানী আর তরুণী ছাড়া ঘরে আর কেউ নেই।

সকাল বেলা। নাস্তার আয়োজন করে আরমুগানী তরুণীর সামনে রেখে বললো, "তোমার নাম কি?"

মেয়েটির সলজ্জ উত্তর, "যারকা।"

"আমার সাথে তোমার বিয়ে হচ্ছে। তোমার বাবা কি তোমাকে একথা বলেছেন?"

আরমুগানীর কথা শুনে তরুণী লজ্জায় মাথা এতোটাই নীচু করে ফেললো যে, সে যেনো লজ্জায় মারা যাচ্ছে।

"আরে এতো লজ্জা কিসের? আমার কথার জবাব দাও যারকা?" আরমুগানী তরুণীর চিবুক ধরে মাথা উপরে তুলে বললো। "আমাকে ভালো করে দেখে নাও। আমাকে যদি তোমার পছন্দ না হয় তাহলে পরিষ্কার বলে দাও। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সারা জীবনের জন্যে আমি তোমাকে শিকলে বাঁধতে চাই না। তুমি অসম্মত হলে আমি তোমার বাবাকে খোলাখুলি নিষেধ করে দেবো। বলবো, এ বিয়ে হবে না।"

তরুণী মুখে কিছুই বললো না। আরমুগানীর ডান হাতটি টেনে নিয়ে চুমু দিলো এবং চোখে চোখ রাখলো তরুণী।

প্রায় যৌবনের শুরু থেকেই অশ্বারোহণ ও অশ্ব প্রশিক্ষণে কেটেছে আরমুগানীর জীবন। অশ্বলোমের স্পর্শে ঘোড়ার গায়ে হাত বুলাতে অভ্যস্ত সে। সে কখনো অনুভব করেনি কোনো যুবতী তরুণী সুন্দরীর এমন মায়াবী স্পর্শ, শরীর জুড়ে শিহরণ। এমন ভুবন মোহিনী চাহনী, এমন নজরকাড়া দৃষ্টি, এমন রেশম কোমল স্পর্শের সাথে আরমুগানী অপরিচিত। হঠাৎ রূপসীর এই অনাকাঙ্ক্ষিত স্পর্শ ও আত্মনিবেদনে আবেগে আত্মহারা হয়ে গেলো আরমুগানী।

সন্ধ্যায় যারকার বাবা যখন ফিরে এলো, তখন তার সাথে এলো আরও দু'জন। তারা এসে শুয়াইব আরমুগানীর সাথে যারকার বিয়ে পড়িয়ে দিলো। যারকার পিতা যারকাকে বিয়ে উপলক্ষে দামি দামি কাপড়, গহনাপত্র এবং প্রচুর নগদ অর্থ উপঢৌকন দিলো।

বিয়ে পর্ব সেরে রাতেই যারকার বাবা আরমুগানীর ঘর থেকে বিদায় নেয়। তার যাওয়ার ভঙ্গিটা এমন ছিলো, সে যেনো যারকার বিয়ে দিতেই এখানে এসেছিলো। সেই রাতে শুয়াইব আরমুগানীর সংশয় হচ্ছিলো, কোনো স্বপ্ন দেখছে না তো?

যারকার বাবা চলে যাওয়ার একটু পরে যারকা আরমুগানীর সাথে এমন অন্তরঙ্গ মনোভাব পোষণ করছিলো যেনো আরমুগানী তার অনেক দিনের পরিচিত। মনে হচ্ছিলো, দীর্ঘদিন থেকে সে আরমুগানীকেই মনের একান্ত পুরুষ হিসেবে পাওয়ার জন্য উদগ্রীব ছিলো। যারকার আত্মনিবেদনে আরমুগানী এতোটাই আত্মহারা যে, মনে হচ্ছিল ঝর্নার তীরে এসেও সে তৃষ্ণায় মরে যাচ্ছে।

"তোমার বাবা সুলতান মাহমূদের ব্যাপারে বেশি আবেগপ্রবণ।" যারকার উদ্দেশ্যে বললো আরমুগানী। "আচ্ছা তুমি কি বলতো পারো তার এসব বলার উদ্দেশ্য কি?"

“আমি যদি বলি, বাবা যে ইচ্ছা পোষণ করেন, আমিও তাই পোষণ করি। তাহলে আপনি আমার এ ইচ্ছাকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন? বাবা আপনার সাথে যেসব কথা বলেছেন, তিনি সবই আমাকে বলে গেছেন।”

“এ কথাও কি তিনি বলেছেন, তার গোয়েন্দা কাজে সহযোগিতার জন্য তুমি যাতে আমাকে সম্মত করাও?”

“হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনার সাথে এখন আর আমার কিছু লুকানোর নেই। তিনি আমাকে বলে গেছেন, আমি যাতে বলে-কয়ে আপনাকে তার সহযোগিতা করতে উৎসাহিত করি। কারণ, রাজা আপনাকে এমন দায়িত্বে নিয়োজিত করেছেন, যেখান থেকে আপনি খুব মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।”

“এ জন্যই কি তুমি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছো? আমার তো মনে হয়, এ কাজের পুরস্কার হিসেবে আমার হাতে তোমাকে তুলে দেয়া হয়েছে।”

“না না, তা নয়। পুরস্কার মনে করতে পারেন। তবে তা আল্লাহ আপনাকে দান করেছেন। কোনো ব্যক্তি দেননি। আপনি এখন শুধু আমার জীবন সঙ্গী নন, আপনি আমার মনের শান্তি, হৃদয়ের অধিপতি। আমি গতকালই আপনাকে প্রথম দেখেছি। অথচ আমার মনে হচ্ছে, কতকাল ধরে আপনি আমার একান্ত পরিচিত। এখন থেকে আপনিই আমার সুখ, আপনিই স্বপ্ন, আপনিই বাস্তব। এখন আপনিই আমার হৃদয় রাজ্যের অধিকারী। আপনার কোনো সংশয়-সন্দেহ পোষণের কারণ নেই। বাবা আপনাকে ইসলামের জন্যে আত্ম-উৎসর্গকৃত পতঙ্গ মনে করতে পারেন। তিনি এতোটাই উদগ্রীব যে, পারলে একাই সারা হিন্দুস্তান ইসলামের পতাকাতলে নিয়ে আসবেন। আমি দেখেছি, তিনি যতো মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, সবাইকে এ কথাই বুঝাতে চেয়েছেন, সুলতান মাহমূদের বিজয় অভিযানে প্রত্যেক মুসলমানের করণীয় রয়েছে। মসজিদে গিয়ে তিনি দীর্ঘ সময় সুলতানের বিজয় ও হিন্দুদের পরাজয়ের জন্য দুআ করেন। তিনি নিজে আমাকে তরবারী চালনা, অশ্বারোহণ ও তীরন্দাজী শিখিয়েছেন। একবার তো তিনি আবেগে আমার উদ্দেশে বলেই ফেললেন, বেটি! হতে পারে আমি তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারবো না, এর আগেই ইসলামের জন্য তোমার কুরবান হয়ে যেতে হবে।”

যারকার কথায়ও আরমুগানী বুঝতে বাধ্য হলো, এ মেয়েটিও তার বাবার মতোই আবেগপ্রবণ।

“এ কথা তোমাদের কে বলেছে যে, আমি গজনীর গোয়েন্দা?”

যারকা এ সময় এক হাত আরমুগানীর কাঁধে তুলে নিজেকে এতোটাই কাছে নিয়ে এলো যে, তার ললাট আরমুগানীর ললাট স্পর্শ করছে। "বাবাকে এ ব্যাপারে কে কি বলেছে তা আমি জানি না। তিনি আমাকে শুধু বলেছেন, আমরা যার কাছে যাচ্ছি তিনি খুবই কাজের লোক। আপনি যদি সত্যিই বলে থাকেন যে, আপনি সুলতান মাহমূদের গোপন দলের লোক নন, তাহলে সেটা হবে আমার জন্য হতাশার কারণ।"

"তাহলে কি মনে-প্রাণে তুমি আমাকে ভালোবাসা দিতে পারবে না?"

"এ কথা বলছেন কেন? ভালবাসা ভিন্ন জিনিস। একবার মনের মণিকোঠায় যার ঠাঁই হয়ে যায়, দুনিয়ার কোনো স্বার্থের কারণে তা নষ্ট হতে পারে না। আমার হৃদয় রাজ্যে আপনার আসন পাকাপোক্ত হয়ে গেছে। আমি আপনাকে বোঝাতে চাচ্ছি, আমি এমন একটা কার্যকর পদক্ষেপ দেখতে চাই, যাতে গোটা হিন্দুস্তান না হোক অন্তত অর্ধেক হিন্দুস্তান ইসলামী পতাকার ছায়ায় স্থান পায়। যাতে এখানকার অনাগত প্রতিটি শিশু মুসলমান হিসেবে পৃথিবীর আলো-বাতাসে বেড়ে উঠতে পারে।

"তোমাকে এ কথা কে বলেছে যে, শুধু গোয়েন্দাগিরির দ্বারাই সুলতান মাহমূদকে সহযোগিতা করা যাবে। গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ ছাড়াও তাকে আরো সহযোগিতা করার বহু পদ্ধতি রয়েছে।"

"বাবা শুধু গোয়েন্দাগিরির কথাই আমার কাছে বলেছেন। তিনি আমাকে জানিয়েছেন, নারীরা নাকি গোয়েন্দা কাজে বেশি সহযোগিতা করতে পারে। বাবা বলেছেন, আপনি নাকি এ কাজে আমাকে ব্যবহার না করার জন্য তাকে কুরআন শরীফ হাতে তুলে দিয়ে শপথ করিয়েছেন। আমিও এমন কোনো কাজ করতে পারবো না যে ক্ষেত্রে আমার ইজ্জতের উপর আঘাত আসতে পারে। তবে এ কথাও ঠিক, শুধু আপনার বিবি হয়ে ঘরে বসে থাকাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার হয়ে আপনি সে কাজ করুন যা বাবা আপনাকে বলে গেছেন। তাতেই আমার আত্মা শান্তি পাবে।"

শুয়াইব আরমুগানী যারকার এ আবেদনের কোনো সান্ত্বনাদায়ক জবাব দিতে পারেনি।

* * *

সেদিন থেকেই ঘরের প্রতি আরমুগানীর আকর্ষণ বেড়ে যায়। সে এখন কাজের মধ্যে সময় বের করে ঘরের পথ ধরে। ঘরে কিছুক্ষণ যারকার সাথে কাটিয়ে আবার কাজে যায়। যারকা এখন আরমুগানীর স্ত্রী। কিন্তু আরমুগানী

তাকে স্ত্রী হিসেবে পেয়েও স্বস্তি পাচ্ছে না। বারবার সে যারকার দিকে এমনভাবে তাকায়, যেনো যারকাকে কেউ কোনো সময় তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার আশংকা আছে। আরমুগানীর সীমাহীন ভালোবাসার বিপরীত যারকাও তাঁর প্রতি আত্মোৎসর্গকৃত মনোভাব পোষণ করে, তার প্রেমে যারকা যে চরম সুখী তা অকপটে প্রকাশ করে। আর প্রতি রাতেই সে আরমুগানীকে প্ররোচনা দেয় ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণে আরমুগানী যেনো অবশ্যই তার বাবার কাজে সহযোগিতা করে। সুলতান মাহমূদের বিজয়ের জন্য অবশ্যই আরমুগানী যেনো কিছু একটা ভূমিকা রাখে। সেই সাথে যারকা আরমুগানীর প্রতি সীমাহীন বিশ্বস্ততার প্রকাশ ঘটাতে থাকে। সুলতান মাহমূদের সাফল্যের চিন্তায় সে বারবার আবেগে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। যেনো সুলতান মাহমূদের অমঙ্গল হলে সে মরেই যাবে।

* * *

বিয়ে পরবর্তী উষ্ণতা, আবেগ ও পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসার মুগ্ধতার মধ্যে কিভাবে কেটে গেলো দশ-বারো দিন তা আরমুগানী টেরই পায়নি। দশ-বারো দিন পর এক রাতের প্রায় দ্বিপ্রহর। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর ভালোবাসার উষ্ণতায় পরিতৃপ্ত। যেনো উভয়ের শরীর বেয়ে প্রেম গলে গলে পড়ছে। রাত বাড়ছে। দিনভর ক্লান্তিকর শ্রমের কারণে আরমুগানীর দু'চোখ বুজে আসছে। যারকা আরমুগানীর গলায় নিজেকে জড়িয়ে বলে, "আপনার শরীরের উষ্ণতা, আপনার ভালোবাসা, আপনার সৌন্দর্য আমাকে যেনো বেহেশ্‌তে পৌঁছে দিয়েছে। সত্যিই আমার মনে হয় জান্নাত এর চেয়ে মোটেও বেশি সুখের নয়। কিন্তু এতো ভালোভাসা, এতো প্রেম, এতো সুখের মধ্যেও আমার চোখে যখন দীনের জন্যে শাহাদাতবরণকারী যোদ্ধাদের ছবি ভেসে ওঠে, তখন আমার মনটা বিষিয়ে ওঠে। মনে হয় শহীদদের আত্মাগুলো আমার এই সুখানন্দে অভিশাপ দিচ্ছে। আমার কানে যেনো ধ্বনিত হয় শহীদদের কণ্ঠ, তুমি প্রেম ভালোবাসায় ডুবে আছো! আমাদের আত্মার শান্তি আর আত্মত্যাগকে সফল করার পরিবর্তে অলস সময় কাটাচ্ছো!"

আরমুগানীকে দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলে, "প্রিয়তম! তুমি আমার আত্মার এই আকুতিটুকু মেরে ফেলো। যাতে আমি শুধু একটা সুন্দরী পুতুলে পরিণত হয়ে যাই। নয়তো আমার কাছে মনে হয় শহীদদের অসমাপ্ত মিশন যদি আমরা পূর্ণ করতে না পারি, তাহলে আমরা মুসলমান হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেয়ার অধিকার রাখি কি? এমন হলে ধর্মই ত্যাগ করা উচিত।"

এমনিতেই যারকার আত্মনিবেদন, কথার জাদুমালা আর রূপ-সৌন্দর্যে আরমুগানীর মধ্যে জন্ম নেয় ভাবালুতা। আবেগে তার মনের গোপন বাঁধ ছিঁড়ে যাওয়ার দশা। এর মধ্যে যারকার এই কাব্যিক কথামালা আর হৃদয় গলানো নিবেদন তাকে আরো বেশি উদ্বেলিত করে তোলে। যারকার ভালোবাসা আরমুগানীর বোধজ্ঞান কর্তব্য ও অঙ্গীকারকে পরাভূত করে ফেলে। ফলে দীর্ঘদিন ধরে অন্তরের গোপন কুঠরীতে পুষে রাখা রহস্যের দেয়াল ভেঙ্গে ফেলে আরমুগানী। সে বলে, "যারকা! আমি মসজিদে বসে হাতে কুরআন শরীফ নিয়ে শপথ করে বলেছিলাম, জীবন দোবো কিন্তু আমার বন্ধুদের কথা কারো কাছে প্রকাশ করবো না। কিন্তু আজ আমি নির্দ্বিধায় শপথ ভেঙ্গে দিচ্ছি এ কারণে যে, এখন আমার বিশ্বাস হয়েছে তুমি শুধু আমার বিবাহিতা স্ত্রীই নও, তুমি আমার সেইসব বন্ধু ও সহকর্মীদের মতোই বিশ্বস্ত, যারা পেশোয়ার থেকে এখানে আসার আগে কুরআন শরীফ নিয়ে নিজেদের আত্মপরিচয় গোপন রাখার শপথ নিয়েছিলো। যারকা, শোন! তোমাকে আমার গোপন ভেদ বলে দিচ্ছি। আমি গজনী সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা। যৌবনেই আমি গজনী সেনাবাহিনীতে গোয়েন্দা বিভাগে প্রশিক্ষণ নিয়েছি এবং প্রশিক্ষণের পর কর্তা ব্যক্তিরা আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। আমার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, যতো বেয়াড়া ঘোড়াই হোক না কেন আমার হাতে তাকে বশ মানতেই হবে। তাছাড়া আরো কিছু বৈশিষ্ট্য আমার রয়েছে। এখানে আসার পর আমার এই গুণের কথা জানতে পেরে রাজা আমাকে আস্তাবলের প্রধান নিয়োগ করেন।... সেই দায়িত্ব পালনে আমার ত্যাগের কথা চিন্তা করলে তুমি পেরেশান হয়ে যাবে যারকা। যৌবনের সব আকাঙ্ক্ষাগুলোকে কর্তব্য পালনের প্রয়োজনে গলাটিপে মেরে ফেলেছি। এখনো পর্যন্ত বিয়ে করিনি। বছরের পর বছর আমি সম্পূর্ণ একাকী কাটিয়েছি। তোমার মতো বহু সুন্দরী রূপসী আমাকে প্রেম নিবেদন করেছে। এমনকি রাজ কুমারীরাও আমাকে একান্তে পাওয়ার জন্য বহু লোভ দেখিয়েছে। প্রেমের আবেদন প্রত্যাখ্যান করায় আমাকে হত্যা করানোর ভয়ও দেখিয়েছি। তবুও নারীর ব্যাপারে আমি পাথর ছিলাম। লাহোর ও বাটান্ডায় গজনীর যতো গোয়েন্দা, সব আমার কমান্ডের অধীনে। যতোবার হিন্দুরা আমাদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান পরিচালনা করেছে, আমার সহকর্মীরা আগেভাগেই এ খবর সুলতানের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। যার ফলে সুলতান পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে হিন্দু সেনাদের ফাঁদে ফেলে কচুগাছের মতো কেটেছে।

যারকা! আমরা হলাম সেই চোখ, যে চোখ দিয়ে সুলতান গজনীতে বসেও এখানকার প্রকৃত পরিস্থিতি দেখতে পান। আমরা হলাম সেই কান, যে কানের

দ্বারা সুলতান গজনীতে থেকেও লাহোর থেকে কয়টি ঘোড়া তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে তাদের পায়ের আওয়াজ শুনতে পান। আমার সহকর্মীরা লাহোরে হিন্দু বাহিনীর রসদপত্র জ্বালিয়ে দেয়ার মতো দুঃসাহসী কাজও সাফল্যের সাথে সম্পাদন করেছে। এখন রাজা আনন্দ পাল পুনর্বার সুলতানের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমরা আবারও তাদের রসদপত্রে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা চালাবো, যাতে সুলতান যুদ্ধের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ পান।

যারকা! আমার পক্ষে একথা বলা সম্ভব নয়, আর কতদিন আমি তোমায় সঙ্গ দিতে পারবো। তুমি এমন একজন মানুষের সাথে নিজেকে জড়িয়েছো, যার মাথা জল্লাদের তরবারীর নীচে ঝুঁকানো। তোমার বাবাকে আমার এই গোপন পরিচয়ের কথা বলা সম্ভব ছিলো না। কারণ, তার পরিচয় আমার অজ্ঞাত।"

যারকা আরমুগানীকে বুকে জড়িয়ে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে বললো, "আপনি আমার হৃদয়কে আনন্দে ভরে দিয়েছেন। আপনার এই কর্তব্য পালনের কথা শুনে আমার দারুণ সুখ লাগছে। আমি ভীষণ গর্ব অনুভব করছি। আমি আপনার সাথে এ মর্মে অঙ্গীকার করছি, আমাকে আপনি যে কোন কঠিন কাজেই ব্যবহার করুন না কেন। আমি ঠিকই সাফল্যের সাথে সেই কাজ সম্পাদন করতে পারবো। আমাকে যদি আপনি কোনো জায়গায় আগুন লাগাতে বলেন কিংবা আগুনে ঝাঁপ দিতে বলেন, তাতেও আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবো না।"

"আমি নিজের প্রাণ বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু তোমাকে কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে দেবো না। আমি যদি গ্রেফতার হওয়ার আশংকা বোধ করি কিংবা আমার জীবনহানীর আশংকা সৃষ্টি হয়, তবে বহু আগেই আমি তোমাকে বলে দেবো, আমার অবর্তমানে তোমাকে কোথায় আশ্রয় নিতে হবে।"

"আপনার দু'একজন সহকর্মীর নাম-ঠিকানা আমাকে বলুন। আপনার ঘরে ফিরতে দেরি হলে বা কয়েক দিন বাড়ি ফেরার সুযোগ না পেলে আমি যাতে আপনার খোঁজ-খবর তাদের কাছ থেকে নিতে পারি।"

"না যারকা! আমরা নিজের মায়ের কাছেও বন্ধুদের পরিচয় প্রকাশ করি না। আমার অবর্তমানে যদি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে, তাহলে আমার সহকর্মীরাই এসে তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে। তাদের সাথে এমন কোনো চিহ্ন থাকবে, যা দেখে তুমি নিশ্চিত হতে পারবে যে, তোমার সাথে তারা কোনো ধরনের ধোঁকাবাজি করছে না।"

যারকা যখন আরমুগানীর দু'একজন সহকর্মীর নাম-ঠিকানা জানার জন্য কয়েকবার বিগলিত আবেদন জানালো, তখন এক পর্যায়ে রাগে-ক্ষোভে চোখ

লাল করে আরমুগানী বললো, "যারকা! এ কথা তোমার মুখে যেনো আর কোনদিন উচ্চারিত না হয়। মনে রাখবে, এ ব্যাপারে আমি তোমার ভালোবাসাকেও ত্যাগ করতে পারবো।"

* * *

আরো কিছুদিন এভাবেই কেটে যায়। যারকা আরমুগানীর ঘরণী হয়ে দৃশ্যত চরম সুখানুভব প্রকাশ করলেও ভেতরে ভেতরে কঠিন হয়ে ওঠে। ততদিনে আরমুগানী যারকার কাছে নিজের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করে দিয়েছে। আরমুগানীর প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পাওয়ার পর যারকা তার প্রতি প্রকাশ্যে আরো বেশি পতিগতপ্রাণ স্ত্রীর মতো আচরণ করতে শুরু করে। এক রাতে দীর্ঘ সময় আরমুগানী ও যারকা নিজেদের মধ্যে প্রেম-ভালবাসা ও আদর-সোহাগে কাটিয়ে দেয়। আরমুগানী দিনের বেলায় আস্তাবলে নতুন কিছুসংখ্যক আনীত ঘোড়াকে সামলানোর কাজে ব্যস্ত সময় কাটানোর ফলে দিনে ঘরে সময় দিতে পারেনি বলে মধ্যরাত পর্যন্ত যারকার সাথে খোশালাপ করে। এক পর্যায়ে সে ক্লান্তশ্রান্ত দেহে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে! কিন্তু যারকার চোখ নির্ঘুম।

ঘুমন্ত স্বামীকে কিছুক্ষণ জেগে জেগে নিরীক্ষণ করে যারকা। যারকা যখন দেখলো, আরমুগানী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তখন আস্তে করে বিছানা থেকে ওঠে সে সতর্ক পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থেকে পা টিপে টিপে দেউড়ির কাছে চলে আসে। দেউড়িতে এসে বাড়ির গেটে কান লাগিয়ে আবার উঠানে দাঁড়িয়ে কি যেন আন্দাজ করতে চেষ্টা করে। এরপর ঘরের ভেতরে গিয়ে আরমুগানীকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে। আরমুগানী তখন বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। সে নাক ডাকছে। আবার ঘর থেকে উঠানে এসে পা টিপে টিপে অস্থিরভাবে পায়চারী করছে যারকা। এমন সময় বিড়ালের ডাক শুনতে পায় যারকা। কিন্তু বিড়ালের ডাক কি ঘরের ছাদ থেকে এলো না সদর দরজার বাইরে থেকে এলো, ঠিক ঠাহর করতে পারলো না। সে পা টিপে টিপে সদর দরজার কাছে যায়। সদর দরজার খিল খুলে সে দরজা একটু ফাঁক করে বাইরে তাকালে দেখে তিনজন লোক দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। এদের একজন এগিয়ে এসে কানে কানে বলে, "ঘুমিয়ে পড়েছে।"

যারকা তাৎক্ষণিক কোন জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ নীরব দাঁড়িয়ে থেকে অতি ক্ষীণকণ্ঠে বললো, "একটু আগেও সজাগ ছিলো, এখন হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি তোমাদের জন্যে গেটের পাশেই অপেক্ষা করছিলাম। তোমরা এখানেই দাঁড়াও। যদি ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে আমি তোমাদের ডাকবো।"

গেটের খিল বন্ধ করে দিয়ে দ্রুত পায়ে ঘরে প্রবেশ করে যারকা। হঠাৎ সে আরমুগানীকে মাথা ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে জাগিয়ে দেয়। গভীর ঘুম থেকে ধড়ফড় করে জেগে উঠে আরমুগানী। চোখ মেলে প্রদীপের আলোয় যারকার চেহারা দেখে ভড়কে যায়। "কি ব্যাপার, তোমার কি হয়েছে যারকা?"

আরমুগানীর মুখে আঙ্গুল দিয়ে যারকা ফিস ফিস করে বলে, "বেশি কথা বলার সময় নেই আরমুগানী।" দ্রুত কথা বলতে শুরু করলো যারকা। "আরমুগানী! এ মুহূর্তে তুমি এখান থেকে পালিয়ে যাও। আমি তোমাকে ধোঁকা দিয়েছি। আমার বাবা তোমাকে ফাঁসানোর জন্য আমাকে প্রতারণার ফাঁদ হিসেবে ব্যবহার করেছে। আমার বাবা আসলে কোন ব্যবসায়ী নন, তিনি আনন্দ পালের পোষা এক গোয়েন্দা। আমরা পেশোয়ার নয়, বাটান্ডা থেকে এসেছি। তোমার ব্যাপারে রাজপ্রাসাদের একজন সংশয় প্রকাশ করেছিলো যে, তুমি গজনী সুলতানের পক্ষে গোয়েন্দা কাজে নিয়োজিত। কিন্তু এই দাবীর পক্ষে এ পর্যন্ত কেউ কোন প্রমাণ হাজির করতে পারেনি। এই দায়িত্ব অবশেষে আমার বাবার কাঁধে অর্পণ করা হয়– তুমি গোয়েন্দা কিনা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে এবং তুমি গোয়েন্দা হয়ে থাকলে তোমার সাথে আর কে কে রয়েছে তা জানতে। দায়িত্ব নিয়ে বাটান্ডা থেকে সে প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাকে এখানে নিয়ে আসে এবং নিজেকে একজন সুলতান ভক্ত ব্যবসায়ী হিসেবে তোমার কাছে পরিচয় দেয়। সে নিজে তোমার প্রকৃত পরিচয় জানার বহু চেষ্টা করেছে কিন্তু তোমার প্রকৃত পরিচয় জানা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। বাধ্য হয়ে তার কর্তব্য পালনের হাতিয়ার হিসেবে সে আমাকে তোমার কাছে বিয়ে দেয়। অবশ্য আমার রূপ-সৌন্দর্যে তুমি অনেকটাই প্রভাবিত হয়েছিলে বটে, কিন্তু তোমার প্রকৃত পরিচয় উদ্ধার করা ছিলো আমার দায়িত্ব। কোনো পুরুষই নারীর প্রতি দুর্বলতাকে অস্বীকার করতে পারে না। তদুপরি তোমার কাছ থেকে প্রেম-ভালোবাসা ও চরম অনুগত স্ত্রীর অভিনয় করে তথ্য উদ্ধার করার সফলতা ছিলো আমার একান্ত কাম্য। আমার কাজে আমি শতভাগ সাফল্য পেয়েছি।"

যারকার কথা শুনে আরমুগানীর পিলে চমকে যায়। সে মন্ত্রমুগ্ধের মতো যারকার কথা শুনতে থাকে। যারকা দ্রুত বলে চললো, "তুমি কাজে চলে যাওয়ার ফাঁকে এক মহিলা আমার কাছে আসতো, আমি তোমার কাছ থেকে কতটুকু রহস্য উদ্ধার করতে পেরেছি, প্রতিদিন সে এ রিপোর্ট নিয়ে যেতো। একদিন আমি সেই মহিলাকে বললাম, লোকটি গজনী বাহিনীর একজন ভয়ংকর গোয়েন্দা। সে লাহোর বাটান্ডায় নিয়োজিত গোয়েন্দাদের কমান্ডার। এ কথা শুনে আমাকে তোমার সহকর্মীদের পরিচয় জানার নির্দেশ দেয়। কিন্তু তুমি আমার

একান্ত চেষ্টার পরও সহকর্মীদের পরিচয় দিতে অস্বীকৃতি জানালে। আমি আমার বাবাকে খবর পাঠালাম, এ লোকের কাছ থেকে তার সহকর্মীদের পরিচয় জানা সম্ভব নয়। এ কথা শুনে আমাকে খবর পাঠালো, আজ রাতে যেন আমি জেগে থাকি। বাইরে বিড়াল ডাকার মিউ মিউ শব্দ শুনতে পেলে আমি যেন দরজা খুলে দিই। তিনজন সশস্ত্র লোক আসবে। এদের মধ্যে আমার বাবাও থাকবে। তারা তোমাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে। তারপর এরা তোমার কাছ থেকে বাকি তথ্য উদ্ধার করার জন্য তোমাকে অবর্ণনীয় শাস্তি দেবে। আরমুগানী! আমার একটি অনুরোধ তুমি রাখো। এর বেশি আর তুমি আমার কাছ থেকে জানতে চেয়ো না। ওরা এসে গেছে। বাইরে অপেক্ষা করছে।"

"তাহলে তুমি দরজা খুলে দিচ্ছো না কেন?" এক লাফে একথা বলে বিছানা থেকে ওঠে দাঁড়ালো আরমুগানী। তার কক্ষে রাখা বর্শা হাতে নিয়ে বলে, "দূর হো বদকার, বেশ্যা কোথাকার! তোর ঘাতক তিনজনকে নিয়ে আয়, নয়তো আমিই দরজা খুলে দিচ্ছি। দেখবি, কিভাবে তিনজনকে বধ করে তোর শিকার বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়।"

আরমুগানীকে জড়িয়ে ধরে যারকা। বলে, "আরমুগানী! তোমার পায়ে পড়ি, আমার কথা একটু শোনো। আল্লাহর দোহাই লাগে তুমি বাইরে যেও না।"

এদিকে তিন ঘাতক বাইরে দাঁড়িয়ে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে। একজন বললো, "এতোক্ষণে তো দরজা খুলে দেয়ার কথা।"

"কি জানি, ছুড়কি না আবার আমাদের ধোঁকা দেয়। ও ভেতর থেকে দরজা আটকিয়ে গেলো কেন?" বললো অপর একজন।

"হু, মনে হয় তোমার মেয়ে ওর দাসীতে পরিণত হয়েছে।" যারকার বাবার উদ্দেশ্যে উষ্মা প্রকাশ করলো অপর এক ঘাতক। "তুমি তো খুব চালাক। কিন্তু অনেক সময় অতি চালাক লোকও বেকুব হয়ে যায়।"

"আরে বক বক করো না তো! আরেকটু সময় অপেক্ষা করেই দেখো না কি হয়।" কিছুটা ধমকের স্বরে বললো যারকার বাবা।

* * *

যারকা শুয়াইব আরমুগানীকে আরো বলে, "তোমার প্রকৃত পরিচয় উদ্ধার করে দেয়ার দায়িত্ব আমি কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম। সেই দায়িত্ব আমি ষোল আনা আদায় করেছি। আমি বাবাকে তোমার প্রকৃত পরিচয় বলে দিয়েছি। আমি ধোঁকা ও প্রতারণার যে পুতুল সেজে তোমার ঘরে প্রবেশ করেছিলাম, কিন্তু তোমার

আকর্ষণীয় পৌরুষ, তোমার ব্যক্তিত্ব আর ইসলামী সালতানাতের প্রতি তোমার শুভ কামনা এবং তোমার উন্নত নৈতিকতার জিঞ্জিরে আমি আটকা পড়ে গেছি। তোমার প্রতারণামূলক কাজের প্রয়োজনে তোমার কাছে আমাকে বিয়ে দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু তোমার অকৃত্রিম স্নেহ-ভালোবাসা আমাকে সারা জীবন তোমার দাসী হয়ে থাকার জন্যে বিবেকে তাড়না সৃষ্টি হয়েছে। আমি কোনো ভদ্র ঘরের মেয়ে নই। এ পর্যন্ত যারাই আমার সঙ্গ দিয়েছে, সবাই আমার শরীর নিয়ে উল্লাস করেছে। একমাত্র তুমি আমাকে হৃদয়ের সীমাহীন ভালোবাসা দিয়ে সিক্ত করেছো। আমাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছো বলেই আমার নিকট তোমার প্রকৃত পরিচয় জানাতে দ্বিধা করোনি। তুমি নিজের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আমার প্রতি তোমার অকৃত্রিম ভালোবাসার প্রমাণ দিয়েছো। এর ফলে আমার হৃদয়ে মরে যাওয়া ইসলামী চেতনা পুনরুজ্জীবন লাভ করেছে।

বাবার নির্দেশ আমি এ জন্যে মানতে বাধ্য হয়েছিলাম যে, ছোট বেলায় আমার মা মারা গেছে। বাবা আমাকে মায়ের আদর দিয়ে বড় করেছে। সে কোনো দিন আমাকে মায়ের অভাব বুঝতে দেয়নি। বাবার ধন-রত্নের কোনো অভাব ছিলো না। সে আমাকে শাহজাদীর মতো আরাম-আয়েশে বড় করেছে। আমি বড় হলে তার ন্যায়-অন্যায় প্রতিটি নির্দেশ অতি-আনুগত্যের সাথে পালন করেছি। বাবা আমাকে ব্যবহার করে হিন্দু ক্ষমতাশীলদের হাত করেছে এবং তাদের মাধ্যমে রাজার বিশ্বস্ততা অর্জন করেছে। সে তার ঈমান বিক্রি করে প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জন করেছে। সে মুসলমান হয়েও হিন্দুদের হাতে মুসলমানদের অপমা ও লাঞ্ছিত করেছে। এ সবকেই আমি 'জীবন' ভেবেছিলাম। কিন্তু তুমি আমার সামনে যে নতুন জগতের দরজা খুলে দিয়েছো, সে জগত সম্পর্কে আমি মোটেও পরিচিত ছিলাম না। আমি জানতাম না, স্বামীর ভালোবাসাই যে নারীর জাগতিক জান্নাত।

আমি বাবার হক আদায় করেছি। দরজা খুলে ওদের আসা নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত আমার ইচ্ছা ছিলো তোমাকে ধরিয়ে দেবো। কিন্তু যখন ওদের দিকে তাকালাম, ওদের চেহারা দেখে মনে হলো ওরা যেনো আমাকে চিড়ে আমারই কলজেটা বের করে নিতে এসেছে। আমার হৃদয়ে একটা কাঁপুনী অনুভব করলাম। আমার বাবার চেয়ে তখন তোমাকেই বেশি আপন মনে হতে লাগলো। বাবার কাছে আমি একটা পণ্য মাত্র। কিন্তু তোমার হৃদয়ে আমি এক নিঃসীম সুখের আধার। এ জন্য আমি তাদের কাছে মিথ্যা বলেছি। বলেছি, ও এখনো ঘুমোয়নি। একটু অপেক্ষা করো, ঘুমিয়ে পড়লেই তোমাদের ডাকবো। ওরা

বাইরে তোমাকে গ্রেফতার করার জন্য অপেক্ষা করছে। আরমুগানী! তোমার ভালোবাসা, ধর্মের প্রতি তোমার নিষ্ঠা এবং তোমার কর্তব্যপরায়ণতার কসম! তুমি পালিয়ে যাও। দেয়াল টপকে পেছন দিক দিয়ে পালিয়ে যাও। হয়তো তোমার সাথে আবারও দেখা হবে। যদি জীবিত থাকি তবে দেখা হবেই। তুমি যেখানেই থাকো না কেনো আমি তোমাকে খুঁজে বের করবোই।"

ওদিকে অপেক্ষমান তিন ঘাতক দরজা খুলতে বিলম্ব হওয়ায় অস্থির হয়ে পড়ে। তাদের একজন বলে, "আমি ঘরের পেছনের দিকে যাচ্ছি। আমার মনে হয় ওরা পেছন দিক দিয়ে পালিয়ে গেছে।"

রাজার গোয়েন্দা দলের একজন যখন ঘরের ছাদের উপর ওঠে, তখন আরমুগানী ছাদ থেকে দেয়াল টপকে নীচে নেমে গেছে। কারো উপরে ওঠার শব্দ শুনে সে দেয়াল ঘেঁষে একটু অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে যায়। লোকটি ছাদের উপর থেকে আরমুগানীর উদ্দেশে হুমকি দিলে আরমুগানী এক লাফে বাউন্ডারির দেয়াল টপকে দৌড় দেয়। তাকে দৌড়াতে দেখে রাজার লোকেরা হৈচৈ শুরু করে দেয় কিন্তু ততোক্ষণে আরমুগানী কয়েকটি গলি পেরিয়ে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে। এরপরও তিন ঘাতক তার পিছু ছুটতে থাকে। আরমুগানী পেছনে তাদের আসতে দেখে দৌড়ের গতি আরো বাড়িয়ে দেয়। রাতের অন্ধকার তার পথ চলা এবং নিজেকে আড়াল করার জন্য সহায়ক হয়।

এক পর্যায়ে শহরের অলিগলি পেরিয়ে সে অনেকটা ফাঁকা জায়গায় চলে এসেছে। এখানটায় বাড়িঘর কম। এখানে একটি হাভেলী দেখতে পায় যার চারপাশটা দেয়াল ঘেরা এবং দেয়ালের পাশে ঝোঁপ-ঝাড়ের মতো বাগান। সে দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ একটা ঝোঁপের কাছে এসে বসে পড়ে এবং উঁকিঝুকি করতে থাকে। আরমুগানী হামাগুড়ি দিয়ে দেয়ালের ফটক পর্যন্ত এসে ত্বরিৎ ফটকের ফাঁক দিয়ে দেয়ালের ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং ফটকের বিপরীত দিকে চলে যায়। সে তখনও দাঁড়ায়নি। হামাগুড়ি দিয়েই এগুচ্ছিলো।

পেছনে দৌড়াতে থাকা ঘাতকরা ফটকের কাছে এসে আরমুগানীকে খুঁজতে থাকলে ফটকের প্রহরী তাদের বললো, "এখানে কাউকে খুঁজছো? এখানে কেউ আসেনি।" রাজার লোকেরা যখন জোর দিয়ে বললো, "আমরা তো দেখলাম একটা চোর এদিকেই এসেছে।" প্রহরী তাদের কড়া ভাষায় বলে দেয়, "না, এখানে কোনো লোক আসেনি। এটা একজন সম্মানি লোকের বসতবাড়ি। এখানে চোর প্রবেশ করবে কিভাবে!"

রাজার লোকেরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।

কিছুক্ষণ পর আরমুগানী দাঁড়িয়ে দেখে, হাভেলীর একটি কক্ষে প্রদীপ জ্বলছে। সে বুঝতে পারে, এখানে অপেক্ষা করা ঠিক নয়। কিন্তু পাশাপাশি এটাও ভাবলো, তার পিছু নেয়া ঘাতকরা এখনও হাভেলীর আশপাশে তাকে খুঁজতে পারে। এ ভাবনায় সে ঠাঁয় বসে থাকে।

আরমুগানী এই হাভেলী সম্পর্কে জানতো কিন্তু কখনো এখানে আসার সুযোগ হয়নি। এটা ছিলো রাজা আনন্দ পালের একান্ত নর্তকী ও গায়িকার হাভেলী। প্রকৃতপক্ষে এই গায়িকা ছিলো মুসলমান। কিন্তু নিজেকে সে বাঁদিনী বলে পরিচয় দিতো। পেশাগত যোগ্যতা ও দৈহিক সৌন্দর্যে সে ছিলো অনন্যা। সামুরাতি নামেই পরিচয় দিতো নর্তকী। সামুরাতি নিজের যোগ্যতা ও মান সম্পর্কে ছিলো পূর্ণ সচেতন। সে রাজা আনন্দ পালের কাছ থেকে এ দাবী আদায় করে নিয়েছিলো যে, সে রাজ প্রাসাদের ভেতরে বসবাস করবে না। সামুরাতির আবেদনে রাজার টাকায় নির্মিত এই হাভেলীটি ছিলো যথার্থ অর্থেই রাজকীয়। হাভেলীর চারপাশে ছিলো সাজানো মনোরম বাগান। অসংখ্য বাহারী গাছ-গাছালি আর ফুল-ফলের সমাহার। প্রতি রাতের মামুলী নাচের অনুষ্ঠানে নাচ-গান করতো না সামুরাতি। রাজপ্রাসাদে যদি বিশেষ কোন অতিথি আসতো তখন নাচ-গান পরিবেশনের জন্য ডাক পড়তো সামুরাতির। সামুরাতি সাধারণ কোনো নর্তকী নয়, সে একটা উড়ন্ত প্রজাপতি। কারো পক্ষে সামুরাতিকে স্পর্শ করাও অসম্ভব।

সে রাতে যখন আরমুগানী তার হাভেলীতে প্রবেশ করে, এর কিছুক্ষণ আগেই রাজমহল থেকে ফিরেছিলো সামুরাতি। কারণ, এ রাতে অন্য কোনো রাজ্যের রাজার আগমনে রাজপ্রাসাদে বিশেষ নাচ-গানের অনুষ্ঠান ছিলো। সে রাজপ্রাসাদ থেকে ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সাজ-পোশাক খুলছিলো। সামুরাতির যথেষ্ট বয়স হয়েছে। যৌবন তাকে বিদায় জানাতে চাচ্ছে। সে তার বৃদ্ধা সেবিকার উদ্দেশে বলে, "আজ খুব ক্লান্ত হয়ে গেছি খালাম্মা।"

"নর্তকীরা যখন ক্লান্তি অনুভব করে, তখন তার উচিত বিয়ে করে ফেলা।" সামুরাতির উদ্দেশে বলে বৃদ্ধা সেবিকা। "কিন্তু বাস্তবতা হলো, নর্তকী ও গায়িকারা মনে করে তাদের কণ্ঠ আর রূপ-জৌলুস আজীবন অম্লান থাকবে আর তাদের উপর মানুষ সবসময় ফুল-চন্দন ছিটাবে।"

"আরে আমি তো এখনও যুবতী।" মুচকি হেসে সেবিকার উদ্দেশে বলে সামুরাতি।

“আমিও তোমার মতোই ভাবতাম। তুমি তো জানো, আমিও তোমার মতোই রাজমহলের নর্তকী ছিলাম। এখন তুমি যেমন সুখ্যাতি পেয়েছো, আমার সময়ে আমিও ছিলাম এমন বিখ্যাত। তুমি যেমন কাউকে পাত্তা দাও না, আমিও তখন বড় বড় মহারাজকেও পাত্তা দিতাম না। তখন আমার পেশায় যেসব প্রবীণ মহিলা ছিলো, তারা আমাকে বিয়ে করার কথা বলতো। আমিও তখন তোমার মতোই বলতাম, আরে এখনই বিয়ে কিসের? আমি তো এখনও যুবতী মাত্র। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, আজ আমি তোমার সেবিকা। প্রবীণদের কথা না মেনে আমি যখন অনেক বয়সে বিয়ে করার জন্য প্রস্তুতি নিলাম, তখন আমার শরীর ভেঙ্গে গেছে। যৌবনে আমার ঘরের আঙ্গিনায় আমার সাথে ভাব জমানোর জন্য যারা সারাক্ষণ ঘুর ঘুর করতো, তারা আমার বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কোনো বুড়োও আমাকে বিয়ে রাজি হলো না।”

সেবিকার কথায় ছিলো রূঢ় বাস্তবতা। সামুরাতিও অনুভব করে, তার শরীর অনেকটাই ভেঙ্গে পড়েছে। সেবিকা তার চোখে আঙ্গুল দিয়ে বাস্তবতাকে এভাবে দেখিয়ে দিলো যে, সামুরাতির আত্মমগ্নতা উবে গিয়ে তার মনের মধ্যে উঁকি দেয় উদ্বিগ্নতা।

এমন সময় হাভেলীর বাইরে কুকুর ডাকার শব্দ শোনা গেলো। সেই সাথে এমন শব্দ শোনা যায়, যাতে মনে হয় কুকুর কারো উপর হামলে পড়েছে এবং ক্ষতবিক্ষত করছে। সামুরাতি হাভেলী পাহারার জন্য কুকুর পালতো। রাতের বেলায় যে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত আগন্তুকের প্রবেশ থেকে হাভেলীকে রক্ষার জন্য কুকুর হাভেলীর বাগানে ছেড়ে দিতো। কুকুরটি ছিলো খুবই ভয়ংকর আর শক্তিশালী। কুকুরের আগ্রাসী ডাক শুনেই সামুরাতি বুঝতে পারে, নিশ্চয়ই সে কারো উপর হামলা চালিয়েছে। তাই সে দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়। সে দেখতে পায়, কুকুর একজনকে কামড়ে ধরে হেচড়াচ্ছে। সে দৌড়ে গিয়ে কুকুরটাকে ধরলে কুকুর রাগে সামুরাতির হাতেও কামড় দেয়।

“কে তুমি?” আক্রান্তকে জিজ্ঞেস করে সামুরাতি। “চুরিটুরি করতে এসেছিলে নাকি?”

“দেখো, চোর কিংবা ডাকাত হলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতাম না। আমার নাম শুয়াইব আরমুগানী।”

“আরে, তুমি কি আস্তাবলের প্রশিক্ষক না?”

“হ্যাঁ, সামুরাতিজী। তুমি ঠিকই বলেছো।”

"তো এখানে তুমি কি নিতে এসেছিলে? ঘরে চলো। তুমি তো জানো, যদি পালাতে চাও, তাহলে তোমার অবস্থা কত কঠিন হবে?"

ঘরের আলোয় গেলে আরমুগানী বুঝতে পারে, কুকুর কামড়ে তার শরীরের সব কাপড়-চোপড় ছিঁড়ে ফেলেছে। তার উভয় বাহু ও পা থেকে রক্ত ঝরছে। কুকুর তার শরীর ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছে। তার এক পা থেকে অনেকটা গোশত খাবলে নিয়েছে।

"এ কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না, তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে এখান থেকে কিছু নিতে এসেছিলো।" বললো সামুরাতি। "আমার মনে হয়, যারা আমাকে একান্তে পেতে চায় তুমিও সেই দলের একজন। লোভই তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। তুমি হয়তো বুঝেছো, আমি একাকী এখানে থাকি। জানো, আমার কুকুর আমার হাভেলীর চার দেয়ালের ভেতরে কোন বাঘকেও একদণ্ড দাঁড়াতে দেয় না।"

সামুরাতি তার বৃদ্ধা পরিচারিকাকে বললো, "ওর সারা শরীর কুকুর ক্ষতবিক্ষত করে ফেলেছে। ওর ক্ষতস্থান ধোঁয়ার জন্য পানি গরম করো এবং পরিষ্কার কাপড় নিয়ে এসো, সেই সাথে শরাবও এনো। শরাব এবং কাপড় ভস্ম ক্ষতস্থান তাড়াতাড়ি শুকাতে সাহায্য করে।"

পরিচারিকা চলে গেলে আরমুগানী সামুরাতিকে বলে, "তোমার বাগানে তোমার কুকুর আমাকে হামলা করেছে, তাই তুমি আমাকে চোর বলতেই পারো। সেই সাথে আমাকে চরিত্রহীনও বলতে পারো যে তুমি একা থাকো জেনে অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে এসেছি। শোনো সামুরাতি! যে রূপ-সৌন্দর্যের প্রতি তোমার এতোটা গর্ব আর অহংকার, যদি তুমি তোমার এই রূপ-জৌলুস আমার চোখে দেখো, তাহলে নিজের প্রতিই তোমার ঘৃণা আসবে।"

"ও, তাহলে কি তুমি আমাকে ঘৃণা করতে রাতের আঁধারে চোরের মতো আমার বাড়িতে এসেছো?"

"শোনো, যে তোমাকে ভালোবাসে আর আমি যাকে ভালোবাসি তাকে যদি তুমি একবার দেখো, তাহলে আয়নায় নিজের চেহারা দেখাই তুমি ছেড়ে দেবে। আমি রাতের আঁধারে তোমার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে তোমার রূপ-সৌন্দর্য ভোগ করতে এসেছি এই অহংকার অন্তর থেকে বের করে দাও। তুমি তো আর রাজা আনন্দ পালের রাজকুমারীদের চেয়ে বেশি রূপসী নও। আমি তাদেরও প্রত্যাখ্যান করেছি।"

"হু, তাহলে এখানে কেন মরতে এসেছিলে?"

সামুরাতির এক হাতেও কুকুর কামড়ে দিয়েছিলো। সামুরাতির ক্ষতস্থান থেকে বিছানার উপর দু'তিন ফোঁটা রক্ত টপ টপ পড়লো। আরমুগানী সামুরাতির সামনে দাঁড়ানো। তার ক্ষতস্থান থেকে অনবরত রক্ত ঝরছিলো। আরমুগানী দেখলো, সামুরাতির রক্ত আরমুগানীর রক্তের সাথে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

"দেখো, তোমার রক্ত আর আমার রক্ত একসাথে মিশে কেমন উজ্জ্বল রঙ ধারণ করেছে। অথচ তোমার রক্ত কিন্তু এতোটা উজ্জ্বল ছিলো না। তুমি অব্যাহত অপরাধ আর গুনাহ্ করতে করতে নিজের রক্তকেও দূষিত করে ফেলেছো। তোমার রক্ত যখন দূষণমুক্ত রক্তের সাথে মিশেছে, তখন সে তার আসল বর্ণ ফিরে পেয়েছে। অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখছো নর্তকী। তোমাকে আমার সামুরাতি নামে ডাকতে ইচ্ছে করছে না। তোমার প্রকৃত নাম আমি জানি না বটে, কিন্তু একজন মুসলিম যুবতীকে হিন্দু নামে ডেকে মুসলমানের অবমাননা করতে আমার বিবেক সায় দেয় না। যাক, আমি যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। দেখো, তোমার আর আমার রক্ত একই ধারার। সেই সব পিতার রক্ত আমরা শরীরে বহন করছি, যারা অভিন্ন বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। এমনও হতে পারে, আমি এবং তুমি একই বংশজাত সন্তান।"

"আরে, তোমাকে তো পাগল মনে হচ্ছে। পাগলের মতো কি সব আবোল-তাবোল বকছো!"

"তুমি কি আমাকে চেনো, আমি কে? আমি তোমাকে তোমার রক্তের আসল পরিচয় বলে দিচ্ছি। নাচ-গান তোমার পেশা হতে পারে না। তোমার ধর্মে নাচ-গান বৈধ নয়। তোমার এই রূপ-জৌলুস, তোমার কণ্ঠ তোমার নিয়ন্ত্রিত জিনিস নয়। ভবিষ্যতে এ সবই তোমার কাছ থেকে বিদায় নেবে। আজ তুমি আমাকে বলছো, চোরের মতো আমি তোমার ঘরে হানা দিয়েছি। একদিন এমন আসবে, যখন তুমি আমার মতো কোনো চোর তোমার ঘরে হানা দিক এমন কামনায় অধীর হয়ে থাকবে। তখন রাতের বেলায় তোমার কুকুরকে বেঁধে রাখবে, যাতে কেউ তোমার ঘরে হানা দিতে পারে কিন্তু তোমার কুকুর ছাড়া আর কাউকে তুমি তোমার ঘরে দেখতে পাবে না। যাক, তুমি অন্তত একটা ভালো কাজ করো, আমাকে তোমার ঘরে আশ্রয় দাও।"

"কেন আশ্রয় চাচ্ছ তুমি? কি অপরাধ করে তুমি পালিয়েছো?"

"আমি তোমাকে একটি তরুণীর গল্প শোনাবো। সে বয়সে তরুণী, আর তোমার চেয়েও সুন্দরী। অটুট তার শরীর। পূর্ণিমার চাঁদের চেয়ে উজ্জ্বল তার

অবয়ব। সে এক দৃষ্টিতে তোমার চেয়েও বেশি গুনাহগার, কিন্তু একটি কাজের দ্বারাই সে জান্নাতের বাসিন্দা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। তুমিও অন্তত একটা পুণ্য কাজ করো। আমাকে আশ্রয় দাও... ।"

"তোমার পরিচারিকাকে এখানে আসতে দিও না। আমার ক্ষত আমি নিজেই পরিষ্কার করে নেবো। তাকে বলে দাও, আমি যে এখানে আছি, তা যেন কাউকে না জানায়।"

রাজপ্রাসাদ থেকে ঘরে ফিরে কাপড় বদলানোর সময়ও সামুরাতিকে তার বৃদ্ধা পরিচারিকাও এমন কিছু বাস্তব কথাই বলেছিলো। সেসব কথা তখনো তার মানসপটে উচ্চারিত হচ্ছিলো। এমতাবস্থায় এক সৌম্য কান্তি যুবক আহত অবস্থায় যে তার ঘরেই আশ্রয়প্রার্থী সেও তাকে বলছে, তার রূপ-সৌন্দর্যে এখন ভাটা পড়ে গেছে। এতে সামুরাতির মনের বোঝা আরো ভারী হয়ে যায়। সে পরিচারিকাকে এই বলে তার কক্ষ থেকে যেতে বলে, "আমার ঘরে যে অচেনা লোক প্রবেশ করেছে তা তুমি কাউকে বলবে না।"

সামুরাতি নিজ হাতে আরমুগানীর ক্ষতস্থানের রক্ত পরিষ্কার করলো। শরাব দিয়ে সব ক্ষতস্থান ধুয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলো। পায়ের আঘাত ছিলো খুবই মারাত্মক।

আরমুগানী সামুরাতির হাতের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে তাতে পট্টি বেঁধে দেয়। এর ফাঁকে আরমুগানী সামুরাতিকে যারকার ইতিবৃত্ত সবিস্তারে শোনায়। সামুরাতির কাছে আরমুগানী কোনো কথাই আর আড়াল করলো না এবং কোনো মিথ্যাও বললো না। সে সামুরাতিকে এ কথাও জানালো যে, সে সুলতান মাহমূদের হয়ে এখানে গোয়েন্দা কাজে জড়িত। সে দীর্ঘক্ষণ ইসলামের মর্যাদা ও হিন্দুদের ইসলাম বিদ্বেষের ব্যাপারে কথা বললো।

আরমুগানী বললো, "যারকাকে তার বাবা বিলাস-ব্যসনে অভ্যস্ত করে শাহজাদীতে পরিণত করেছিলো। আমাকে প্রতারিত করার ব্যাপারেও সে ছিলো সফল এবং নিপুণ দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে। কিন্তু আমার আন্তরিক ভালোবাসা ও প্রেম তার মধ্যে মরে যাওয়া ইসলামী চেতনা পুনরুজ্জীবিত করেছে। যার ফলে শেষ মুহূর্তে সে এমন কাজ করেছে যাতে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।"

"হয়েছে হয়েছে, আর বলতে হবে না। এখন আমার কথা শোনো। আজ রাতে কালাঞ্জারের রাজা এসেছে। এ জন্য রাজপ্রাসাদে আমার ডাক পড়েছিলো। রাজা আনন্দ পাল কালাঞ্জারের রাজাকে বলেছে, এই মেয়েটি মুসলমান এবং সে

আমার খুব প্রিয়পাত্র ও নর্তকী। তাতে কালাঞ্জারের রাজা বললো, আমি কোনো মুসলিম সুন্দরী তরুণী দেখলে ওকে অপহরণ করে নর্তকী বানাই, নয়তো বেশ্যাবৃত্তিতে লাগাই। মুসলিম বংশ নিপাত করতে এবং ওদের চরিত্র ধ্বংস করার এই একটিই যুৎসই পথ। আপনিও যদি এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে দেখতে পাবেন আপনার দেশে যেসব মুসলমান বসবাস করছে, এরা হয় নর্তকী নয়তো সব বেশ্যাবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়েছে।"

সামুরাতি যখন আরমুগানীকে রাজা কালাঞ্জারের কথা শোনায়, তখন আরমুগানীর চেহারা দুঃখে-অনুশোচনায় লাল হয়ে যায়। আরমুগানী সামুরাতির ভেতরকার মৃতপ্রায় জাতীয় চেতনায় নাড়া দেয়। সামুরাতি যখন তাকে রাজা আনন্দ পালের রাজপ্রাসাদের কথা বলে, তখন সে সামুরাতিকে আরো উজ্জীবনীমূলক কাহিনী শোনায়। সামুরাতির জ্বলন্ত প্রদীপে এসব কথা ছিলো তেল ঢালার মতো।

আরমুগানী বললো, "দেখো সামুরাতি! আজ আমি মুসলমান তরুণীদের সম্ভ্রম বিক্রির কারণে মৃত্যুর মুখোমুখি। অথচ গজনীর যেসব যোদ্ধা এখানে এসে যুদ্ধ করে শাতাদাতবরণ করেছেন, তারা মুসলমান নারীদের সম্ভ্রম রক্ষার্থে নিজেদের জীবন বিলীন করে দিয়েছেন। শোনো সামুরাতি! তোমরা হলে হিন্দুদের খেলনার পুতুল। তোমরা পুরনো হয়ে যাচ্ছো। খেলনা পুরনো হয়ে গেলে সেগুলো আর খেলার উপযুক্ত থাকে না, তা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তোমরাও চিরাচরিত নিয়মে একসময় আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। তাই যারকা হয়ে যাও, সামুরাতি! নিজ বিশ্বাসের সাথে আর বেঈমানী করো না।"

সামুরাতি এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি কখনো হয়নি। কঠিন-কঠোর রূঢ় কথা শুনতে সে অভ্যস্ত নয়। সে সাধারণত তার রূপ-সৌন্দর্য আর নিপুণ নাচ ও মনোহরী কণ্ঠের প্রশংসাই মানুষের নিকট থেকে শুনে থাকে। নিজেকে যে কেউ স্পর্শ না করতে পারা দেবী ভাবে সামুরাতি। যাকে সবাই ছুঁতে চায়, একান্তে পেতে প্রত্যাশী, আজ ঘরে ঢুকেই বৃদ্ধা পরিচারিকার মুখে শুনতে পেলো তার এই রূপ-রস, খ্যাতি ও জৌলুসে ভাটা শুরু হয়েছে, অচিরেই তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। এরপর আরমুগানী চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো যৌবনের রূপ-জৌলুস বেশি দিন থাকে না। ফুল সৌরভ হারিয়ে শুকিয়ে গেলে মানুষ যেমন তা আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেয়, কোনো ভ্রমর আর সেই ফুলে বসে না। তেমনি যৌবনের দীপ্তি নিভে গেলে কোনো পুরুষ আর তার প্রতি তাকিয়েও দেখবে না।

সামুরাতিকে আরমুগানী বললো, "তুমি নিজেই একটা ধোঁকা, আর যারা তোমার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে তারাও মারাত্মক ধোঁকাবাজ।"

"যারকাকে হয়তো আমি দেখেছি। যে মেয়েটির কথা বলছি সেই যদি যারকা হয়ে থাকে, তবে সে যে খুবই রূপসী তাতে সন্দেহ নেই। আচ্ছা আরমুগানী! তুমি তাকে খুব ভালোবাসো! একান্তে পেতে চাও!"

"আমার প্রাণ ওর জন্য ব্যাকুল সামুরাতি। এটা এমন এক টান, এমন এক আকর্ষণ, যে আকর্ষণের স্বাদ তুমি কখনো অনুভব করোনি।"

"আমি যদি তোমাকে আশ্রয় দেই তবে আমাকে কি সেই ভালোবাসা দেবে? বুঝতে পারছি না আমার হৃদয়ের মধ্যে যে কি তুফান শুরু হয়েছে! মনে হচ্ছে পৃথিবীটা দুলছে।"

"তুমি আমাকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করতে পারো। হৃদয়কে যদি তৃপ্ত করতে চাও, তাহলে তোমার হৃদয়ে এক বোনের মমতার ঢেউ তোলো, দেখবে আমার সান্নিধ্য তোমাকে স্নেহ-মমতার পরশে ভরে দেবে।"

"ঠিক আছে, তুমি আমার এখানেই থাকো।" কিন্তু কথা জড়িয়ে এলো সামুরাতির। আর কিছু বলতে পারলো না।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ আরমুগানীর দু'গাল দু'হাতে ধরে ওর চোখের দিকে তাকাতেই সামুরাতির দু'চোখ বেয়ে শ্রাবণের ধারার মতো অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। ধরাগলায় অস্পষ্ট ভাষায় বলে, "আর কখনো আমার সামনে তুমি যারকার নাম নেবে না। তুমি বলেছো, সে তোমার বোন নয় কিন্তু আমি এতেও প্রতারিত হওয়ার আশংকা করছি।" আরমুগানীর চেহারা থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে চোখের পানি মুছে সামুরাতি।

"রাজা-মহারাজা আর সম্রাটদের হৃদয়েও রাজত্ব করো তুমি। আমার মতো একজন সামান্য মানুষকে তোমার এতো ভয় কেনো?"

"আমি জানি না... আমি বলতে পারবো না কেনো তোমাকে আমার এতোটা ভয় করছে। কেনো অনতিক্রম্য মনে হচ্ছে তোমাকে। তুমি এখন আমার আশ্রয়ে, বলতে গেলে আমার অধিকারে।"

"কিন্তু না, আমি বলতে পারবো না।"

"হ্যাঁ, তুমি আর আমি অভিন্ন জাত। এই রক্ত দেখিয়ে তুমি আমার প্রকৃত পরিচয় জানিয়ে দিয়েছো। আমি এখন নিজের পরিচয় জেনে গেছি। তোমার পা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত কেউ এ ঘরে ঢুকবে না।"

* * *

পিছু ধাওয়াকারীরা শুয়াইব আরমুগানীকে ধরতে না পেরে হতাশ হয়ে ওর বাড়িতে ফিরে গেলো। শুয়াইব আরমুগানীব বাড়িতে গিয়ে দরজার কড়া নাড়াতেই যারকা দরজা খুলে দিলো। যারকার বাবা জিজ্ঞেস করলো, "ও বেরিয়ে গেলো কি করে?"

"ও জেগেই ছিলো, তোমরা বারবার বিড়ালের মতো ডাকছিলে। আমি তোমাদের থামাতে এলে সে টের পেয়ে যায়। লোকটি খুবই চালাক। সে আমাকে কিছু না বলে দৌড়ে গিয়ে ঘরের ছাদে উঠে। এ সময় আমি তোমাদের একজনের চিৎকার শুনে বুঝতে পারি ও পালিয়েছে। তোমরা বড্ড ভুল করেছো। তোমাদের ভুলের কারণে সে পালাতে পারলো। মিছেমিছি এতোদিন শুধু আমাকে ওর বউ বানিয়ে রাখলে। লাভটা কি হলো?"

শহর ও আশপাশের এলাকাজুড়ে শুয়াইব আরমুগানীর খোঁজাখুঁজি শুরু হয়। চার-পাঁচ দিন পর্যন্ত চললো তল্লাশি অভিযান। তল্লাশির সময় প্রতিটি মুসলমানের বাড়ির আস্তাবলের খড়কুটো পর্যন্ত ওলোট-পালট করা হলো। কিন্তু কোথাও আরমুগানীর চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া গেলো না।

এদিকে নগরকোটের বড় পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ খবর পায়, রাজা আনন্দ পাল রাজধানীতে ফিরে এসেছে। রাজার ফিরে আসার খবর পেয়ে পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ তাকে নগরকোট মন্দিরে ডেকে পাঠায়। পণ্ডিতের খবর পেয়ে সাথে সাথেই রাজা আনন্দ পাল তার একান্ত প্রহরীদের রওনার প্রস্তুতির নির্দেশ দেয়। হিন্দুস্তানের অন্যান্য রাজা-মহারাজার মতো রাজা আনন্দ পালও নগরকোট মন্দিরকে খুব সম্মান করতো এবং সেখানকার প্রধান পণ্ডিতের নির্দেশকে অবশ্য পালনীয় ভাবতো। এবার সে শুধু পণ্ডিতের নির্দেশ পালনের জন্যই পণ্ডিতের খবর পাওয়া মাত্র রওনার নির্দেশ দিলো না। তার উদ্দেশ্য ছিলো, পণ্ডিতের মাধ্যমে সে অন্যান্য রাজা-মহারাজার সহযোগিতা লাভে সমর্থ হবে। যেনো সে সুলতান মাহমূদের সাথে একটা চূড়ান্ত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়ার সামর্থ অর্জন করতে পারে। সে একজন যথার্থ মহারাজার মতো পূর্ণ শান-শওকতের সাথে রাজা আনন্দ পালের নগরকোট মন্দিরে পদার্পণ করে। তার সাথে রীতিমতো এক বিরাট কাফেলা। কাফেলায় তার একান্ত দেহরক্ষী বাহিনী ছাড়াও রয়েছে তার প্রিয় গায়িকা ও নর্তকী সামুরাতি। এ ছাড়াও রয়েছে কয়েকজন সেবিকা ও পরিচারিকা। সামুরাতি তার বৃদ্ধা পরিচারিকাকে ঘরে রেখে এসেছে এবং তাকে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়ে এসেছে, সে যেনো আরমুগানীকে গুপ্তধনের মতোই লোকচক্ষুর আড়ালে হেফাজতে রাখে। বিপুল লোক বহর নিয়ে রাজা আনন্দ পাল নগরকোট মন্দিরের

কাছে পাহাড়ের পাদদেশে এক সবুজ প্রান্তরে তাঁবু তুলে। টানা চার-পাঁচ দিন ভ্রমণের পর রাজা আনন্দ পাল নগরকোট পৌঁছে। সফরের ক্লান্তির কারণে নগরকোট পৌঁছেই রাজার মন্দিরে প্রবেশ করা সম্ভব হলো না।

পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের কাছে যখন রাজা আনন্দ পালের আগমন সংবাদ পৌঁছালো, তখন পণ্ডিত খবর পাঠালো, বিকেলে পণ্ডিত রাজাকে অভ্যর্থনার জন্য নিচে আসবে। পড়ন্ত বিকেলে পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ রাজাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য যখন নিচে নেমে এলো, তখন রাজা আনন্দ পাল তাঁবু থেকে বেরিয়ে পণ্ডিতের পা স্পর্শ করে তাতে চুমু দেয় এবং তাকে ভক্তি জানায়। রাজার তাঁবু দেখে পণ্ডিত তো হতবাক। তাঁবু তো নয়, যেনো কোনো এক রাজপ্রাসাদ। রাজার বিশাল তাঁবুতে রঙ-বেরঙের শামিয়ানা, সুদৃশ্য ঝালর আর চতুর্দিকে বাহারী ঝাড়বাতি। রাজার তাঁবুতে গালিচা বিছানো। পণ্ডিত রাজার কক্ষে বসার একটু পরই তাকে উদ্দেশ্য করে চার নর্তকী নাচ শুরু করে দেয়। নৃত্যগীতের মধ্যে পণ্ডিত রাজা আনন্দ পালের উদ্দেশ্যে বলে, "মনে হয় আপনি সেই আনন্দপাল নন, যে আনন্দ পাল নিজে আর তার পিতা একাধারে কয়েকবার সুলতান মাহমূদের কাছে পরাজিত হয়েছেন। আপনার কি মনে নেই, পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে আপনার বাবা আত্মাহুতি দিয়েছিলেন আর সম্মুখ সমরে শোচনীয়ভাবে পরাজয়বরণ করে আপনি দেশত্যাগ করেছিলেন? যদি আপনি সেই আনন্দ পালই হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার পরাজয়ের প্রধান কারণ এই বিলাসিতা। যে বিলাসিতা আপনি আমাকে খুশি করার জন্য প্রদর্শন করছেন। কারণ, আমি শুনেছি, আমাদের মহারাজারা নাকি যুদ্ধক্ষেত্রেও নাচ-গান ও আমোদ-ফূর্তির সকল আয়োজন সঙ্গে রাখেন।"

"পণ্ডিত মহারাজ! মৃত্যুর আগে আমরা মনের চাহিদা পূর্ণ করার জন্যে বিনোদনের উপকরণসমূহ সঙ্গে রাখি আর কি?"

"তা ঠিক। কিন্তু আপনি তো এখানে মরতে আসেননি। এখনও বেঁচে আছেন। আপনার এই বেঁচে থাকার লক্ষ্য কি বাকি জীবন বিলাসিতায় মেতে থাকা? আমি এ জন্যই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি যে, আপনার পরাজয়ের কারণগুলো আর কেউ বলার সাহস না পেলেও আমি বলে দেবো। রূপসীদের সৌন্দর্য আর শরীর নিয়ে যারা উল্লাসে মেতে থাকে, তাদের করুণ পরিণতি ছাড়া আর কি হতে পারে!"

পণ্ডিতের কথা শেষ না হতেই নর্তকী মেয়েগুলো এভাবে অদৃশ্য হয়ে গেলো, যেনো বাতাসে ওরা হারিয়ে গেছে। এরপর বাদ্যযন্ত্রের বাজনা বদলে যায়।

এবারের বাজনার ধ্বনি এমনই আকর্ষণীয় যে পণ্ডিত নিজেও হতচকিত হয়ে উঠলো। ঠিক এমন সময় তাঁবুর এক কোণা থেকে সামুরাতি এভাবে দৃশ্যপটে এলো যেনো একটি জলপরী পানি থেকে ভেসে ওঠেছে। সামুরাতি বিস্ময়কর এক নৃত্যের তালে তালে পণ্ডিতের একেবারে কাছে চলে আসে। তার ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি খেলা করছে। নৃত্যের ছন্দে এগিয়ে এসে পণ্ডিতের সামনে বাঁকিয়ে প্রণাম করে। রঙিন ফানুসের বাহারী আলোয় নর্তকী সামুরাতির নৃত্যে পণ্ডিত বিমোহিত হয়ে গেছে। সামুরাতির শরীর যখন নাচের নানা মুদ্রায় কখনো ফুটন্ত ফুলের মতো মেলে ধরলো এবং বাজনার উচ্চাঙ্গ তালে নিজেকে পাখির মতো বাতাসে ভাসিয়ে রাখলো, তখন পণ্ডিত রাজা আনন্দ পালকে জিজ্ঞেস করলো, "এ হিন্দু না মুসলমান?"

"মুসলমান।" জবাব দিলো রাজা আনন্দ পাল। "মুসলমান তরুণীদেরকেই এ পেশায় আমরা ব্যবহার করি। এই মেয়েটিকে যদি আমরা মন্দিরের নর্তকী হিসেবে রেখে দেই, তাতে আপনি রাজি হবেন তো?"

"এর পরিবর্তে আপনি চাইলে আমি একশ' নর্তকী দিয়ে দিতে পারি। এই মেয়েটি আমার খুবই প্রিয়।"

"হ্যাঁ, আমি আপনার কাছে এমন কথাই শুনতে চাচ্ছিলাম। আপনার বোঝা উচিত, এ মেয়েকে আমি নিজের সেবার জন্য নিতে চাচ্ছি না। আমি নর্তকী রাখবো কেন? আমি তো নারী স্পর্শও করি না। ওকে আমি কৃষ্ণ ভাগবানের চরণে বলীদান করবো।"

"বলি দেবেন!" চোখ কপালে তুলে জানতে চাইলো রাজা।

"হ্যাঁ, রাজা আনন্দ পাল। এটা আমার ব্যক্তিগত কোনো ইচ্ছা নয়। দেব-দেবীদের চাহিদা এটা। এই নর্তকীকে দেবতারা ভোগ করতে চায়।"

"আমরা তো ইতিমধ্যে লাহোরে দু'টি তরুণী বলী দিয়েছি।"

"তবুও আপনি দু'বারই পরাজিত হয়েছেন, তাই না। এর কারণ হলো, যেসব পণ্ডিতের হাতে আপনি কুমারীদের বলী দিয়েছেন, এসব পণ্ডিত আপনার দেয়া কুমারীদের সতীত্বহারা করে পাপ করেছে। আমাকে দেবী কৃষ্ণ স্বপ্ন দেখিয়েছেন, এমন কোনো মুসলিম তরুণীকে বলী দিতে হবে যে রূপে-গুণে অনন্যা। আর সে না হবে বয়স্কা, আর না হবে কিশোরী। নাচ-গানে সে হবে অনন্যা। সে যার কাছে থাকবে, তাকে সে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসবে। কোনো মূল্যেই এই মেয়েকে সে হারাতে সম্মত হবে না। বহুদিন থেকে আমি এমন একটি নর্তকী খুঁজছিলাম। আজ আপনার কাছে তা পাওয়া গেলো। আমি হিন্দু

ধর্মের বিজয় দেখতে চাই, আমি দেব-দেবীদের অভিশাপ থেকে আপনাদের রক্ষা করতে চাই।"

রাজা আনন্দ পালের পক্ষে নগরকোট মন্দিরের বড় পণ্ডিতের কথা অমান্য করা সম্ভব ছিলো না। কিছুদিন আগে অন্যান্য রাজা-মহারাজাদের ডেকে পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ যেসব কতা বলছিলো, রাজা আনন্দ পালকেও হিন্দু ধর্মের জয় এবং সুলতান মাহমূদকে পরাজিত করার দিক-নির্দেশনামূলক কথা শোনালো। রাজা আনন্দ পালকেও পণ্ডিত পরামর্শ দিলো, সুলতান মাহমূদকে পেশোয়ারের পার্শ্ববর্তী ময়দানে যুদ্ধের নামে আটকে রাখতে হবে আর অপরদিকে গজনী আক্রমণ করে দখল নিতে হবে। এছাড়া গজনীর মুসলমানদের অভিযান ঠেকানো সম্ভব নয়।

"আমি যদি লাহোরেই ব্যস্ত থাকি, তাহলে বেরা এবং মুলতানের কি হবে?" প্রশ্ন করলো আনন্দ পাল।

"দেখবেন, এই দুই শহরের সকল মুসলিম সৈন্য আমাদের হাতে বন্দীরূপে গ্রেফতার হবে।" বললো পণ্ডিত। "আপনি এখন রাজধানীতে ফিরে যান। নাচ-গান বাদ দিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিন। সকল রাজ্য থেকেই আপনার কাছে সৈন্য আসছে। সে ব্যবস্থা আমি সেরে ফেলেছি।"

পরদিন সকাল বেলা রাজা আনন্দ পাল পাহাড়ের উপর অবস্থিত মন্দিরে গিয়ে পূজাপার্বন শেষ করে ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়। এদিকে সেই রাতেই বড় পণ্ডিত সামুরাতিকে সাথে নিয়ে যায়। আনন্দ পালের পক্ষে বিদায়লগ্নেও আর সামুরাতির সঙ্গে দু'চার কথা বলার সুযোগ হলো না।

পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ পাহাড়ের উপর অবস্থিত বড় মন্দিরের মূল আস্তানায় সামুরাতিকে নিয়ে যায়। সামুরাতি ঘুণাক্ষরেও জানতো না তাকে বলী দিয়ে তার দেহের রক্তে হিন্দুদের কৃষ্ণদেবীর চরণ ধোয়া হবে। সামুরাতিকে পণ্ডিত যখন মন্দিরের পাতাল কক্ষে নিয়ে গেলো, তখন সামুরাতি জানতে চাইলো, তাকে এখানে কেন আনা হয়েছে?

"আমার সাথে আসা কি তোমার কাছে ভালো লাগেনি?" সামুরাতির দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলো পণ্ডিত। পণ্ডিত বিছানা দেখিয়ে বললো, "আগে বসো, তারপর কথা বলো।"

সামুরাতি বিছানায় বসতে বসতে পণ্ডিতের দু'হাত তার দু'হাতে তুলে নেয় এবং পণ্ডিতকে নিজের দিকে টান দেয়। সামুরাতির টানে পণ্ডিত তার পাশে বসে পড়লো। সামুরাতি পণ্ডিতের চোখে চোখ রেখে একটা ভুবন মোহিনী হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে দেয়। এই হাসির ঝিলিকে পণ্ডিতের শরীর কেঁপে ওঠে। সামুরাতি

বললো, “মহারাজা! আমার নাচের সম্মান করতে পারেনি। আপনি আমার নাচ দেখেছেন কিন্তু কণ্ঠের গান শুনেনি। তবুও আপনার দৃষ্টিতে আমার দেহবল্লরী আকর্ষণীয় মনে হয়েছে।”

“হ্যাঁ। আরে তুমি তো ভুল বুঝেছো তরুণী।” গম্ভীর স্বরে বললো পণ্ডিত। “তোমার রূপ-সৌন্দর্য আমার ভালো লেগেছে বটে কিন্তু তুমি বুঝতে ভুল করছো। আমি জীবনে কোনোদিন নারী স্পর্শ করিনি আর জীবনে কোনদিন তা করবোও না।”

“কেনো?”

“আমি নারীর সংস্পর্শে যাওয়াকেই পাপ মনে করি।”

“তাই নাকি? তাহলে আজ এই পাপ করছেন কেনো?” জানতে চাইলো সামুরাতি।

“এ কথার জবাব আমি এখন দিতে পারবো না।” বললো পণ্ডিত। “তবে এ কক্ষে এসে তুমি মনে যে ধারণা পোষণ করেছো, আমার ক্ষেত্রে এমন ধারণা মন থেকে সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলো। তোমার শরীরের সৌন্দর্য নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আমাকে এসব ব্যাপারে তুমি আর কিছু জিজ্ঞেস করো না। তোমাকে আমি মনের মধ্যে দেবীর মর্যাদা দিয়ে রেখেছি। তোমাকে আমি গঙ্গা জলে স্নান করাবো। তোমার সকল পাপ ধুয়ে সাফ করে ফেলবো।”

পণ্ডিতের কথা শুনে সামুরাতির হাসি পেলো। বেশি সময় সে নিজের হাসি চেপে রাখতে পারলো না। টানা কিছুক্ষণ হাসলো। আর পণ্ডিত নির্বাক হয়ে সামুরাতির চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলো। শিশুর মতো হাসতে হাসতে উচ্ছ্বসিত হয়ে সামুরাতি পণ্ডিতের কোলে লুটিয়ে পড়ে। সামুরাতির রেশমী কোমল চুলগুলো পণ্ডিতের কোলজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। সামুরাতি তার চুলে এমন সুগন্ধি লাগিয়েছিলো– বিশেষ কোনো রাজার আগমনের অনুষ্ঠানেই শুধু এ ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করে সে। সুগন্ধিতে ছিলো মন মাতানো সৌরভ। মনোহরী এই সৌরভের সাথে সামুরাতির খোলা কাঁধ আর নরম হাত যখন পণ্ডিতের শরীর স্পর্শ করে, তখন হঠাৎ যেনো পণ্ডিত তার শরীরে একটা কাঁপুনি অনুভব করে। পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ জীবনে এতো ঘনিষ্ঠভাবে কোনো তরুণীকে দেখেনি। কিন্তু আজ সৃষ্টিকর্তার সৃষ্ট এক অপ্সরা তার কোলে লুটিয়ে আছে।

“ওঠো নর্তকী! বলো, তুমি কেনো এভাবে হাসছো।” সামুরাতিকে স্পর্শ না করেই লুটিয়ে পড়া থেকে ওঠে বসতে নির্দেশ দেয়।

সামুরাতি বিশেষ কোনো অভিজাত বংশের মেয়ে নয়। সে যৌবনের শুরু থেকেই শরীর নিয়ে খেলা করতে শিখেছে। পণ্ডিতের তাড়া খেয়ে ওঠে বসার পরিবর্তে সে পণ্ডিতের কোলে আরো বেশি করে নিজেকে মেলে ধরে। সে চিত হয়ে পণ্ডিতের মুখের দিকে শিশুর মতো কৌতূহলীকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, "গঙ্গা জলে স্নান করিয়ে আপনি আমার সব পাপ ধুয়ে দেবেন? না, তা নয়। আপনি ভুল বলেছেন। আপনার বলা উচিত ছিলো, যখন গঙ্গা জলে ঝাঁপ দেবো, তখন গঙ্গার সব পাপ গঙ্গার পানির সাথে ধুয়ে চলে যাবে।"

পণ্ডিত নিজে সামুরাতির হাত ধরে উঠানোর কোনো চেষ্টাই করলো না। সামুরাতি নাগিনীর মতো ফণা ধরে ওঠে বসলো এবং পণ্ডিতের দুটো হাত নিজের হাতে নিয়ে বললো, "আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি কেনো আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন? আপনি আমাকে পবিত্র করতে চাচ্ছেন...।" একথা বলে সে গম্ভীর হয়ে যায়। "আমার পাপ সেদিন মুছবে যেদিন আপনি ওইসব পাপীষ্ঠকে গঙ্গা জলে ডুবিয়ে জনমের স্নান করাবেন, যারা এতোদিন আমার শরীর নিয়ে খেলা করেছে। আমার শরীরকে যারা খেলার পুতুলে পরিণত করেছে। বলুন, আপনার ভগবান কি ওদের কোনো বিচার করতে পারে না?...

পণ্ডিত মহারাজ! আমার কোনো জাত-ধর্ম নেই। ওরা আমার জাত-ধর্ম থাকতে দেয়নি। কিছুদিন থেকে আমি অনুভব করছি, দৃশ্যত আমি যতো পাপ কর্মেই লিপ্ত থাকি না কেন, আমার দেহের খাচার ভেতরে যে হৃদয় আছে সেটি সম্পূর্ণ পবিত্র। এই পবিত্র হৃদয়টি সেই মহাপুরুষের জন্য অপেক্ষা করছিলো যে স্থূল লালসা নয়, আমাকে প্রকৃত হৃদয়ের ভালোবাসা দেবে।"

"তুমি কি জানো সেই মহাপুরুষটি কে?"

"হ্যাঁ, জানি। আপনিই সেই মহাপুরুষ। সে আপনার চেয়েও বয়স্ক কেউ হতে পারতো কিংবা আমার চেয়ে আরো তরুণ কেউ, সেই মহাপুরুষ হতে পারতো। সে কোনো মুনিঋষি কিংবা মাওলানা মুফতী হতে পারতো। সে কোনো চাটাইয়ে শয়নকারী দরবেশ হতে পারতো। আবার রাজপ্রাসাদের বিলাসী বাসিন্দাও হতে পারতো।... বলুন, আপনার কাছে কি গঙ্গা জলে বিধৌত অমলীন ভালোবাসা আছে?"

সামুরাতির কথা শুনে পণ্ডিত এভাবে চমকে উঠলো যেনো হঠাৎ কেউ তাকে সুখ-স্বপ্ন থেকে জাগিয়ে দিয়েছে। পণ্ডিত নিজেকে যতোই দাবী করছিলো নারী স্পর্শ থেকে তার শরীর পবিত্র এবং ভবিষ্যতেও পবিত্র থাকবে, কিন্তু সামুরাতির কোমল স্পর্শ আর তার রেশমী কোমল চুলে সে বাঁধা পড়ে গিয়েছিলো।

সামুরাতির লাজুক হাসি পণ্ডিতকে জাদুর মতো অবচেতন করে দিয়েছে। পণ্ডিত নিজেও মুগ্ধ হাসি হেসে বললো, "অবশ্যই, একজন পূজারীর কাছ থেকে তুমি পাপ নয়, ভালোবাসাই পাবে।"

"আপনি যদি আমাকে সেই রকম ভালোবাসা দেন, যে ভালোবাসার জন্য আমার হৃদয় উন্মুখ হয়ে আছে, তাহলে আমি পাথরের মূর্তির সামনে এমন নাচন নাচবো যে, তারাও আমার নাচ দেখে নাচতে শুরু করবে। আর যে মূর্তির হাতে আপনি বাঁশি রেখেছেন সেই বাঁশি থেকে এমন সুর বের হবে, যে সুরে আপনিও হারিয়ে যাবেন। দূর দরাজ থেকে লোকজন নগরকোটের নর্তকীর নাচ দেখার জন্য আসবে। লোকজন কৃষ্ণ ভগবানকে ভুলে গিয়ে নগরকোটের নর্তকীর পূজা করতে শুরু করবে।"

হঠাৎ পণ্ডিত বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং কক্ষে দু'হাত পেছনে বেঁধে মাথা নিচু করে পায়চারি করতে শুরু করে। পণ্ডিতের পায়চারি লক্ষ্য করছিলো সামুরাতি। পণ্ডিত থেমে থেমে সামুরাতির দিকে তাকাচ্ছিলো আর পায়চারী করছিলো।

"আপনি কি সকাল বেলা মহারাজের তাঁবুতে যাবেন?" পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করলো সামুরাতি।

"আমি যদি মহারাজা আনন্দ পালের কাছ থেকে চিরদিনের জন্যে তোমাকে নিয়ে আসি, তাতে তুমি খুশি হবে?"

"এটা আমার কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। পরিবর্তন শুধু একটাই। আগে আমি এক রাজার দখলে ছিলাম, সেখান থেকে এখন একজন মন্দিরের পণ্ডিতের দখলে এলাম। যখন এনেছেন আমাকে মনের মতো করে ভালোবাসা দিতে হবে। আপনাকে অবশ্যই আমার হৃদয়ের মূল্য দিতে হবে। সোনা-দানা দিয়ে এর মূল্য পরিশোধ করা সম্ভব নয়।

চকিতে সামুরাতি তার শরীর থেকে হীঁরা-মতি-পান্নার গহনা খুলে পণ্ডিতের পায়ের কাছে ছুঁড়ে দেয় এবং আঙ্গুল থেকে মুক্তার আংটি খুলে ছুঁড়ে ঘরের মেঝেতে ফেলে দিয়ে বলে, "নিন, এসব গঙ্গা জলে ফেলে দিন।"

পণ্ডিত মাথা নিচু করে হার ও আংটি কুড়িয়ে তার সামনে রেখে বলে, "যাও, এখন আরামে শুয়ে ঘুমাও। আমি খুব ভোরে আসবো এবং তোমাকে গঙ্গা তীরে নিয়ে যাবো।"

* * *

সামুরাতিকে পণ্ডিতের হাতে তুলে দিয়ে রাজা আনন্দ পাল লাহোর ফিরে যায়। রাজার বুকভরা কষ্ট তার সবচেয়ে প্রিয় গায়িকা নর্তকীকে ছেড়ে আসতে হলো। সামুরাতির নাচের মুদ্রা আর জাদুকরী কণ্ঠের জন্য রাজা আনন্দ পাল একশ' তরুণীকেও নর বলী দিতে প্রস্তুত ছিলো। কিন্তু পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ তাকে কোনো কথা বলারই অবকাশ দিলো না। দেবীর নামে তাকে বলী দেয়ার জন্য তুলে দিয়ে গেলো। শেষবারের মতো সামুরাতির সাথে দু'টি কথা বলারও সুযোগ দিলো না। উপরের মন্দিরে গেলেও রাজা আর সামুরাতির দেখা পেলো না। এ জন্য রাজার মনটা ভারী হয়ে আছে। বেশ ক'দিন সামুরাতির শূন্যতায় মন খারাপ রইলো রাজার। কিন্তু খুব বেশি দিন সামুরাতির প্রেমের যাতনা বোধ করার অবকাশ পেলো না রাজা। অন্যান্য রাজা থেকে দলে দলে সৈন্য তার রাজধানীতে আসতে শুরু করেছে। বাধ্য হয়েই সামুরাতির কথা ভুলে গিয়ে যুদ্ধ প্রস্তুতির দিকে তাকে মনোনিবেশ করতে হলো।

দেখতে দেখতে আজমীর, কনৌজ ও গোয়ালিয়রের সেনাবাহিনী লাহোর পৌঁছে যায়। কাজরের সেনাবাহিনীকে লাহোর না পাঠিয়ে পেশোয়ারের দিকে পাঠানো হয়। কাজর বাহিনীর কমান্ডারকে বলে দেয়া হলো, সে যেনো সিন্ধু নদী পার হয়ে তাঁবু খাটিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

১০০৮ সালের শ্রাবণ-ভাদ্র মাস। সিন্ধু নদ তখন উত্তাল। কানায় কানায় পানিতে ভরা থাকায় সেনাবাহিনীর যাতায়াত যথেষ্ট কষ্টকর হয়ে উঠলো। সে সময় বহু নৌকা একসাথে জুড়ে দিয়ে পুল তৈরি করা হতো। কিন্তু নৌকার তৈরি পুলকে বারবার ঢল এসে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো। সেই সাথে বিশাল সেনা বহরের সাথে অপরাপর উট-ঘোড়া ও গরুগাড়ি বোঝাই রসদপত্র পারাপারের জন্য অন্তত মাসখানেক সময় দরকার ছিলো। কিন্তু হিন্দু রাজা সুলতান মাহমূদকে সেনাবাহিনী পুনর্গঠনের সুযোগ মোটেও দিতে চাচ্ছিলো না।

তৎকালীন ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, সে সময় গোটা লাহোর একটি সেনা ক্যাম্পে পরিণত হয়েছিলো। যেদিকেই চোখ যেতো শুধু সেনাবাহিনীর আনাগোনা চোখে পড়তো। দলে দলে বিভিন্ন রাজ্য থেকে সেনাবাহিনী লাহোরে পদার্পণ করেছিলো। সেই সাথে দলে দলে হিন্দু তরুণ-যুবকরা সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য লাহোরে এসে জড়ো হচ্ছিলো।

যেসব হিন্দু যুবক-তরুণ অশ্বারোহণ ও তীর তরবারী চালাতে পারতো, তাদেরকে নিয়মিত সেনাবাহিনীতে ভর্তি করে নেয়া হচ্ছিলো। হিন্দু মহিলা তাদের যুবক ছেলেদের এবং তরুণী বধূরা তাদের সামর্থবান স্বামীদেরকে সেনাবাহিনীতে পাঠিয়ে গর্ববোধ করছিলো।

মন্দিরের পণ্ডিতরা ভক্তদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এতোটাই ক্ষেপিয়ে তুলেছিলো যে, কোন হিন্দু মা আর তার তরুণ ছেলেকে যুদ্ধে যাওয়া থেকে বারণ করতো না বরং যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করতো। সাধারণ হিন্দু প্রজারা সেনাদের জন্য পণ্যসামগ্রীর পাহাড় গড়ে তুলেছিলো। সেনাদের জরুরী রসদপত্র বহনের জন্য সাধারণ প্রজারা পর্যন্ত তাদের উট, মহিষ ও গরুগাড়ী দিয়ে দিচ্ছিলো। তখন মন্দিরগুলোতে শুধু একটাই প্রার্থনা হতো, "হে ভবগান! হিন্দুদের বিজয়ী এবং মুসলমানদের পরাজিত করো।"

অবস্থা দেখে মনে হতো, হিন্দুদের অন্যসব কামনা-বাসনা হারিয়ে গিয়েছিলো। তাদের তখন একটা কামনাই ছিলো, মুসলমানদের পরাজিত করা, তাদের নিঃশেষ করা। লাহোরের আশপাশের লোকেরা বিশাল সেনাবাহিনীর আগমনে আনন্দে নেচে ওঠেছিলো। ঐতিহাসিক আল-বিরুনী ও ফিরিশতা লিখেন, হিন্দুস্তানে এর আগে এতো বিপুল সেনা সমাবেশ কখনো ঘটেনি।

হিন্দু রাজাদের বিশাল রণপ্রস্তুতির বিপরীতে সুলতান মাহমূদের ছিলো মুষ্টিমেয় সেনা আর আল্লাহর উপর ভরসা। অবশ্য হিন্দু বাহিনীর আধিক্যে তিনি মোটেও চিন্তান্বিত ছিলেন না। কারণ, তার নিজস্ব রণকৌশলের প্রতি তিনি ছিলেন পূর্ণ আস্থাশীল এবং আল্লাহর রহমত প্রাপ্তির প্রতি তার ছিলো অগাধ বিশ্বাস।

সেই দিনগুলোতে সুলতান ছিলেন পেশোয়ারে। লাহোর থেকে অব্যাহতভাবে তার কাছে খবর আসছিলো। সেনাবাহিনী তো নয় বিশাল এক প্লাবন তার দিকে ধেয়ে আসছে। অবশ্য তখনো সুনির্দিষ্টভাবে তার কাছে খবর পৌছেনি, এ প্লাবনের গতি কোন্ দিকে।

বেরা ও মুলতানে তিনি এতো পরিমাণ রসদপত্র সঞ্চিত করেছিলেন যে, বেরা ও মুলতান অবরুদ্ধ হলেও এক বছর পর্যন্ত অবরোধবাসীরা নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিতে পারবে। তিনি মনে করেছিলেন, হিন্দুরা যদি তার দখলিকৃত এসব শহর অবরোধ করে তাহলে বাইরে থেকে তিনি অবরোধ ভাঙ্গার চেষ্টা করবেন।

* * *

একদিন সুলতান মাহমূদকে তার গোয়েন্দা শাখা খবর দিলো, বিদরো অঞ্চলে ফক্তরের সেনারা শিবির স্থাপন করেছে। এ সংবাদ সুলতানকে আরো ভাবিয়ে তুললো। তিনি বুঝতে পারলেন, হিন্দুরা একসাথে তিনটি রণক্ষেত্র তৈরি করছে। তারা বেরা এবং মুলতান অবরোধ করবে, একই সাথে আমাকে এখানে ব্যস্ত থাকতে বাধ্য করবে।

বিষয়টি প্রকৃতপক্ষেই সুলতানের জন্য ছিলো চরম উদ্বেগের। কারণ, এমন পরিস্থিতিতে একই সাথে তিনটি রণাঙ্গন মোকাবেলা করা এবং জয়লাভ করার ব্যাপারটি তার পক্ষে মোটেও সম্ভব ছিলো না। বিজয় তো দূরের কথা, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই তখন সংশয়পূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

হিন্দু সেনাদের বিদরো পৌঁছার সংবাদের কয়েক দিন পরই সুলতানের কাছে খবর এলো, সম্মিলিত হিন্দু বাহিনী প্লাবনের মতো ধেয়ে আসছে। হিন্দু বাহিনীর দৃষ্টি ছিলো পেশোয়ারের দিকে। লাহোর ও আশপাশের লোকেরা হিন্দু বাহিনীকে এতোটাই সহযোগিতা করেছে যে, তারা কাঁধে বয়ে সেনাদের রাভী নদী পার করে দিয়েছে। তখন রাভী নদীতে ছিলো যথেষ্ট স্রোত। নদী পার হওয়ার জন্য নৌকা দিয়ে পুল তৈরি করা হয়। নৌকা স্রোতে যাতে নড়তে না পারে এ জন্য স্থানীয় লোকেরা মোটা মোটা রশি দিয়ে বেঁধে হাজার হাজার লোক টেনে রাখে, যার ফলে সেনাদের নদী পার হতে বেগ পেতে হয়নি। সামরিক রসদপত্রের বোঝাই গরুগাড়ীগুলোকে হিন্দু জনতা নিজেরা ঠেলে নদী পার করে আরো এগিয়ে দেয়, যাতে নরম মাটি ও কাদা পানিতে আটকে মালবাহী জন্তুগুলো কাহিল না হয়ে যায়।

সুলতান মাহমূদকে যখন জানানো হলো, সকল হিন্দু ফৌজ লাহোর থেকে পেশোয়ারের দিকে চলে এসেছে তিনি তা বিশ্বাস করতে পারেননি। তিনি বেরায় ছদ্মবেশে গোয়েন্দা পাঠিয়েছিলেন। তার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছিলো না, কেন হিন্দুরা বেরা ও মুলতান এড়িয়ে লাহোরের দিকে অগ্রসর হবে। সকল দিক থেকেই গোয়েন্দারা যখন খবর পাঠাচ্ছিলো, বেরা ও মুলতানের দিকে হিন্দুদের কোনো দৃষ্টি নেই, সম্মিলিত হিন্দু ফৌজ পেশোয়ারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সেই সাথে তার একান্ত গোয়েন্দা দলও যখন এ খবর নিশ্চিত করলো যে, হিন্দু বাহিনী পেশোয়ারের পথে অগ্রসর হচ্ছে, তখনই সুলতানের বিশ্বাস হলো কিন্তু ততোদিনে অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে।

সুলতান এ খবর নিশ্চিত হলে তার সেনা কর্মকর্তাদের বললেন, শত্রুদের কাছে বেরা ও মুলতানের চেয়ে গজনী বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমার মনে হচ্ছে, পেশোয়ারের যে ময়দানে জয়পাল আমাদের কাছে পরাজিত হয়েছিলো, হিন্দু সম্মিলিত বাহিনী সেই ময়দানেই আমাদের মুখোমুখি হতে চাচ্ছে। ওরা আমাদের বাহিনীকে কচুকাটা করে গজনী দখলের পরিকল্পনা এঁটেছে। তারা যদি এ লক্ষ্য অর্জনে এদিকে এসে থাকে, তাহলে অবশ্যই তা দূরদর্শিতার পরিচায়ক বটে। এতো বিপুল সেনা সদস্যের একটি বাহিনীর লক্ষ্য এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক।...

আল্লাহ ছাড়া দৃশ্যত সিন্ধু নদ আমাদের সহায়ক হতে পারে। কোনভাবেই যাতে হিন্দু বাহিনী সিন্ধু নদ পার হতে না পারে, সে ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে। এখন আমাদের দরকার একদল আত্মত্যাগী যোদ্ধা আর লক্ষ্যভেদী তীরন্দাজ। শত্রুবাহিনী যদি নদ পার হতে চায়, তাহলে তারা যে কোনো মূল্যে শত্রুদের নদ পরাপার রুখে দেবে। শত্রুবাহিনী যদি নৌকা দিয়ে পুল তৈরি করে সিন্ধু পার হতে চায়, তাহলে আমাদের যোদ্ধারা জীবনবাজি রেখে ওদের নৌকার রশি কেটে দেবে। আর হাতি যদি নৌকার পুল দিয়ে পার করতে চায়, তাহলে হাতিগুলোকে তীরন্দাজরা তীরবিদ্ধ করবে। দু'একটি হাতি তীরবিদ্ধ হলে পুল দিয়ে আর কাউকে পার হতে দেবে না।

অবশ্য শুধু এই তৎপরতা দ্বারা শত্রুবাহিনীর পথ রোধ করা যাবে না। কারণ, শত্রুবাহিনী যখন এখানে পৌছবে, তখন শীতকাল শুরু হয়ে যাবে। তখন নদীর পানি কমে যাবে। নদীর স্রোতও তেমনটা থাকবে না। আমরা শত্রু বাহিনীর সাথে মোকাবেলা করবো নদীর তীরে। এ যুদ্ধটা হয়তো আমাদের জীবন-মরণ যুদ্ধে পরিণত হবে।

সুলতান তখনই বেরা, মুলতান ও গজনীতে দূত পাঠিয়ে খবর দিলেন, ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে রিজার্ভ বাহিনীর সকল সদস্য পেশোয়ার এসে পড়ো। খুব দ্রুতগতিতে এসো। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সুলতান মাহমূদ এমন হয়ে গেলেন যে, তিনি মানচিত্র সামনে রেখে গভীর চিন্তায় ডুবে যেতেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধুই ভাবতেন। পানাহার ও ঘুমের কথাও ভুলে যেতেন। তার আঙ্গুল মানচিত্রের রেখায় রেখায় ঘুরতো। তিনি নতুন যুদ্ধক্ষেত্র নির্ধারণ করতেন, কৌশল নির্ধারণ করতেন। সবদিক বিবেচনা করে আবার সেটি পরিবর্তন করে নতুন রণক্ষেত্র নির্ধারণ করতেন। এভাবে সকাল, দুপুর হয়ে রাতও চলে যেতো। ওয়াক্ত মতো নামায আদায় ছাড়া তার আর কোনো কিছুর দিকে খেয়াল ছিলো না।

* * *

রাজা আনন্দ পাল যখন নগরকোট মন্দির থেকে রাজধানীতে ফিরে এলো, তখন শুয়াইব আরমুগানী সামুরাতির ঘরে। সামুরাতির পরিচারিকা আরমুগানীকে জানালো, "রাজা সফর থেকে ফিরে এসেছে কিন্তু সামুরাতি ফেরেনি।"

দু'তিন রাত পর সামুরাতির পরিচারিকা আরমুগানীকে জানালো, "যেসব তরুণী সামুরাতির সঙ্গে নগরকোট গিয়েছিলো তারা বলেছে, প্রথম রাতেই নগরকোটের বড় পণ্ডিত সামুরাতিকে মন্দিরের ভেতরে নিয়ে গেছে। এরপর তারা আর সামুরাতির দেখা পায়নি। রাজাও আর তার ব্যাপারে কিছু বলেনি।"

এ খবর শুনে আরমুগানী ভাবতে লাগলো, নগরকোট থেকে সামুরাতির ফিরে না আসার কারণ কি? সে ভাবলো, পণ্ডিত সামুরাতিকে দেখে এতোই মুগ্ধ হয়ে গেছে যে, সামুরাতিকে সে নিজের কজায় রেখে দিয়েছে। নগরকোটের বড় পণ্ডিতের কথা রদ করার দুঃসাহস হিন্দুস্তানের কোনো রাজা-মহারাজার নেই।

বৃদ্ধা পরিচারিকা হৃদয়ের সবটুকু মমতা দিয়ে শুয়াইব আরমুগানীর সেবা-শুশ্রূষা করছিলো। সে ছিলো আরমুগানীর প্রতি বিশ্বস্ত। সামুরাতির নির্দেশে অতি গোপনীয় রত্নের মতোই আরমুগানীকে সবার দৃষ্টি থেকে আড়ালে রেখেছিলো বৃদ্ধা। সেই সাথে প্রতিদিন আরমুগানীর ক্ষতস্থানের পট্টি বদলে ওষুধ দিয়ে দিচ্ছিলো। যার ফলে আরমুগানীর ক্ষতস্থান দ্রুত সেরে উঠছিলো।

ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছে শুয়াইব আরমুগানী। সামুরাতির ঘরে আশ্রয় নিয়ে গ্রেফতারী এড়িয়ে নিজেকে বাঁচাতে পেরেছিলো আরমুগানী। আত্মরক্ষার ব্যাপারটিই তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো আরমুগানীর জন্য। অপরদিকে যারকার কথা এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারছে না। এতোদিন গোয়েন্দা কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে বলে কোনো মেয়েকে বিয়ে করেনি আরমুগানী। কিন্তু যারকাকে বিয়ে করার পর আরমুগানীর জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটে। সে প্রবৃত্তির গোলামে পরিণত হয়ে পড়ে। ফলে যদিও আরমুগানী জানতো যারকার সাথে তার বিয়েটা হয়েছে চক্রান্তমূলক কিন্তু সেটিকে সে এই বলে মেনে নিয়েছিলো যে, যারকা চক্রান্তের ক্রীড়নক হলেও মনে-প্রাণে তাকে ভালোবেসেছে। এর প্রমাণ হলো, সে ঝুঁকি নিয়ে তার প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখন তার হৃদয়ের একমাত্র আকুতি, যারকাকে সে কোথায় পাবে?

সামুরাতির বৃদ্ধা পরিচারিকা আরমুগানীর এসব গোপন কথা জানতো না। তার পক্ষে বৃদ্ধাকে এ কথা বলাও সম্ভব ছিলো না, সে যারকা নামের এক তরুণীর সাহচর্য পেতে অধীর হয়ে আছে।

একদিন একটি ঘোড়াগাড়ী সামুরাতির বাড়ির সামনে এসে থামলো। সামুরাতি বাড়ি ফিরে এসেছে ভেবে বৃদ্ধা পরিচারিকা দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। ঘোড়াগাড়ী থেকে দুই তরুণী নামলো। তারা এসে সামুরাতির পরিচারিকার সাথে কথা বলতে শুরু করলো। আরমুগানী লুকিয়ে আগন্তুকদের দেখছিলো। দুই তরুণীকে দেখে সে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলো না। দুই তরুণীর একজন ছিলো যারকা। যারকা সামুরাতির সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এসেছিলো।

বৃদ্ধা পরিচারিকা তাদেরকে সামুরাতির কক্ষে বসিয়ে গল্প করছিলো। এমতাবস্থায় আরমুগানীর পক্ষে বৃদ্ধাকে ডাকা সম্ভব ছিলো না। সাত-পাঁচ ভেবে সে একটি ফুলদানী মেঝেতে ছুঁড়ে মারলো। ফুলদানী ভাঙ্গার আওয়াজ শুনে পরিচারিকা দৌড়ে এ কক্ষের দিকে এলো এই ভেবে যে, হয়তো বিড়াল কোনো কিছু ফেলে দিয়েছে।

বৃদ্ধা এ কক্ষে এলে আরমুগানী তাকে হাতের ইশারায় কাছে ডেকে কানে কানে বললো, তোমাকে এ ঘরে আনার জন্যে আমিই ফুলদানী ছুঁড়ে ফেলেছি। আগন্তুক মেয়ে দু'টির মধ্যে যারকা নামের মেয়েটিকে এভাবে আমার কাছে পাঠাবে যাতে তার সঙ্গী মোটেও বুঝতে না পারে।

বৃদ্ধা আরমুগানীকে জানালো, সে সামুরাতির সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলো। সে জানতো না, মাসুরাতি বাড়িতে নেই। এখন তো সে চলে যাচ্ছে, কিভাবে আমি ওকে তোমার কথা বলবো?

আরমুগানী নাছোরবান্দা। সে বৃদ্ধাকে বিনয়ের সাথে অনুরোধ করলো, তুমি যে করেই হোক আমার কাছে ওকে পাঠানোর ব্যবস্থা করো। এ কাজটি খুব জরুরী।

আরমুগানীর উপর্যুপরি অনুরোধে শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধা সম্মত হলো। এই বৃদ্ধা পরিচারিকা ছিলো অভিজ্ঞ। জীবনে বহু নারী-পুরুষকে সে আঙ্গুলের ইশারায় নাচিয়েছে। উটকো একটা বাহানা সৃষ্টি করে পরিচারিকা অপর তরুণীকে নিয়ে ঘরের বাইরে চলে গেলো। এই ফাঁকে আরমুগানী এসে যারকার সামনে দাঁড়ালো। যারকা আরমুগানীকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। সে আরমুগানীকে বুকে জড়িয়ে ধরে বিস্ময়ের সাথে বললো, তুমি এখনো এদেশে রয়ে গেছো? পায়ে আঘাত পেয়েছো কিভাবে?

"যদি ধোঁকা দিতে চাও তাহলে পরিষ্কার বলে দাও। আমি তোমার জন্যই এখানে অপেক্ষা করছিলাম। প্রতারণা করলে জীবনের জন্য চলে যাবো। নয়তো বলো, কোথায় তোমার সাথে সাক্ষাৎ হবে?"

"হায়! আমি কিভাবে বিশ্বাস করাবো যে, তোমার সাথে ধোঁকাবাজি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি যেখানে যেতে বলবে সেখানেই যাবো। চাইলে এখানেও আসতে পারি।"

"ঘরে নয়, বাইরেই আমি তোমার সাথে দেখা করতে চাই। প্রয়োজনে তোমাকে ঘরেও নিয়ে আসতে পারবো।... তবে এর মধ্যে তুমি এ ব্যাপারটা জানতে চেষ্টা করবে, সামুরাতি কেন নগরকোট থেকে ফিরে আসেনি। সে

আমাকে তার বাড়িতে আশ্রয় দিয়ে উপকার করেছে। এখন চলে যাও। তোমার সঙ্গীনী এসে পড়ছে।"

যারকা আরমুগানীর সামনে থেকে আড়াল হতে চাচ্ছিলো না। বহুদিন পর অপ্রত্যাশিতভাবে সে আরমুগানীর সাক্ষাৎ পেলো। সে ভেবেছিলো, আরমুগানী নিরাপদেই শহর থেকে পালাতে পেরেছে। সে কোনদিন আরমুগানীর দেখা পাবে এমনটি আশা করেনি। কারণ, তার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে আরমুগানীর গ্রেফতার হওয়ার আশংকা ছিলো। আরমুগানী কোনো অবস্থাতেই গ্রেফতার হতে চাইবে না। কারণ, আরমুগানী যে সুলতান মাহমূদের গোয়েন্দা, এ সংবাদ লাহোরে জানাজানি হয়ে গিয়েছিলো। কাজেই, আরমুগানীর পক্ষে আর লাহোরে আসা সম্ভব নয়।

যারকা আরমুগানীর জীবনে এক আয়েশী মরীচিকা হয়ে দেখা দিয়েছিলো। যারা যারকাকে মরীচিকার মতো ব্যবহার করেছিলো, তাদের এই প্রয়োগ ছিলো স্বার্থক। এই ধোঁকায় পড়ে আরমুগানী ওয়াদা ভঙ্গ করে তার আত্ম-পরিচয় প্রকাশ করে দিয়েছিলো। আরমুগানী নারী সৌন্দর্যের ফাঁদে পড়ে নিজের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করে দিয়েছিলো কিন্তু হয়তো সেটি কুরআন কারীমেরই বরকত যে, যে ফাঁদ পাতা হয়েছিলো আরমুগানীকে ফাঁসানোর জন্য, সেই ফাঁদে সে নিজেই আটকে গিয়েছিলো। আরমুগানীর ফাঁদও ছিলো এমন কার্যকর যে, চক্রান্তকারিণী যারকা নিজের মিশন ভুলে গিয়ে শিকারকে শুধু মুক্ত করেই দেয়নি, সেও শিকারের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছে। কারণ, জীবনে যতো পুরুষের স্পর্শে সে গিয়েছিলো, কেউ তাকে আরমুগানীর মতো অকৃত্রিম ভালোবাসায় সিক্ত করেনি। সবাই তার দেহ-সৌন্দর্য নিয়ে উল্লাস করেছে মাত্র। নারী মনের ভালোবাসার অভাবটুকু আরমুগানীর অপত্য ভালোবাসায় আরো তীব্র হয়ে ওঠে, বুকের মধ্যে না পাওয়ার হাহাকার আরো প্রচণ্ড হয়। আরমুগানীর অকৃত্রিম ভালোবাসার ঝর্নাধারায় অবগাহন করে নিজেকে সিক্ত করতে সবকিছু ভুলে যায় যারকা। যারকা নিজেকে ভাসিয়ে দেয় আরমুগানীর প্রেমের জোয়ারে। কিন্তু জোয়ারের পর ভাটার টানে তারা পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই যারকা সামুরাতির ঘরে আরমুগানীর দেখা পেয়ে যায়। কিন্তু বেশিক্ষণ আরমুগানীর সান্নিধ্যে কাটানোর সুযোগ ছিলো না যারকার। কারণ, তার বান্ধবীকে খুব বেশি সময় বৃদ্ধা পরিচারিকা অন্য ঘরে বসিয়ে রাখতে পারছিলো না।

"আগামীকাল রাতে এই বাড়ির বাগানে তোমার সাথে আমার দেখা হবে।" এই বলে কক্ষ থেকে চলে গেলো আরমুগানী।

যারকা ও তার বান্ধবী চলে যায়। বৃদ্ধা পরিচারিকা আরমুগানীকে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি লুকিয়ে যারকার সাথে কি কথা বলেছো? ওই মেয়েটি থেকে নিজেকে আড়ালে রাখলে কেন?"

এমন প্রশ্ন করা ছিলো স্বাভাবিক। বৃদ্ধা আরমুগানীর প্রতি বিশ্বস্ত ছিলো বটে কিন্তু তার প্রকৃত পরিচয় সে মোটেও জানতো না। সামুরাতি তাকে শুধু বলেছিলো, ওকে তুমি লোকচক্ষুর দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখবে। আর ওর ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করবে। বৃদ্ধা সামুরাতির কথা যথার্থভাবেই পালন করছিলো।

এই বৃদ্ধা ছিলো রাজমহলের শীর্ষ নর্তকীদের একজন। রূপে-গুণে-নাচে সমবয়স্কাদের মধ্যে সে ছিলো অনন্যা। কিন্তু বয়সের ভারে যখন তার সুটোল গণ্ডদ্বয়ে দেখা দিলো বলী রেখা, আর মাথার দু'চারটি চুলে সাদা বর্ণ ধারণ করলো, নাচের মুদ্রায় দেখা দিলো ছন্দপতন তখন তার প্রতি আকর্ষণে ভাটা পড়লো। সে রাজমহল থেকে বিতাড়িত হলো। তার নাচের মুদ্রায় যারা বিমোহিত হতো, তার শরীর নিয়ে খেলতো, যারা অহর্নিশ উন্মুখ থাকতো, তাদের সবাই তার দিকে আর ফিরে তাকানোর প্রয়োজন বোধ করতো না। রাজমহল থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর তার রক্তের কণায় কণায় আত্মোপলব্ধি হলো যে, রাজমহলের মহারথীরা আমার মতো নারীদের শরীর ও সৌন্দর্যকেই শুধু ভোগ করতে চায়। এদের মধ্যে কোনো মানবিক দয়া নেই। এরপর সে একজনকে ভালোবাসে। স্বপ্ন দেখে তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার। কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ এক নর্তকীর ঘর বাঁধার স্বপ্ন পূরণ হলো না। রাজার আনুগত্য প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার কারণে সেই পুরুষকে রাজা কারান্তরীণ করলো। কারণ, সে ছিলো মুসলমান। বস্তুত সেই লোক স্বজাতির সাথেও বেঈমানী করেছিলো, কিন্তু পরিণামে আজীবন অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠে ধুঁকে ধুঁকে মরা ছাড়া আর কিছুই প্রাপ্তি ঘটলো না। বয়স্ক এই নর্তকীর এই ভালোবাসার কথাও নীরবে-নিভৃতে মৃত্যুবরণ করলো। কেউ তা জানতে পারলো না তার সেই স্বপ্নের পুরুষের কথা। কারণ, জানাজানি হয়ে গেলে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে তাকেও কারাবরণ করতে হতো।

এখনও সে শাব্দিক অর্থে বুড়ি নয়। স্বাস্থ্য সচেতন বলে এখনও তার শরীরের গাঁথুনী ও চেহারা ছবি ছিলো ভরাট ও টলটলে। সে যখন বুঝতে পারলো তার পক্ষে আর নাচা সম্ভব নয়, তার জায়গা দখল করে নিয়েছে সামুরাতি তখন সে সামুরাতির ঘরে এসে ঠাঁই নেয়। সামুরাতির সাথে এই বয়োজ্যেষ্ঠ নর্তকীর সম্পর্ক অন্য নর্তকীদের মতো ছিলো না। যেমনটি নর্তকীদের মধ্যে পারস্পরিক

হয়ে থাকে। সামুরাতিকে সে খুব ভালোবাসতো। সামুরাতি নাচে-গানে ছিলো সকলের সেরা। জাদুকরী কণ্ঠ ও রূপ-সৌন্দর্যে সামুরাতি ছিলো অনন্যা। পরিচয়ের শুরু থেকেই সামুরাতির প্রতি মনের টান ছিলো এই প্রবীণার। এক পর্যায়ে রাজমহল থেকে বিতাড়িত হয়ে সে যখন সামুরাতির বাড়িতে ঠাঁই নিলো, তখন সামুরাতি তাকে সানন্দে জায়গা দিলো। সেও নিজেকে ঢেলে দিলো সামুরাতির সেবা-যত্নে। দিনে দিনে সামুরাতি তাকে মায়ের আসনে স্থান দিয়েছিলো আর বয়োজ্যেষ্ঠও তার হৃদয় নিংড়ানো স্নেহ-মমতা উৎসর্গ করে দিলো সামুরাতির কল্যাণে।

শুয়াইব আরমুগানী আহত হলে সামুরাতি তাকে ঘরে নিয়ে সেবা-শুশ্রূষা করে যখন বললো, গোপন রত্নের মতো তুমি ওকে আগলে রাখবে এবং সেবা-যত্ন করবে। তখন সে জানতেও চায়নি, লোকটি এমন কি রত্ন আর কেনই বা তাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রাখতে হবে। সে এমনিতেই বুঝে নিয়েছিলো, নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো রহস্য আছে। বৃদ্ধা বুঝে নিয়েছিলো, নিশ্চয়ই এ সুদর্শন যুবককে বিশেষ লক্ষ্যে লুকিয়ে রাখতে চায় সামুরাতি। কারণ, এক সময় সেও একজনকে আপন করে নিতে চেয়েছিলো। কিন্তু রাজার বাহিনী তার ভালোবাসার মানুষটিকে ধরে নিয়ে সারাজীবনের জন্য কয়েদখানায় বন্দী করে রেখেছে। ঘর বাঁধার স্বপ্নটা তার স্বপ্নই থেকে যায়। আজীবন বুকের মধ্যে সেই কষ্ট-যাতনা সে বয়ে বেড়াচ্ছে। তাই সামুরাতির জীবনটাও এমন যন্ত্রণাদগ্ধ হোক, তা সে ভাবতেই পারে না। ফলে সামুরাতির এতোটুকু বলায়ই সে অমূল্য রত্নের মতোই আরমুগানীকে আগলে রাখতে চেষ্টা করে। সামুরাতি রাজা আনন্দ পালের নগরকোট মন্দিরে গিয়ে ফিরে না এলেও আরমুগানীকে সে যথারীতি লোকচক্ষুর আড়ালেই রেখেছে। আসলে এ কাজটি সে করেছে সামুরাতির ভালোবাসার টানে। নিজের অপূরণীয় প্রেমের সুপ্ত ঝর্না থেকে সিঞ্চিত মমতা দিয়ে সে ধীরে ধীরে সুস্থ করে তোলে আরমুগানীকে। সামুরাতির দীর্ঘ অনুপস্থিতি সত্ত্বেও সে কোনো দিন আরমুগানীকে এ কথাটিও জিজ্ঞেস করেনি, সে কে? কি তার পরিচয়? কোত্থেকে এসেছে? যাবেই বা কোথায়?

যারকা এ বাড়িতে সামুরাতির সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে আরমুগানী যখন তার সাথে লুকিয়ে কথা বলতে অনুরোধ জানায়, তখন স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধা পরিচারিকার মনে প্রশ্ন দেখা দেয়, লুকিয়ে থাকা এই যুবকের সাথে যারকার কি সম্পর্ক? কিভাবে তার পরিচয় যারকার সাথে? যারকার সাথে অতি গোপনে বান্ধবীকে এড়িয়ে কি কথা সে বললো?

বৃদ্ধার মনোভাব আন্দাজ করে আরমুগানীর মধ্যেও এ তাড়না সৃষ্টি হলো যে, সে নিজের প্রকৃত পরিচয় বৃদ্ধার কাছে ব্যক্ত করবে কিনা? ভেবে-চিন্তে সে সিদ্ধান্ত নিলো, হ্যাঁ, বৃদ্ধাকে বলেই দেবে তার পরিচয়।

আরমুগানী বৃদ্ধাকে ডেকে বললো, "যারকা আমার বিবাহিতা স্ত্রী।"

"তাই যদি হবে তবে এমন রাখঢাক কেন?" জানতে চাইলো বৃদ্ধা।

"তুমি কি ওর সৌন্দর্য দেখেছো?" আরমুগানীর মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। সে বললা, "তুমি কি জানো যারকা কার মেয়ে?"

"যারকা এক ভয়ংকর সাপের সন্তান?" উত্তর দিলো বৃদ্ধা। "ওর বাবাকে আমি চিনি। সে দুর্নীতিবাজ, বেঈমান, আত্মমর্যাদাহীন, গাদ্দার, কুলাঙ্গার এক মুসলমান। সে তার নিজের কন্যার রূপ-সৌন্দর্যের বিনিময়ে রাজ দরবারে বিশেষ সম্মানের অধিকারী হয়েছে।"

"ওর মেয়ে গোপনে আমাকে বিয়ে করেছিলো। সে আমার ঘরে চলে এলে তার বাবার কানে এ সংবাদ চলে যায়। তুমি জানো, গোয়েন্দাগিরির অভিযোগে লাহোরের সব মুসলমানদের ঘরে তল্লাশি করছে এবং নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে। ব্যক্তিগত আক্রোশেও অনেকে নিরপরাধ মানুষকে ধরিয়ে দিচ্ছে। যারকার বাবা সামরিক বাহিনীর এক পদস্থ কর্তাব্যক্তির কাছে তার সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে দেয়ার কথা বলে প্রশাসনকে পক্ষে নিয়ে এক রাতে কয়েকজন পুলিশ নিয়ে আমার ঘরে হানা দেয় এই বলে যে, আমি গজনী সুলতানের গোয়েন্দা। কিন্তু যারকা আমাকে গ্রেফতারির কবল থেকে বাঁচিয়ে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে। পুলিশ আমার ঘরে হানা দেয়ার আগেই যারকা কিভাবে যেনো জানতে পারে এবং আমাকে গভীর ঘুম থেকে জাগিয়ে বলে, তোমাকে গ্রেফতার করতে পুলিশ বাড়ি ঘেরাও করেছে। পরিস্থিতির ভয়াবতা অনুমান করতে পেরে আমি ঘরের ছাদে উঠে দেয়াল টপকে দৌড়ে পালাতে গিয়ে তোমাদের বাড়ির চৌহদ্দিতে এসে বাগানে লুকাই। পুলিশ আমার পিছু ধাওয়া করেও ধরতে পারেনি। কিন্তু তোমাদের কুকুর আমাকে পেয়ে বসে। তোমাদের বিবি সাহেবা আমার এ অবস্থা দেখে দয়াপরবশ হয়ে আমাকে আশ্রয় দেয়। আচ্ছা, আমাকে কি গোয়েন্দা মনে হয়?"

"না, তোমাকে গোয়েন্দা মনে হবে কেন?" বললো বৃদ্ধা পরিচারিকা। "যারকার বাবা আক্রোশের কারণে এমনটা করেছে। আচ্ছা, তুমি এখন কি করতে চাও?"

"আমার পক্ষে এখন আর লাহোরে থাকা সম্ভব নয়। যারকার বাবা যদি আমার কথা জানতে পারে, তবে সে আমাকে ধরিয়ে দেবে, নয়তো হত্যা করবে। আমি যারকাকে নিয়ে পেশোয়ার চলে যেতে চাই।"

"সে কি তোমার সাথে যেতে প্রস্তুত?"

"হ্যাঁ, সে তো একপায়ে খাড়া। আমি এ ব্যাপারে তোমার সহযোগিতা চাই। আগামীকাল সন্ধ্যায় যারকা লুকিয়ে এখানে আবার আসবে। আমি গোপনে বাগানের একটি জায়গায় ওর সাথে দেখা করবো বলে কথা দিয়েছি। এখন তো আদ্যপান্ত তুমিও জানতে পারলে। এখন তুমি কি ওকে ঘরে নিয়ে আসা পছন্দ করবে? অবশ্য ওর পিছু পিছু যদি কেউ এখানে পৌছে যায়, তাহলে আমার ধরা পড়ার আশংকা আছে।"

"তুমি নির্দ্বিধায় ওকে ঘরে নিয়ে আসতে পারো। আমি কুকুর ছেড়ে দেবো, তাহলে কারো পক্ষে এদিকে পা বাড়ানো সম্ভব হবে না। কেউ পিছু নিলেও তুমি পালানোর সুযোগ পাবে। যারকাকে আড়াল করার প্রয়োজন নেই। কারণ, আমি দৃঢ়তার সাথে যে কারো সাথে এ কথা বলতে পারবো যে, সে সামুরাতির সাথে দেখা করতে এসেছিলো।"

"তুমি কি এ বিষয়টি জানতে পেরেছো, মহারাজা ফিরে এসেছে কিন্তু সামুরাতি ফিরে এলো না কেন?"

"চেষ্টা করছি।" বললো বৃদ্ধা। "এমন তো হওয়ার কথা নয় যে, মহারাজা সামুরাতিকে উপঢৌকনস্বরূপ কাউকে দিয়ে আসবে। কারণ, যে কোনো মূল্যে সামুরাতিকে সে হাতের মুঠোয় রাখতে চাইবে।"

"আমি অবশ্য যারকাকে এ ব্যাপারে খবর নেয়ার জন্য বলে দিয়েছি। আশা করি, সে এ বিষয়ে সঠিক তথ্য সংগ্রহে সক্ষম হবে।"

* * *

যারকা কথা মতো সন্ধ্যায় সামুরাতির বাড়িতে এলো। সে ঠিকই সামুরাতির না ফেরা সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে। আরমুগানী বাগানের বাইরে যে জায়গায় সে লুকিয়ে ছিলো, সেই জায়গায় যারকার জন্য অপেক্ষা করছিলো। দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর যারকা এলো। যারকা একাকীই এলো। সে যারকাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে এলে পরিচারিকা বাগানে কুকুর ছেড়ে দেয়।

যারকা প্রথমেই জানালো, 'সামুরাতিকে নগরকোটের প্রধান পণ্ডিত বলী দেয়ার জন্য রেখে দিয়েছে। সে দ্বিতীয় সংবাদ দিলো, বিগত কয়েক মাস ধরে

তিন-চারটি রাজ্যের যেসব সেনা রাজা আনন্দ পালের রাজধানী লাহোরে জমায়েত হচ্ছিলো, এরা সবাই পেশোয়ারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই সম্মিলিত হিন্দু বাহিনীর বিজয়ের জন্য পণ্ডিত দেবীর পদমূলে নর বলী দেয়ার জন্য সামুরাতিকে আটকে রেখেছে। মনে হয় এর মধ্যে পণ্ডিত সামুরাতিকে বলী দেয়ার কাজ সমাপ্ত করেছে।" বললো যারকা।

"আমার বিশ্বাস, সামুরাতি এখনো বেঁচে আছে।" বললো বৃদ্ধা পরিচারিকা। "কারণ, যেসব নারীকে পণ্ডিতরা বলী দিতে চায়, এদেরকে কয়েক দিন নিজেদের কব্জায় রেখে মানসিকভাবে তৈরি করে। তাদেরকে গঙ্গাজলে ধৌত করে আর নানা তন্ত্রমন্ত্র পড়ে বশে আনে। এদেরকে নেশাদ্রব্য খাইয়ে এমন করে ফেলে যে, তরুণী নিজে থেকেই বলতে থাকে, আমাকে দেবীর চরণে বলী দিয়ে দাও।"

তিন জনের মধ্যে নেমে এলো গভীর নীরবতা।

"সামুরাতি আমার যে উপকার করেছে, তা কোনো সাধারণ কাজ নয়। আমি তা ভুলে যেতে পারি না।" বললো আরমুগানী। "আমি অবশ্যই নগরকোট যাবো এবং সামুরাতি জীবিত না ইতিমধ্যেই তাকে বলী দেয়া হয়েছে– তা জানতে চেষ্টা করবো। যদি জীবিত থাকে, তবে আমি তাকে বাঁচানোর সম্ভাব্য সব চেষ্টাই করবো।"

"নগরকোট মন্দির সম্পর্কে তুমি জানো না।" বললো বৃদ্ধা। "সেটি সাধারণ কোনো মন্দির নয় যে, তুমি সেটিতে প্রবেশ করে সব কক্ষ ঘুরে দেখতে পারবে। আমি নগরকোট মন্দিরের ভেতরে গিয়েছি। নগরকোট মন্দির একটা গোলক ধাঁধা। সেখানে রয়েছে বিশাল পাতাল কক্ষ। পাতাল কক্ষগুলো এতোটাই বিশাল যে, কোনো হাতিও যদি সেখানে হারিয়ে যায়, তাও খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে। তাছাড়া মন্দির ঘিরে রয়েছে বিশাল সেনা দুর্গ। বহু মানুষ সেখানে পূজা পাঠ করতে যায় বটে, কিন্তু সামুরাতিকে পণ্ডিতেরা কোথায় রেখেছে তা জানা সহজ ব্যাপার নয়।"

শুয়াইব আরমুগানীর শরীরে তখন যৌবনের দৃপ্ত তারুণ্য ঝিলিক দিয়ে উঠে। সে জানতো, সামুরাতি একটি মুসলিম মেয়ে। একজন মুসলিম তরুণী হিন্দুদের যুদ্ধ জয়ের জন্য বলীর শিকার হবে, তা মোটেও বরদাশত করতে পারছিলো না আরমুগানী। আরমুগানীর চোখে তখন ভেসে উঠলো সেই দৃশ্য, যখন কুকুর তাকে মারাত্মকভাবে আহত করার পর সামুরাতি তাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে নিজের হাতে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে দিচ্ছিলো। সামুরাতির এক হাতও কামড়ে দিয়েছিলো কুকুর। অনবরত ঝরেপরা আরমুগানীর রক্তের সাথে সামুরাতির

ক্ষতস্থান থেকেও যখন দু'ফোঁটা তাজা রক্ত বিছানায় পড়েছিলো, তখনই এই রক্ত দেখিয়ে সামুরাতিকে সে বলেছিলো, দেখো, তোমার আর আমার রক্তের মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই, যেনো একই রক্ত। সেদিন সামুরাতি তাকে বলেছিলো, আজ তুমি আমার রক্ত দেখিয়ে আমার মৃতপ্রায় বোধকে জাগিয়ে দিলে। এই রক্ত দেখে এখন আমি নিজের আত্মপরিচয় উপলব্ধি করতে পারছি।

দীর্ঘক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো আরমুগানী। সেই রাতের গোটা ঘটনা তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ভেসে উঠলো সামুরাতির হৃদয়ের আকুতি এবং মমতার পরশ। হঠাৎ সে বলে উঠলো, "পাথরের তৈরি মূর্তির কল্যাণে এক মুসলিম তরুণীর মৃত্যু হতে আমি কখনো দেবো না।" চকিতে বৃদ্ধার দিকে তাকিয়ে আরমুগানী বললো, "তুমি দাবী করো, সামুরাতিকে নিজের মেয়ের মতোই স্নেহ করো। তোমার হৃদয়ে তার জন্য রয়েছে মায়ের মমতা। যদি তাই মনে করো তাহলে তুমি কি তা প্রমাণ করতে পারবে? তুমি কি আমার সাথে নগরকোট যেতে পারবে? কারণ, আমি নগরকোটের পথ চিনি না। তুমি আমাকে নগরকোট নিয়ে চলো আর ভেতরের পরিবেশটা একটু বুঝিয়ে দিও। আমার বিশ্বাস সামুরাতি এখনও জীবিত আছে।"

"পথেই আমরা গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার আশংকা নেই কি?" বৃদ্ধা বললো।

"না। অন্তত পথের গ্রেফতারী আমরা এড়িয়ে যেতে পারবো। কারণ, আমরা ছদ্মবেশে যাবো।" আরমুগানী যারকার উদ্দেশে বললো, "তুমি এখানেই থাকো যারকা। আমি বেঁচে থাকলে অবশ্যই দেখা হবে।"

"আমিও যাবো তোমাদের সাথে।" দৃঢ়তার সাথে বললো যারকা। "আমি আর একাকী থাকতে পারবো না। যেখানে তুমি যাবে আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।"

পরিচারিকা আগেই জেনেছিলো আরমুগানী আর যারকা স্বামী-স্ত্রী। এ জন্য সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। সামুরাতির মৃত্যু আশংকা আর আরমুগানীর প্রতি তার অবদানের বিষয়টি আরমুগানীকে এতোটাই আবেগাপ্লুত করে ফেলেছিলো যে, সে ভুলেই গিয়েছিলো তার একান্ত প্রেয়সী দীর্ঘদিন পর তার একান্তই পাশে রয়েছে এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে তার একান্ত সান্নিধ্যের জন্য চলে এসেছে। আরমুগানীর ভাবান্তর অনুধাবন করে যারকা তার কাঁধে হাত রেখে মৃদু ঝাঁকুনি দেয়। যারকার দিকে তাকায় আরমুগানী।

"মনে হয় তুমি এখন পর্যন্ত আমাকে ধোঁকাই ভাবছো।" শ্লেষমাখা কণ্ঠে বললো যারকা। "একজন নর্তকীকে তুমি আমার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভাবছো এবং ওর জন্য পেরেশান হয়ে পড়েছো?"

"ওহ্ যারকা!" যারকার হাত ধরে বললো আরমুগানী। "এভাবে বলো না। সামুরাতি আমাকে আশ্রয় না দিলে আজ রাজার বন্দীশালায় আমাকে জীবন্ত লাশে পরিণত হতে হতো। তুমি জানো না, তুমি যেমন মুসলমান, সামুরাতি একজন মুসলিম তরুণী। আমি তোমাকে মোটেও অবিশ্বাস করছি না। ভাবছি, তোমাকে এখানে রেখে যেতেও মন চাচ্ছে না, আবার সাথে নিয়ে যাওয়ার সাহস পাচ্ছি না। এখানে রেখে গেলে মনে হয় না পুনর্বার ফিরে এসে আমার পক্ষে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হবে।"

"ছদ্মবেশে যেভাবে তুমি পরিচারিকাকে নিয়ে যাবে, সেভাবে আমাকেও তোমার সাথে নিয়ে চলো। অতীতের কৃত গুনাহর কাফফারা করার সুযোগটুকু আমাকে দাও।"

"যারকা! একটা বিষয় তোমার খেয়াল রাখতে হবে যে, সামুরাতির পরিচারিকাকে তুমি যে আমার স্ত্রী একথা আমি বলেছি বটে কিন্তু আমি যে গজনী সুলতানের গোয়েন্দা এ কথা কিন্তু বলিনি। আমার আরো দুই সাথীকে সঙ্গে নিতে হবে। আজ রাতে আমি ওদের সাথে দেখা করবো। আমি ওদের বলে-কয়ে আমাকে সহযোগিতা করার জন্য রাজি করাবো। তুমি এখন চলে যাও। সম্ভব হলে আগামীকাল সকালে একটু এদিকে এসো। তখন বলে দিতে পারবো, আমাদের যাত্রা কিভাবে হবে।"

যারকা তাকে জানালো, "সরকারীভাবে তোমাকে এখন আর খোঁজাখুঁজি করছে না। এ মুহূর্তে লাহোর অনেকটাই শান্ত। সেনাবাহিনী অভিযানে বেরিয়ে পড়েছে, ধর-পাকড়ও থেমে গেছে।"

আরমুগানীর দাড়ি তখন বেশ বড় হয়ে গেছে। এমনিতেই সে রূপ বদল করার বিস্ময়কর ক্ষমতা রাখতো। তাছাড়া বহু ধরনের আওয়াজ সে করতে পারতো। যারকাকে অনেকটা পথ এগিয়ে দিয়ে তার বন্ধুদের উদ্দেশে অন্যদিকে চলে গেলো আরমুগানী। তার মন-মানসিকতায় এখন সামুরাতির মুক্তিই প্রাধান্য বিস্তার করে আছে।

* * *

নগরকোটের পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের হৃদয়রাজ্যেও সামুরাতি প্রভাব সৃষ্টি করেছিলো। নারীর ব্যাপারে পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ ছিলো পাথর। পণ্ডিত নারীদের খুবই ঘৃণা করতো। বলতো, নারী একটা জীবন্ত যন্ত্রণা, সকল অঘটনের শিকড় এই নারী। নারীর মধ্যে এমন জাদু রয়েছে যদি তা কোনো পুরুষকে পেয়ে বসে

তাহলে সেই পুরুষের আর কোন কর্মশক্তি থাকে না। তখন মন্দ ছাড়া মঙ্গলের কিছু ভাবতেই পারে না নারী প্রভাবিত পুরুষ।

কিন্তু সামুরাতিকে বলী দেয়ার জন্য যখন পাহাড়ের উপর মন্দিরের গোপন কক্ষে নিয়ে গেলো এবং সামুরাতিকে বলীর কথা শোনালো, তখন সামুরাতি তার সাথে এমনসব আচরণ করছিলো, যেন পণ্ডিতের ভেতরকার কোনো এক শক্তি মোচড় দিয়ে ওঠে। সেই শক্তির উপস্থিতি এতোদিন পণ্ডিত অনুভব করেনি। অতঃপর ভোরবেলায় এসে সামুরাতিকে গঙ্গাতীরে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে পণ্ডিত নিজের শয়নকক্ষে চলে যায়। নিজের ভেতর পণ্ডিত এতোটাই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিলো যে, বিছানায় গা এলিয়ে দেয়া মাত্রই সে ঘুমিয়ে পড়তে পারতো। সে কখনো মানসিক অস্থিরতায়ও ভোগেনি কিন্তু এ রাতে পণ্ডিতের কি যে হলো, ঘুমানোর চেষ্টা করেও সে ঘুমাতে পারছিলো না। সামুরাতির অট্টহাসি আর শিশুর মতো গায়ের উপর লুটিয়ে পড়ার মতো আচরণ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো। সামুরাতির রেশম কোমল চুলের স্পর্শ যেনো তার অনুভবে শিহরণ খেলে যাচ্ছে। নারীর স্পর্শ, নারী দেহের উষ্ণতা ও গন্ধের সাথে তার পরিচয় ছিলো না। কিন্তু আজ নারীদেহের আকর্ষণ থেকে সে নিজেকে কিছুতেই মুক্ত করতে পারছিলো না।

সামুরাতির উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ তার কানে নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছিলো– "আপনি যদি আমাকে সেই ভালোবাসা দেন, যে ভালোবাসার জন্য আমার হৃদয় বহুদিন থেকে তৃষ্ণার্ত, তাহলে মনের আনন্দে আমি এমন নৃত্য করবো যে, পাথরের মূর্তিগুলোও আমার সাথে নাচতে শুরু করবে। লোকজন দূর-দূরান্ত থেকে নগরকোটের নর্তকীর নাচ দেখতে আসবে আর ভগবানের পূজা বাদ দিয়ে লোকজন নগরকোটের নর্তকীর পূজা করতে শুরু করবে।"

পণ্ডিত এতোটাই মোহাবিষ্ট হয়ে সামুরাতির কথা ভাবছিলো, যেনো সে রঙিন স্বপ্নে মেতে আছে। আর এরই মধ্যে কেউ তার শরীরে সুঁই ফুটিয়ে জাগিয়ে দিয়েছে। সে রাগে-ক্ষোভে ফুঁসতে লাগলো। এক লাফে বিছানা ছেড়ে দাঁড়ালো। তার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো যেনো। সে মনে মনে স্বগতোক্তি করলো– সামান্য একজন নর্তকী...? মুসলমান...? ম্লেচ্ছ পাপীষ্ঠা। জানা নেই কত পুরুষের সাথে মেলামেশার পাপ মাথায় নিয়ে বেড়াচ্ছে। ও করছে কৃষ্ণ ভগবানকে অপমান? কৃষ্ণ ভগবানের ক্রোধ সম্পর্কে জানে না হতভাগী। এ জন্যই দেব-দেবীকে পাথরের মূর্তি বলে!

নিজের হাতের তালুতেই প্রচণ্ড আঘাত করে পণ্ডিত। ক্ষোভে দাঁতে দাঁত পিষে স্বগতোক্তি করলো- ছিঃ ছিঃ ম্লেচ্ছের বাচ্চা ম্লেচ্ছ, আমার শরীর অপবিত্র করে দিয়েছে! আমি মিথ্যা বলিনি, নারীর শরীর পুরুষকে জানোয়ার বানিয়ে দেয়। পণ্ডিত নিজের অজান্তেই বিড় বিড় করতে লাগলো। সে যা ভাবছিলো তা কণ্ঠ দিয়ে সশব্দে বেরিয়ে আসছিলো- "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে পবিত্র করতে হবে। হয়তো বহু দিন লাগবে, তবুও ওকে পবিত্র করে ওর রক্ত দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পা ধুইয়ে দিতে হবে।"

দীর্ঘক্ষণ পর পণ্ডিতের দেমাগ সামুরাতির প্রভাবমুক্ত হলো। মধ্যরাতের পর পণ্ডিত গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলো। প্রতিদিনের অভ্যাস মতো ভোরেই পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের ঘুম ভেঙ্গে যায়। ভোরের আবছা অন্ধকারে উঁচু পাহাড়ী মন্দির থেকে নীচে নেমে ভজন গুনগুনিয়ে পণ্ডিত গঙ্গার একটি শাখা নদীর তীরে পৌঁছালো। নদীতে নেমে হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে দু'হাত পানি ছিটিয়ে ভজন জপতে জপতে পানিতে বসে পড়লো। হিন্দুরা আজো বিশ্বাস করে, গঙ্গা নদীর পানিতে স্নান করলে সকল পাপ ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়। ঠাণ্ডা পানিতে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার পর পণ্ডিত অনুভব করলো তার শরীরটা এখন জুড়িয়ে এসেছে। সারারাত সে শরীরে একটা জ্বালা অনুভব করেছে। সে অনুভব করলো নর্তকী সামুরাতি তার শরীরে যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলো, সে আগুন চিরদিনের জন্য নিভিয়ে দিয়েছে বলে মনে করছে।

ভজন ও গঙ্গা স্নান পণ্ডিতের মনে স্বস্তি এনে দিলো। এখন সে আগের পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের ভাবগাম্ভীর্য ফিরে পেলো। যে কারণে কোনো পূজারিণী নারীকেও পর্যন্ত কোনদিন তার শরীর স্পর্শ করতে দেয়নি রাধাকৃষ্ণ। রাতের অস্থিরতায় সামুরাতির প্রতি তার মনে যে ঘৃণা ও ক্ষাভ দানা বেঁধেছিলো, তাও তিরোহিত হয়ে গেলো। সে ভাবতে লাগলো, মাসুরাতির কোনো দোষ নেই, তাকে পাপ কাজে বাধ্য করা হয়েছে। তাই তো সে বলেছে, সে নির্ভেজাল প্রেমের কাঙালী। সে বলেছিলো, আমাকে কি গঙ্গা জলে বিধৌত অকৃত্রিম ভালোবাসা দিতে পারবে?

হ্যাঁ, তোমাকে আমি গঙ্গা জলে বিধৌত নির্ভেজাল প্রেম দেবো। স্বগতোক্তি করে রাধাকৃষ্ণ। আমি এ নর্তকীকে গঙ্গা জলে ধৌত করে অকৃত্রিম প্রেম দেবো। এরপর ওকে কৃষ্ণ দেবীর চরণে বলী দিয়ে বলতে পারবো যে, আমি এমন এক নারীকে বলী দিয়েছি যাকে আমি ভালোবাসি। অবশ্যই এই বলীদান দেবীর কাছে কবুল হবে। গজনী, বলখ, বোখারা, সমরকন্দ মহাভাতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

মন্দিরের শাখা ধ্বনি মাহমূদের প্রতিটি মসজিদে ধ্বনিত হবে। হিন্দু ধর্মের মহাবিজয় আর ইসলাম ধর্মের পতন ঘটবে।

গঙ্গা স্নান থেকে ফিরে এসে মন্দিরের যেখানে হিন্দু নারী-পুরুষ সকালের পূজা দিচ্ছিলো, মণ্ডিত সেখানে গেলো। সে ঘটি থেকে গঙ্গার পানি মূর্তির চরণে ছিটিয়ে দিয়ে হাত জোড় করে মূর্তিকে প্রণাম করলো।

অন্যদিনের চেয়ে সেদিন সকালে সময় বেশি নিয়ে পূজা-অর্চনা করতে লাগলো। সে যখন দেব-দেবীর সন্তুষ্টি বিধানে আত্মতুষ্টির মোহময়তা কাটিয়ে স্বাভাবিক হলো, তখন সেখানে আর কেউ নেই। নগরের লোকজন পূজা-অর্চনা শেষ করে সবাই যে যার মতো চলে গেছে।

পণ্ডিতের মনে পড়লো, আরে, এই নর্তকীকেও গঙ্গা জলে স্নান করানো উচিত ছিলো। কিন্তু ততোক্ষণে সূর্য উঠে চতুর্দিকে সকালের কিরণ ছড়িয়ে পড়েছে। সে কক্ষে এসে দেখলো, সামুরাতি এখনো গভীর ঘুমে অচেতন। সে সামুরাতির বিছানা থেকে দু'তিন কদম দূরে দাঁড়ালো। যেনো কোনো অদৃশ্য হাত তাকে ওখানেই থামিয়ে দিয়েছে।

সামুরাতি নিরুদ্বেগে ঘুমাচ্ছিলো। তার ঠোঁটে যেনো তখনও নিষ্পাপ শিশুর হাসি মেখেছিলো। দেখে মনে হচ্ছে, সে হয়তো রঙিন কোন স্বপ্ন দেখছে। বেলা অনেক উপরে ওঠে গেলেও সে নিশ্চিন্তে বেঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন। পণ্ডিত ভাবলো, পাপ তো মানুষকে স্বস্তি দেয় না! এই নর্তকী তো পূজা পাঠের ঘোরবিরোধী। ওর আত্মা কি পবিত্র? এটা কি ওর আত্মিক প্রশান্তি যে বলীদানের কথা শুনেও নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে?

ঘুমন্ত সামুরাতিকে দেখতে দেখতে পণ্ডিতের ভাবান্তর ঘটলো। ঘুমন্ত নর্তকীর চেহারায় সে কোন পাপ দেখছে না। ইত্যবসরে সামুরাতির ঘুম ভেঙ্গে গেলে পণ্ডিতের মনে হলো এ যেনো সদ্যভূমিষ্ঠ নিষ্পাপ কোনো শিশু, যে নিশ্চিন্তে মায়ের কোলে শুয়ে আছে। পণ্ডিত অনুভব করলো, নর্তকী আর তার মধ্যে যেনো একই রক্ত প্রবাহিত। পণ্ডিত সামুরাতির দিকে তাকিয়ে অতীতে হারিয়ে যায়। তার মনে পড়ে শৈশবের কথা। যখন এই তরুণীর মতোই সে বেঘোরে ঘুমাতো। ছোটবেলার দেখা সেই মায়ের চেহারা তার চোখে ভেসে ওঠে। অতীতের ভাবনা কাটিয়ে বাস্তবতা অনুভব করার জোর চেষ্টা করলো পণ্ডিত কিন্তু ভাবালুতা তাকে আরো বেশি আবিষ্ট করে ফেললো। তার মনে হতে লাগলো, তার মায়ের চেহারা যেন অবিকল সামুরাতির চেহারার মতোই ছিলো অমলিন নিষ্কলুষ।

কন্যা-জায়া-জননী– পণ্ডিতের হৃদয়ে এ তিন মমতার কাঁটা বিদ্ধ হতে শুরু করলো। হঠাৎ তার মধ্যে দেখা দিলো বিশাল শূন্যতা। নিজেকে বিরান ভূমিতে ভগ্নস্তূপের মতো মনে হতে লাগলো। জীবনের দীর্ঘ সময় কন্যা-জায়া-জননীর শূন্যতা পূরণের জন্য সে দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা করে পূরণ করতে চেয়েছে, কিন্তু আজ এই নর্তকী তার মধ্যে সেই শূন্যতাকেই প্রকট করে তুলেছে। মনে হচ্ছে তার এতোদিনের সাধনা নর্তকী গঙ্গাজলে ভাসিয়ে দিয়েছে। সে একটা পরিত্যক্ত উজার শ্মশান। নর্তকীর মধ্যে নারীর সকল রূপ-সৌন্দর্য, স্নেহ-মমতা জীবন্ত হয়ে উঠলে পণ্ডিতের হৃদয়ে শুরু হলো এক ধরনের হাহাকার। সামুরাতিকে স্পর্শ করার জন্য অধীর হয়ে উঠলো।

পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ যখন সামুরাতির আরো কাছে আসে তখন সামুরাতি চোখ খুলে। সে পণ্ডিতকে দেখে আড়মোড়া দেয় এবং হাই তুলে। পণ্ডিত জীবনে কখনো কোন নারীকে এতো কাছে থেকে ঘুম থেকে ওঠে হাই তুলতে দেখেনি। সামুরাতির হাইতোলা দেখে পণ্ডিতের মধ্যে এক ধরনের ঝড় সৃষ্টি হয়। এমন এক ভাবের সৃষ্টি হয় যা কখনো সে অনুভব করেনি। এক ধরনের মানসিক প্রশান্তি অনুভব করতে লাগলো। দেখা দিলো আত্ম-বিমোহিতা।

“ওহ্! কত বেলা হয়ে গেছে। গত রাতে আপনি আমাকে একাকী ফেলে কোথায় চলে গিয়েছিলেন?” সামুরাতি বললো।

“তুমি একাকী ভয় পাও?”

“ভয়? হেসে লুটিয়ে পড়লো সামুরাতি। ভয় তো একটা অনুভূতি। আমার অনুভূতি মরে গেছে। নারী পরপুরুষে ভয় পায় কিন্তু পরপুরুষের হাতের খেলার পুতুল নারীর কোনো ভয় থাকে না। যে পথিক একবার লুটেরা দ্বারা লুণ্ঠিত হয়, বাকি পথ সে নির্ভয়েই অতিক্রম করে। আমার এখন আর কোনো দস্যুর ভয় নেই।”

“তুমি যেভাবে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলে তা কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব যাদের আত্মা পবিত্র। কিন্তু একটা নর্তকী কিভাবে এতো প্রশান্তচিত্ত হতে পারে!”

“আমার শরীরে এখন শুধু রূহটাই আছে, যাকে আপনি আত্মা বলছেন। আমার শরীরটা পর হয়ে গেছে কিন্তু আত্মা আমার নিজের, এটা প্রকৃতপক্ষে শান্তই আছে।”

“কি! কিভাবে তা সম্ভব?”

“ধর্মীয় উন্মাদনায় অন্ধ ব্যক্তিরা আত্মার এই প্রশান্তির কথা বুঝতে পারে না। তারা একটাই শোর তোলে, প্রার্থনা করো আত্মার প্রশান্তি পাবে। জাগতিক

বোঝা হৃদয়ে না থাকলে আত্মা প্রশান্ত থাকে। মানসিকতার মধ্যে যদি সুচিন্তা কাজ করে তাহলে আত্মা শান্তি পায়...। এসব কথার কথা পণ্ডিত মশাই। আমি মানুষের পাপের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিয়েছি, যার দ্বারা আমি আত্মার প্রশান্তি পাচ্ছি।"

কথাগুলোতে হয়তো সামুরাতির জাদুকরী কৌশল ছিলো নয়তো তা ছিলো আত্মশক্তির প্রভাব। সামুরাতির বলার ভঙ্গিতে এতোটাই আত্মবিশ্বাস ছিলো যে, তার কথা শুনে পণ্ডিতের পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যায়। পণ্ডিতের মন-মানসিকতায় প্রভাব বিস্তার করে সামুরাতি। পণ্ডিতের দেমাগে এতোদিন পুষে রাখা পাপ-পুণ্যের সংজ্ঞা আর স্বর্গ-নরকের দর্শন এলোমেলো হয়ে গেলো।

খোলা কাঁধ। বিক্ষিপ্ত কেশরাজি। পণ্ডিত সাধনার এ দীর্ঘ জীবনে এই প্রথম অনুভব করলো নারীকে যন্ত্রণা বলা সহজ কিন্তু নারীর ফাঁদ থেকে নিজেকে রক্ষা করা ততোটা সহজ নয়। সামুরাতিকে এ অবস্থায় দেখে পণ্ডিতের হৃদয়রাজ্যে তোলপাড় শুরু হলো। মনের মধ্যে শুরু হলো যুদ্ধ।

"আরে আপনি একেবারে চুপ হয়ে আছেন যে?" স্মিত হেসে বললো সামুরাতি। "আপনি মহারাজা আনন্দ পালের কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে এনে একাকী ফেলে চলে গেছেন। আচ্ছা, রাতে আপনি কোথায় ছিলেন? আপনি না আমাকে পবিত্র করতে চান? পবিত্র করতেই আমাকে নিয়ে এসেছেন। আমাকে পবিত্র কবে করবেন?"

হঠাৎ হতচকিয়ে উঠলো পণ্ডিত। তার মুখ দিয়ে নিজের অজান্তেই বেরিয়ে পড়লো, "কৃষ্ণদেবীর চরণে তোমাকে বলী দেবো।"

কথাটা এমনভাবে বললো পণ্ডিত যেনো এমন সৌভাগ্য সবার কপালে জোটে না।

পণ্ডিতের কথায় সামুরাতির মধ্যে কোনো ভাবান্তর ঘটলো না। বলীদানের কথা শুনে বিস্মিতও হলো না। ঠোঁটের স্মিত হাসিও ম্লান হলো না।

কিন্তু মুখ ফসকে কথাটা বের হওয়ায় পণ্ডিত নিজেই বিস্মিত হলো, এ মুহূর্তে কথাটা বলা তার উচিত হয়নি। যাকে বলীদান করা হয়, তাকে কখনো বলীদানের কথা জানানো হয় না। বরং নেশা জাতীয় কিছু খাইয়ে ও কৌশল প্রয়োগ করে তার দেমাগে বিকৃতি সাধন করা হয়। তার চিন্তা-চেতনায় পণ্ডিতের মনোবাসনা আত্মপ্রবিষ্ট করা হয়। কিন্তু পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণকে সামুরাতির প্রভাব এতোটাই আবিষ্ট করে ফেলেছিলো যে পণ্ডিত নিজের নিয়ন্ত্রণ বিবেকের কব্জায় রাখতে ব্যর্থ হয়।

"আপনি আমার দেহকে বলী দিতে চান? কিন্তু এই শরীর তো আমার শরীর নয়। এটা যদি আমার দেহ মেনে নিই, তাহলে তা তো অনেক আগেই বলী হয়ে গেছে। দেখুন, আত্মাটা একান্তই আমার। আপনি এটিকে বলীদান করুন। অবশ্য আমার আত্মা আপনার কজায় যাবে না। আপনি কি কখনো কারো আত্মা কজা করেছেন অথবা আপনার আত্মার উপর কি অপর কারো কজা হয়েছিলো?"

এসব তাত্ত্বিক কথায় বোকার মতো সামুরাতির দিকে তাকিয়ে রইলো পণ্ডিত।

"আপনি সত্যিকার প্রেম-ভালোবাসার সাথে পরিচিত নন। কারণ, আমি আপনাদের সম্পর্কে মন্দিরগুলোর ভেতরে কি ঘটে তা জানি। এখানে সেইসব জিনিসকে পছন্দ করা হয় যেগুলো দৃশ্যত সুন্দর আর যেগুলোকে স্পর্শ করা যায়। এ জন্যই তো আপনারা সেই প্রভুকে বিশ্বাস করেন না, যে প্রভুকে দেখা যায় না। দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রভু আপনারা নিজের হাতে তৈরি করে নেন। আপনারা দেহকে বলী দিয়ে মনে করেন এসব মূর্তিকে খুশি করেছেন। এটাও বিশ্বাস করেন, এসব পাথরের মূর্তি আপনাদের সব আকঙ্ক্ষা পূর্ণ করে দেবে।"

"তুমি মুসলমান বলেই এ ধরনের কথা বলছো।"

"না, আমি কিছুই না। আমার কোনো ধর্ম নেই। আমি একটা তৃষ্ণার্ত আত্মা। আপনার আত্মাও তৃষ্ণার্ত। আমি পুরুষের চোখের দিকে তাকিয়ে তাদের মনের অবস্থা বলে দিতে পারি।" সামুরাতি একটি হাত এগিয়ে বললো, "আপনার হাত আমার হাতে রাখুন। দূরে বসে আছেন কেন? আমার কাছে আসুন।"

মূর্তির মতো বসে রইলো পণ্ডিত। সামুরাতি লাফিয়ে উঠে তার গা ঘেঁষে বসে। সামুরাতি দু'হাতে পণ্ডিতের চেহারা তালুবদ্ধ করে পণ্ডিতের চোখে চোখ রাখে। কেঁপে উঠলো পণ্ডিতের শরীর। সামুরাতির হাত তার চেহারা থেকে সরিয়ে তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে যায়।

কি যেনো বলতে চাচ্ছিলো কিন্তু পণ্ডিতের কথা জড়িয়ে যায়। জড়ানো কণ্ঠে পণ্ডিত বললো, 'তোমার জন্য কাপড় পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি স্নান করে নাও। ইতিমধ্যে তোমার খাবারও পৌঁছে যাবে।' এ কথা বলেই পণ্ডিত দ্রুত কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়।

পণ্ডিতের মনোভাব দেখে প্রচণ্ড হাসি পেলো সামুরাতির। শোয়াইব আরমুগানীর কথা তার মনে পড়লো। সে আরমুগানীকে বলেছিলো, তার উপস্থিতিতে আনন্দ পালকে কাঞ্জরের রাজা বলেছিলো, আমরা সুন্দরী মুসলিম

তরুণীদেরকে ধরে এনে বেশ্যাবৃত্তিতে লিপ্ত করি এবং তাদেরকে নৃত্যসংগীত ও বেহায়াপনায় উৎসাহিত করি। মুসলমানদের ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও তাদের বংশধারা বিনষ্টকরণে এর বিকল্প নেই। এ তৎপরতা অব্যাহত রাখলে এমন এক সময় আসবে যখন যেসব মুসলমান হিন্দু প্রধান এলাকায় বসবাস করবে, সম্ভ্রম বিক্রি ও নাচ-গান ছাড়া এদের জীবন-জীবিকার উপায় থাকবে না।

সামুরাতির মনে পড়লো, আরমুগানী তাকে বলেছিলো, মুসলমান তরুণীদের চরিত্রহীনতার শিকার সে নিজে। সে আরো বলেছিলো, গজনী থেকে এতো দূরে এসে মুসলমান যোদ্ধারা তোমাদের মতো মুসলিম তরুণীদের সম্ভ্রম বিক্রির কারণে শাহাদতবরণ করছে, জীবন বিলিয়ে দিচ্ছে। অথচ তারা তোমাদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আত্মত্যাগ করছে। আরমুগানী তাকে আরো বলেছিলো, সামুরাতি কাউকে বিয়ে করে বধূ হয়ে যাও, নিজের আত্মাকে শান্তি দাও, নিজের আত্মপরিচয় উপলব্ধি করো।

আরমুগানীর কথায় সামুরাতি আত্ম-পরিচয় ফিরে পেয়েছিলো। সামুরাতির হৃদয়পটে যখন আরমুগানীর চেহারা ভেসে উঠলো, তখন তার ভেতর একটা ঝড় বয়ে গেলো। আরমুগানীর প্রতিটি কথা তার কানে ধ্বনিত হতে লাগলো। তার যখন মনে পড়লো, আরমুগানী হয়তো যারকার সাক্ষাৎ পেয়েছে এবং তার সাথে বসবাস করছে। সে বুকের ভেতর একটা কষ্ট অনুভব করলো। আরমুগানীই ছিলো সামুরাতির জীবনের প্রথম পুরুষ যে তার আশ্রয় ও এক প্রকার বন্দীত্বে থেকেও তার মনকে ভীষণভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিলো।

সামুরাতির মধ্যে একটা দৃঢ় সংকল্প জন্ম নিলো, কিছুতেই হিন্দুদের মূর্তির জন্য সে নিজেকে বলী হতে দেবে না। সে বন্দীদশা থেকে পালানোর কথা ভাবতে লাগলো। এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি সে কখনো হয়নি। সে কোনো সৈনিক ছিলো না, ছিলো না কোনো নারীযোদ্ধা। এক অর্থে সামুরাতি ছিলো শাহজাদী। কারণ, রাজ-রাজন্যবর্গের হৃদয়রাজ্যে বিরাজ করতো সামুরাতি। বড় বড় রাজনৈতিক নেতা, ক্ষমতাবান পুরুষও তার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার আবেদন করতো। ফলে ফেরার হওয়ার বিষয়টি তার জন্য ছিলো একটা সুকঠিন কাজ। তাছাড়া এই দুর্গসম মন্দির থেকে পালানোর বিষয়টি সহজ ছিলো না। কিন্তু এরপরও মনে মনে সে পালিয়ে যাওয়ার দৃঢ়সংকল্প করলো।

বিছানা ছেড়ে উঠতে যাবে এমন সময় সামুরাতির কক্ষে প্রবেশ করলো দুই তরুণী। এদের একজনের হাতে কাপড় আর অপরজনের হাতে খাবার। তরুণী দু'জন যুবতী বটে কিন্তু সুন্দরী নয়। খাবার অবসরে সামুরাতি তরুণীদ্বয়কে

জিজ্ঞেস করলো, আমরা মন্দিরের সদর দরজা থেকে কতটুকু দূরে? তরুণীদ্বয় তার কথার জবাব না দিয়ে বললো, আমাদের কঠোরভাবে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে, আপনার সাথে যেনো কোনো অপ্রয়োজনীয় কথা না বলি। সামুরাতির কথার জবাব এড়িয়ে তরুণীদ্বয় তার পরিচয় জানতে চাইলো। আপনার পরিচয় কি?

"আমি নগরকোটের নর্তকী। বড় পণ্ডিতজী মশাই এ মন্দিরে নাচ-গান করার জন্য আমাকে এনেছেন।"

"মহারাজ আপনার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।" বললো এক তরুণী।

"কোন নারীর প্রতি এতোটা আগ্রহী হতে মহারাজকে আমরা কখনো দেখিনি।" বললো অপর তরুণী। "তিনি তো এর আগে কোন নারীর সাথে কথাই বলতেন না। কিন্তু আপনার ব্যাপারে তিনি এভাবে কথা বলছেন, মনে হয়েছে আপনি তার মেয়ে কিংবা বোন।"

"এটা মহারাজার অনুগ্রহ।" বললো সামুরাতি। "তিনি আমাকে সারা মন্দির দেখাবেন। এমনিতেই তোমাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, মন্দিরের সদর গেট এখান থেকে কোন্ দিকে?"

"আপনি তো সদর দরজা দিয়েই মন্দিরে এসেছিলেন।"

তরুণীরা সামুরাতিকে সদর দরজার কথা বললেও সে কিছুই আন্দাজ করতে পারলো না। তবে এটা বুঝতে পারলো, কোনো জানাশোনা লোকের পথ দেখানো ছাড়া তার পক্ষে সদর গেট পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়। সে তরুণীদের কাছে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করলো। তরুণীদ্বয় কিছু কিছুর জবাব দিলো, কোনো কোনো কথার জবাব এড়িয়ে গেলো। পণ্ডিত সম্পর্কে তরুণীরা তাকে জানায়, নারীর নাম নিতেও সে অপছন্দ করে।

এই তরুণীরা জানতো না এই নর্তকীকে বলীদানের জন্য আনা হয়েছে। তারা সামুরাতিকে গোসল করালো এবং তাদের নিয়ে আসা কাপড় পরিয়ে দিলো। কাপড়টি ছিলো শাড়ি। তরুণীদ্বয় সামুরাতির মাথায় তিলক পরিয়ে দিয়ে চলে যায়।

পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের একান্ত কক্ষে আরো দু'পণ্ডিত উপবিষ্ট। তারা জানতো, সামুরাতিকে বলীদানের জন্য আনা হয়েছে। সামুরাতিকে বলীদানের জন্য প্রস্তুত করা ছিলো তাদের কাজ। তারা প্রস্তুতি নিচ্ছিলো তাদের কাজ শুরু করার। বলে

রাখা ভালো, নগরকোট অঞ্চলে তখন চলছিলো ভয়ানক অভাব-অনটন। কারণ, দীর্ঘদিন থেকে এ অঞ্চলে বৃষ্টি হচ্ছিলো না। অথচ পাহাড়ী এলাকা হওয়ার কারণে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হতো। অনাবৃষ্টির কারণে খাদ্যাভাবে মানুষ ও গৃহপালিত পশু মরতে শুরু করে। অতঃপর পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের নির্দেশে এক কিশোরীকে বলীদান করা হয়। সেই তরুণীকেও এ কক্ষে রেখে বলীদানের জন্য দু'পণ্ডিতকে প্রস্তুত রাখা হয়েছিলো।

আগের মেয়েটি ছিলো অল্পবয়সী বালিকা। কিন্তু এ বালিকা নয়, যুবতী। সে রাজার একান্ত নর্তকী ছিলো। আগের তরুণী ছিলো পবিত্র। কিন্তু সামুরাতিকে আগে পবিত্র করতে হবে– সহকর্মী দু'পণ্ডিতকে রাধাকৃষ্ণ বলেছিলো। একেই বলী দেয়া হবে কিন্তু তৈরি করতে বেশ সময় লাগবে। এ হচ্ছে মুসলমান। একে পূজা-অর্চনার জন্য আগে মানসিকভাবে তৈরি করতে হবে। এরপর বলী দেয়ার ব্যাপারে ভাবতে হবে।

"আপনি জানেন মহারাজ! রাজা আনন্দ পালের নেতৃত্বে আমাদের সম্মিলিত সেনাবাহিনী অভিযানে বেরিয়ে পড়েছে। বলীদান তো যুদ্ধ শুরুর আগেই করা উচিত।" বললো এক পণ্ডিত।

"রণাঙ্গনে পৌঁছতে সেনাবাহিনীর অনেক দিন লাগবে।" বললো বড় পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ। "যে পরিমাণ সেনাবাহিনী অভিযানে গেছে, তারা মাহমূদ গজনবীর সেনাদের কচুকাটা করে গজনী পর্যন্ত চলে যাবে। আর যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত পৌঁছতে সেনাদের দু'তিন মাস সময় লেগে যাবে। এর মধ্যে আমাদের বলীদান কর্মও সমাধা হয়ে যাবে। আমরা এ সময়ের মধ্যে এ নর্তকীকে বলীদানের জন্য প্রস্তুত করে ফেলবো। আশা করি নিজের পক্ষ থেকেই নর্তকী দেবীর চরণে তাকে বলীদানের জন্য অনুরোধ করতে থাকবে।"

রাধাকৃষ্ণের সহকর্মী দুই পণ্ডিত বলীদানে বিলম্বের ব্যাপারে সম্মত হচ্ছিলো না, কিন্তু প্রধান পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ মনে মনে বলীদান মূলতবী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। সহযোগী দু'পণ্ডিতের বারংবার অসম্মতিতে বড় পণ্ডিতের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হলো। সে নির্দেশের স্বরে বললো, যে যাই বলুক, এই নর্তকী বলীদানে সে কারো কথাই শুনবে না। কারণ, নর্তকী বলীদানের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ তার একার। ওকে নির্বাচনও করেছে পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ নিজে। দেব-দেবীর ইঙ্গিতে যেহেতু সে এই নর্তকীকে বলীদানের জন্য বাছাই করেছে, তাই সে-ই ভালো জানে কখন কিভাবে ওকে বলীদান করতে হবে।

সহযোগী দুই পণ্ডিত যখন ওঠে চলে গেলো, তখন চিন্তার গভীরে তলিয়ে গেলো রাধাকৃষ্ণ।

* * *

এদিকে সামুরাতির বিস্ময়ের অবধি রইলো না। টানা তিন দিন তিন রাত চলে গেলো কিন্তু একবারও বড় পণ্ডিত তার কক্ষে এলো না। সেই দুই তরুণী তার জন্য খাবার নিয়ে আসে আর তার সব প্রয়োজন পূরণ করে। সামুরাতি তাদের অনেকবার বলেছে, তারা যেনো পণ্ডিতজী মহারাজকে একবারের জন্য হলেও তার কাছে পাঠায়। কিন্তু এরপরও পণ্ডিত আসেনি। নিজের প্রাণ সংহারের জন্য সামুরাতির কোনো দুঃখ ছিলো না, কিন্তু তার মনটা ভারী হয়ে উঠলো এ জন্য যে হিন্দুরা তাকে নর্তকীতে পরিণত করেছে, তার ধর্মীয় চেতনা বিনষ্ট করে দিয়েছে, তার সম্ভ্রম লুটেছে, শেষ পর্যন্ত হিন্দুদের বিজয়ের জন্য দেবীর পদতলে তার প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে।

সামুরাতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো, মাটি-পাথরের তৈরি মূর্তিগুলোর কোনো ক্ষমতা নেই, ওরা কিছুতেই মাবুদ হতে পারে না। জয়-পরাজয়ে মূর্তিগুলোর কোনো প্রভাব নেই। যিনি সত্য ও প্রকৃত মাবুদ, তার বিধান মতে নরবলী দান ও নিরপরাধ মানুষ হত্যা সম্পূর্ণ অন্যায়, গুনাহের কাজ। নরবলী নিতান্তই মিথ্যা ধর্মের অপরীতি।

সামুরাতির মনে পড়লো, কয়েক বছর আগে রাজা জয়পালের বিজয়ের জন্য লাহোরে এক তরুণীকে বলী দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু সেই যুদ্ধে রাজা এমন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিলো যে, রাজধানীতে ফিরে এসে সে জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দেয়।

মৃত্যুকে সামুরাতি ভয় করছিলো না কিন্তু পৌত্তলিকদের মূর্তির জন্য মোটেও মরতে চাচ্ছিলো না। আরমুগামী সামুরাতির আত্ম-পরিচয়কে ভীষণভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু মন্দিরের বন্দী দশা থেকে মুক্ত হওয়ার কোনো পথ তার দৃষ্টিতে পড়ছিলো না। সামুরাতি বিচলিত হচ্ছিলো এই ভেবে যে, যে কোনো সময় তাকে নিয়ে মূর্তির পদমূলে বলীদান করবে। সামুরাতি বহুবার শুনেছে মন্দিরের পণ্ডিতদের কোনো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে না। কিন্তু তার দেখাশোনাকারী দুই তরুণী বলেছে, পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের মধ্যে কোনো চারিত্রিক ত্রুটি নেই, সে প্রকৃত অর্থেই একজন সাধক পুরুষ, ঋষি। অনেকের মুখে সে আগেও শুনেছে, পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ শুধু ঋষিই নয়, সে একজন ব্রাহ্মচারী।

সামুরাতির মনে পড়লো প্রথম যে রাতে তাকে এখানে নিয়ে এসেছিলো, তখন তার কাছে মনে হয়েছিলো পণ্ডিত নিজে ভোগ করার জন্য তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। সে যখন এ ধরনের ইঙ্গিত করে তখন পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ তাকে বলেছিলো, "তোমার দেহ সৌন্দর্য আমার ভালো গেলেছে বটে কিন্তু যা ভেবেছো তা ভুল। আমার জীবন নারীভোগ থেকে পবিত্র। নারীসঙ্গ নেয়া দূরে থাক, নারীকে কাছে থেকে দেখাও আমি পছন্দ করি না।"

সামুরাতির মনে পড়লো, পণ্ডিত যখন তার সাথে কথা বলছিলো, তখন পণ্ডিতের চেহারার মধ্যে একটা উদাস ভাব সে দেখতে পেয়েছে। পুরুষের মনের কথা ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পারে সামুরাতি। তাছাড়া নিজের রূপ-সৌন্দর্য ও ভাবভঙ্গীর জাদুময়তা সম্পর্কেও পূর্ণ সচেতন। সামুরাতির মনের মধ্যে নতুন একটা চিন্তা উঁকি দিলো। সেই সাথে পালানোর একটা পথও বের করার কথা ভাবতে লাগলো। সে মনে মনে তার প্রকট নারীত্বের জাদুময়তাকে মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার ফন্দি আঁটলো। এটাই ছিলো সামুরাতির একমাত্র পুঁজি, যা দিয়ে কঠিন লোহাকেও সে মোমের মতো গলিয়ে দিতে সক্ষম।

নগরকোট মন্দিরে আসার চতুর্থ রাতের প্রথম প্রহর। পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ সামুরাতির কক্ষে এলো। সামুরাতির কক্ষে দু'টি প্রদীপ জ্বলছে আর সামুরাতি সারা কক্ষ জুড়ে পায়চারি করছে। পণ্ডিত তাকে দেখে স্থবির হয়ে যায়। সে সামুরাতিকে নৃত্যের পোশাকে প্রথম দেখেছিলো, সেই পোশাক ছিলো কৃত্রিম। তখন তার কাঁধ, গলা, বুক ও পিঠের ঊর্ধ্বাংশ ছিলো উন্মুক্ত। তার চেহারায় ছিলো কৃত্রিম প্রলেপ আর চুল ছিলো নাচিয়ের ঢংয়ে সাজানো, চোখে ছিলো কাজলমাখা। সেই পোশাকে ছিলো উগ্রতা কিন্তু এখনকার পোশাক সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখন সামুরাতি একান্তই অকৃত্রিম। সাজ-পোশাক ও চেহারায় কোনো কৃত্রিমতা নেই। অকৃত্রিম প্রাকৃতিক অবয়বে সামুরাতিকে এখন দেখতে পেলো পণ্ডিত। তার চেহারা ও কনুই উন্মুক্ত। এলোমেলো তার চুল আর চোখে নেই বাড়তি কাজল। অবিকল অকৃত্রিম অবয়বে সামুরাতিকে আরো বেশি মোহনীয় মনে হলো। পণ্ডিতের দৃষ্টিতে মনে হলো সামুরাতি মর্ত্যের নারী নয়, স্বর্গের অপ্সরা।

"আপনি কি আমাকে ভুলে গিয়েছিলেন মহারাজ?" পণ্ডিতের কাছ ঘেঁষে বললো সামুরাতি। "লোকে বলে জীবজন্তুকে জবাই করার আগে পানি পান করাতে হয়, আপনি কি আমাকে পান করাবেন না? আমার আত্মার তৃষ্ণা মিটাবেন না? আমাকে জবাই করার আগে যদি আমার মনের তৃষ্ণা না মিটান,

তাহলে এই মন্দিরে আমার আত্মা ঘুরে বেড়াবে। আমার আত্মা সর্বক্ষণ আপনাকে অস্থির করে রাখবে।"

পণ্ডিতের চোখে চোখ রেখে কথা বলছিলো সামুরাতি। তার চোখে-মুখে-চেহারায় ছিলো সেই জাদুকরী ভাষা যা সে কারো মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করতো। পণ্ডিত অনুভব করলো, তার শরীরে একটা কামোদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে। সামুরাতিকে নৃত্যের পোশাকে দেখে পণ্ডিতের মনে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হতো কিন্তু অকৃত্রিম পোশাকে মাথায় তিলক পরিহিতা সামুরাতির অঙ্গভঙ্গিতে নর্তকীর নির্লজ্জতা নেই। মেয়েটিকে এখন শান্ত সৌম্য কান্তিময় পূতঃপবিত্রা মনে হচ্ছিলো পণ্ডিতের কাছে। পণ্ডিত সামুরাতির কথায় উদাস মোহাচ্ছন্ন হয়ে যায়।

সামুরাতি পণ্ডিতের হাত ধরে তাকে বিছানায় বসতে অনুরোধ করে। কিন্তু পণ্ডিত বসলো না। সে কক্ষে পায়চারি করতে লাগলো। সামুরাতি নীরব দাঁড়িয়ে রইলো। পণ্ডিত দাঁড়িয়ে তাকে দেখলো এবং মাথা নীচু করে ফেললো, যেনো সামুরাতির মুখোমুখি হতে অপ্রস্তুত। কয়েক কদম পায়চারি করে দাঁড়িয়ে সামুরাতিকে কাছে ডাকে পণ্ডিত।

"আমি জানি, তুমি প্রেমের কাঙালিনী।" বললো পণ্ডিত। "আসলে তুমি স্নেহ-মমতা-ভালোবাসা বঞ্চিতা। তোমার ভালোবাসা প্রয়োজন। স্নেহ-মমতা ও প্রেম দরকার। বাবার আদর... ভাইয়ের স্নেহ... সন্তানের মমতা... অথবা তোমার চাই...?"

"হ্যাঁ, আপনি কি জানেন না, তৃষিত হৃদয় কোন্ ভালোবাসা চায়? আপনার কাছে কোন্ ভালোবাসা আছে?"

পণ্ডিতের চেহারার ভাব বদলে যেতে থাকে। তার চোখে আন্তরিকতা ভেসে ওঠে। সামুরাতি পণ্ডিতের কাঁধে তার বাজু রেখে নিজেকে পণ্ডিতের শরীরের সাথে এতোটাই মিশিয়ে দিলো যে সামুরাতির বুক পণ্ডিতের বুক স্পর্শ করে। সামুরাতির শ্বাস-প্রশ্বাসের ওঠানামা স্পষ্টই অনুভব করতে লাগলো পণ্ডিত। সামুরাতি পণ্ডিতকে বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করে কানে কানে বললো, 'আপনার কাছে আছে কি সেই ভালোবাসা, যে ভালোবাসার সাথে দেহের কোনো সম্পর্ক নেই, যে প্রেমে নেই কোনো পাপের গন্ধ?'

সামুরাতির তপ্ত নিঃশ্বাস পন্ডিতের নিঃশ্বাসের সাথে মিশে তাকে মোহাচ্ছন্ন করে তুলে।

"ঘাবড়ে যাবেন না সাধু! আপনি যে নারী থেকে পালিয়ে থাকেন, সেই নারী হয় শরীর সর্বস্ব, সে তো একটা জীবন্ত মূর্তি মাত্র। আমি কোনো মানব মূর্তি নই। দেহকে আমি ত্যাগ করেছি, আপনাকে হৃদয়ের ভালোবাসা দিচ্ছি আমি, আপনাকে আমার আত্মার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। এ আত্মা থেকে আপনার পালানোর দরকার নেই, এটাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।" বললো সামুরাতি।

অবচেতন হয়ে যাচ্ছিলো পণ্ডিত। সামুরাতি দু'হাতে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে নিলো পণ্ডিতকে। পণ্ডিত সামুরাতির জাদুকরী দৃষ্টির অদৃশ্য শিকলে বাঁধা পড়ে যায়।

"আমি জানি, আপনার আত্মাও তৃষ্ণার্ত। নারীর প্রেম-ভালোবাসার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আপনার ধারণা নেই। নারী অপবিত্রা হতে পারে কিন্তু তার ভালোবাসা অপবিত্র নয়।"

হঠাৎ করে পণ্ডিত সামুরাতির কাঁধে হাত রেখে সামুরাতিকে বুকের বেষ্টনী থেকে দূরে ঠেলে চোখে চোখ রেখে বললো– "আমি জানি না ভালোবাসা কেমন। আমি জানি না কোন্ প্রেম-ভালোবাসার কথা তুমি বলছো। আমার কোনো মেয়ে নেই, বোন নেই। মাকে দেখেছি ছোটবেলা। বিয়েও করিনি আমি। তুমিই আমাকে ভালোবাসা বোঝাও।"

"আপনার হৃদয়ে কি কোনো ধরনের তৃষ্ণা অভাববোধ অনুভব হচ্ছে না?" বললো সামুরাতি।

"আমার ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছে যুবতী।" উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো পণ্ডিত। "তুমি আমাকে আর জ্বালিও না।"

সামুরাতি গভীরভাবে পণ্ডিতের কথায় পরিবর্তন লক্ষ্য করলো, আগে পণ্ডিত কথায় কথায় 'আমাদের' শব্দ ব্যবহার করতো কিন্তু আজ 'আমার' শব্দ ব্যবহার করছে।

"আমাকে জবাই করার আগে ভালোবাসার স্বাদটুকু আপনি আস্বাদন করে নিন, নয়তো আমার দেহ জবাই হয়ে যাবে বটে কিন্তু আপনার আত্মার অপমৃত্যু ঘটবে।"

পণ্ডিতের মাথা গুলিয়ে গিয়েছিলো, সে মনের মধ্যে কোনোকিছুই গোছাতে পারছিলো না। কখনো সামুরাতির দিকে তাকাতো আবার কখনো মাথা নীচু করে কক্ষে পায়চারি করছিলো।

"কবে আমাকে বলী দেবেন পণ্ডিতজী মহারাজ!" চকিতে ঘুরে দাঁড়ালো পণ্ডিত। এভাবে কথাটি বললো যেনো তার মুখ ফসকে বেরিয়ে পড়েছে, "না না, এখনই নয়– তোমাকে এখনই বলী দেয়া হবে না।"

'আজ না হয় হবে না, কিন্তু কাল তো দেয়া হবে?' পণ্ডিত একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিড় বিড় করে বললো– "কাল আসতে বহু সময় বাকী। কে জানে কাল কি হবে!"

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো পণ্ডিত এবং দ্রুত কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলো। পণ্ডিতের কক্ষ ত্যাগের ভঙ্গি দেখে সামুরাতির হাসি পায়। সে পণ্ডিতের গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। সামুরাতির কক্ষ থেকে বেরিয়ে নিজের কক্ষে গিয়ে দরজা বন্ধ করে সরস্বতী মূর্তির সামনে হাতজোড় করে প্রণাম জানায়। সরস্বতী মূর্তি হাসছিলো। সরস্বতী মূর্তির আদলটা হাস্যোজ্জ্বল। পণ্ডিত জীবনে এই প্রথম সরস্বতী মূর্তির হাস্যোজ্জ্বল চেহারার দিকে গভীরভাবে তাকালো। তার মনে এক অস্থিরতা তোলপাড় করছে, যা সে বুঝে উঠতে পারছে না। জীবনের যতো দুঃখ-কষ্ট সবই ভজন-গুঞ্জনের ভাষায় পণ্ডিত এ সরস্বতী মূর্তির কাছে পেশ করতো। কিন্তু আজ তার কি যে হলো তা কিছুতেই ব্যক্ত করতে পারছে না।

হাস্যোজ্জ্বল সরস্বতী মূর্তির সামনে হাতজোড় করে ভজন গাইতে গাইতে মূর্তির অম্লান হাসির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললো পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ। সরস্বতী মূর্তির সামনে প্রার্থনা করে তার মনের জ্বালা দূর করার জন্য বসেছিলো পণ্ডিত কিন্তু আজ দীর্ঘক্ষণ ভজন-বন্দনা করেও মনের মধ্যে স্বস্তি পাচ্ছিলো না। মূর্তির হাস্যোজ্জ্বল চেহারা তার কাছে অপূর্ব মনে হচ্ছিলো। মূর্তির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক পর্যায়ে সরস্বতির মূর্তিটাই সামুরাতির অবয়ব ধারণ করলো। মূর্তির হাসিতে বিকশিত হলো সামুরাতির অকৃত্রিম অবয়ব। মনের অজান্তেই তার কণ্ঠে গীত হতে লাগলো ভজন সংগীত।

* * *

১০০৮ খৃস্টাব্দ মোতাবেক ৩৯৯ হিজরী সনের সেপ্টেম্বর মাস। প্লাবনের মতো হাজার হাজার হিন্দু সৈন্য পেশোয়ারের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের গতি তীব্র করা সম্ভব হচ্ছিলো না। কারণ, এ বাহিনীতে ছিলো কয়েকটি হিন্দু রাজ্যের সৈন্য। কঞ্জরের সেনাবাহিনী খিদরো এলাকায় শিবির স্থাপন করে। লাহোর থেকে যে বাহিনী যাত্রা শুরু করে, তন্মধ্যে রাজা আনন্দ পালের বাহিনী ছাড়াও উজান, গোয়ালিয়র, কনৌজের সৈন্যও ছিলো। এরই মধ্যে বিভিন্ন জায়গা থেকে আরো নতুন সেনাদল এদের সাথে এসে শামিল হচ্ছিলো। নতুন বাহিনীকে স্বাগত

জানানোর জন্য সম্মিলিত বাহিনী যাত্রাবিরতি করতো। সম্মিলিত বাহিনীর কমাণ্ডে ছিলো রাজা আনন্দ পালের ছেলে ব্রাহ্মপালের উপর ন্যস্ত। সে সৈন্যদের জড়ো করে তারপর একসাথে অগ্রসর হতে চাচ্ছিলো।

সম্মিলিত বাহিনীর গতি মন্থর হওয়ার অপর কারণ ছিলো নদী। সৈন্যরা নদী পার হয়ে গেলেও তাদের রসদ সামগ্রীর গাড়ি পার করা ছিলো কঠিন। সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা প্রায় লাখের কোঠায় পৌছে। অপরদিকে সুলতান মাহমূদের কাছে তখন সৈন্য ছিলো মাত্র হাজারের কোঠায়। বিশাল হিন্দু বাহিনীর নদী পার হতে কয়েক দিন লেগে যায়। বড় নদী ছাড়া আরো ছোট ছোট নদীও তাদের গতিপথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সম্মিলিত বাহিনীর গতি মন্থরতার অপর কারণ ছিলো জনগণের অতি উৎসাহ। মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোটা ভারতের মন্দিরগুলো থেকে এমন জোরদার প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে দেয়া হয় যে, গজনী বাহিনী গোটা হিন্দুস্তান দখল করতে ধেয়ে আসছে, ওরা সব হিন্দু মন্দির গুড়িয়ে দিয়ে মসজিদ বানাবে, সকল হিন্দু তরুণীকে ধরে বাদী-দাসীতে পরিণত করবে, সকল হিন্দুকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করবে। মন্দিরের এই অপপ্রচারে হিন্দুস্তান জুড়ে সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। লোকজন সেনাবাহিনীকে আশীর্বাদ জানানোর জন্য, তাদের আদর-আপ্যায়ন করার জন্য জড়ো হতে থাকে। এতে সেনাদের গতিতে মাঝে-মধ্যে ছেদ পড়ছে। সাধারণ হিন্দুরা তাদের সঞ্চিত সোনাদানা, খাবার-দাবার, উট-ঘোড়া সেনাদের উপঢৌকন দেয়ার জন্য খবর শুনে আগেভাগেই পথিমধ্যে জমা করে রাখতো। যেসব হিন্দু যুবক তীর-তরবারী ও বর্শা চালাতে পারতো, অশ্বারোহণে দক্ষতা রাখতো; তারা নিজেদের ঢাল-তরবারী ও অশ্ব নিয়ে সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত হতো। মন্দিরের ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতরা ধর্মের দোহাই দিয়ে হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করছিলো।

সম্মিলিত হিন্দু বাহিনী মহা-প্লাবনের মতো অগ্রসর হচ্ছিলো। প্রতিদিনই হিন্দু বাহিনীতে বৃদ্ধি পাচ্ছিলো সৈন্য সংখ্যা। সকল হিন্দু নাগরিক ও সৈন্যের মধ্যে একই শ্লোগান, একই আওয়াজ– মুসলমানদের পিষে ফেলো, ওদেরকে ভারত সাগরের ওপারে পাঠিয়ে দাও। ইসলামকে চিরদিনের জন্য হিন্দুস্তানের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করে দাও।

পেশোয়ারে অবস্থানরত সুলতান মাহমূদের কাছে প্রতিদিন খবর আসছিলো, হিন্দু বাহিনী কতটুকু অগ্রসর হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ওদের বাহিনীর সংখ্যা কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি তার সেনাপতিদের বলে দিয়েছিলেন, শত্রুবাহিনী

কিছুতেই যাতে নদী পার হতে না পারে। যুদ্ধ নদী তীরেই সংঘটিত হবে। তার সেনাপতিরা এই আশংকা প্রকাশ করেছিলো, যেহেতু শত্রুবাহিনী সংখ্যায় বিপুল, তাই পেছনে নদী রেখে মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়া আত্মঘাতী হতে পারে। কারণ, প্রয়োজনে পশ্চাদপসারণের সুযোগ তখন বিপদ শংকুল হয়ে উঠবে।

সুলতান মাহমূদ তাদের বললেন, আমাদের গেরিলা যুদ্ধ করতে হবে। সম্মুখ মোকাবেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর গেরিলা যুদ্ধের জন্য নদী তীরবর্তী এলাকাই সবচেয়ে উপযুক্ত। তিনি সেনাপতিদের বলেন, পেশোয়ারের নদী তীরবর্তী এলাকা অসমতল। এখানটা গেরিলা যুদ্ধের উপযোগী নয়। শত্রুবাহিনী এপাড়ে এসে গেলে সংখ্যাধিক্যের জোরে দু'চার ইউনিট সৈন্য হারিয়েও আমাদের ঘেরাও করতে সমর্থ হবে। আর ওপারে যদি ওরা আমাদের পিছু হটতে বাধ্যও করে, তবুও রিজার্ভ বাহিনী দিয়ে আমরা ওদের নদী পারাপার ঠেকিয়ে দিতে পারবো।

নিজ সেনাদের চেতনা, তাদের আবেগ, আদর্শিক দৃঢ়তা, নিজের রণ-পরিকল্পনা সর্বোপরি আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা ছিলো সুলতানের। তিনি অনেক আগেই মাঝি-মাল্লা ও মুটে-মজুরদের বেশে সিন্ধু তীরে কিছু সৈনিক মোতায়েন করে রেখেছিলেন। অপরদিকে কিছু ঝটিকা বাহিনীর সদস্য খিদরোতে মোতায়েন করেছিলেন। তাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো, শত্রুবাহিনীর আনাগোনা, গমনাগমন পর্যবেক্ষণ করবে এবং এরা যদি নদী পার হতে চায় তবে নদী পারাপারের জন্য তৈরি নৌকা-পুলের রশি কেটে দেবে। সম্ভব হলে নৌকা ছিদ্র করে দেবে।

গভীর চিন্তা-ভাবনার পর সুলতান তার বাহিনীকে যাত্রার নির্দেশ দিলেন এবং সিন্ধুকূলে এসে পৌছলেন। তিনি সেনাবাহিনীকে চার অংশে ভাগ করলেন। দুই অংশকে নদীর অপর পাড় আটকের উত্তর পাশে নিযুক্ত করলেন। আর দুই অংশকে নদীর এপাড়ে পেশোয়ার তীরে রাখলেন। এ পাড়ের দুই ভাগের একভাগ ছিলো অশ্বারোহী ও তীরন্দাজ। তাদেরকে নদী রক্ষার নির্দেশ দেয়া হলো। তাদের দায়িত্ব হলো নদীর তীরবর্তী এলাকাকে শত্রুমুক্ত রাখা এবং কিছুতেই যাতে শত্রুবাহিনী কোনদিক থেকে নদী পাড় হতে না পারে, তা নিশ্চিত করা। আর এপাড়ের অপর অংশটি ছিলো রিজার্ভ বাহিনী। সেই সাথে নদীতে একটি নৌকা-পুলও তৈরি করা হলো।

সেনাবাহিনীর অবস্থান ঠিক করতেই সুলতানের কাছে খবর এলো, শত্রুবাহিনী তাদের অবস্থান থেকে পনের মাইল কাছে এসে গেছে। এটাই ছিলো

শত্রুবাহিনীর শেষ ছাউনী। সুলতান আরো কিছু সময় চাচ্ছিলেন। তার একটু অবকাশের প্রয়োজন ছিলো। অবশ্য এ অবকাশ থেকে কোনো দিক থেকে সামরিক সহযোগিতা পাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো না। তখন শীতের মৌসুম শুরু হয়েছিলো। তিনি চাচ্ছিলেন যুদ্ধটা প্রচণ্ড শীতের মধ্যে টেনে নিতে। তার সেনারা প্রচণ্ড শীতেও লড়াই করতে অভ্যস্ত। কিন্তু কনৌজ ও গোয়ালিয়রের সেনাদের সম্পর্কে তিনি জানেন, ওরা অত্যধিক শীতে যুদ্ধ করতে অসুবিধা বোধ করে।

* * *

এদিকে নগরকোট মন্দিরে সামুরাতির প্রায় মাসখানেক কেটে গেছে। নর্তকী সামুরাতির কক্ষ ততোদিনে শাহজাদীর কক্ষে পরিণত হয়েছে। পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ সামুরাতির কক্ষে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্পগুজব করতো। পণ্ডিতের বর্তমান অবস্থা দেখলে কেউ বিশ্বাসই করতে পারত না, এই সেই পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ। রাধাকৃষ্ণের বয়স সামুরাতির বয়সের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো। পণ্ডিত সামুরাতির কক্ষে একটি পালঙ্ক নিয়ে এলো এবং এর মধ্যে গালিচা ও মখমলের বিছানা পাতার নির্দেশ দিলো। প্রদীপের পরিবর্তে সামুরাতির কক্ষে এলো রঙিন ফানুস, আর সেবিকা দুই তরুণী প্রতিদিন সকালে কক্ষ ঝাড়া-মোছা করে পুরনো ব্যবহার্য জিনিসপত্র সরিয়ে নতুন জিনিস ও নতুন ফুলের তোড়া দিয়ে যেতো।

অন্য পণ্ডিতরা ভেবেছিলো, তাদের গুরু সামুরাতিকে বলীদানের জন্য নিজেই বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করছে। কিন্তু পণ্ডিত সামুরাতির কক্ষে গিয়ে ভুলেই যেতো বলীদানের জন্য প্রস্তুত করার কথা। কিন্তু সামুরাতি কখনো বিস্মৃত হয়নি যে তাকে বলী দেয়া হবে। সে জানতো তাকে বলীদানের জন্যই প্রস্তুত করা হচ্ছে।

এতোদিন কখনো ভুলেও পণ্ডিত সামুরাতিকে স্পর্শ করেনি। কিন্তু যে পণ্ডিতকে কেউ কোনদিন হাসতে দেখেনি, এখন সে এ কারণে ও কারণে রীতিমতো হাসে। সামুরাতির কোনো কোনো কথায় সে সশব্দে হেসে ওঠে। ইতিমধ্যে সামুরাতি তাকে কয়েকবার বলেছে, তাকে যেনো শীঘ্রই বলী দিয়ে দেয়। কারণ, মৃত্যুর অপেক্ষা খুব কষ্টকর। সামুরাতির মুখে এ কথা শুনলে পণ্ডিতের চেহারা বিমর্ষ হয়ে যায়।

যে পণ্ডিত ভাবতো নারীর সংসর্গ ত্যাগ করে সে দেবতাদের সন্তুষ্ট করে নিয়েছে, সেই পণ্ডিত এখন দেবতাদের অসন্তুষ্ট করে সামুরাতিকে খুশি করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। নারী বঞ্চিত রেখে নিজের মধ্যে পণ্ডিত যে শূন্যতা সৃষ্টি করেছিলো, সেই শূন্যতা সামুরাতির মাধ্যমে পূর্ণতা পাচ্ছিলো। পিপাসার্ত মানুষ

পানি দেখলে যেমন তৃষ্ণার কষ্ট আরো বেশি অনুভব করে, তেমনি পণ্ডিতও সামুরাতির সান্নিধ্যে নিজের শূন্যতা আরো বেশি অনুভব করতে লাগলো। সে সামুরাতিকে কখনো নিজের কন্যা রূপে, কখনো বোনের অবয়বে, কখনো নিজের মায়ের রূপে অনুভব করতে লাগলো। এই মন্দিরে সামুরাতির চেয়ে আরো সুন্দরী তরুণীও এসেছে কিন্তু পণ্ডিত কখনো ওদের সাথে কথা বলার প্রয়োজনও অনুভব করেনি। দৈবক্রমে ওদের দিকে কখনো দৃষ্টি পড়ে গেলে সাথে সাথে সে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতো। সামুরাতিই ছিলো প্রথম নারী যার সাথে পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ কথা বলেছে এবং নিজের অজান্তেই সামুরাতি তাকে বুকে জড়িয়ে নেয়। সামুরাতির সেই স্পর্শ ও আলিঙ্গন পণ্ডিতের মধ্যে সেই অনুভূতি সৃষ্টি করে, যে অনুভূতির দ্বারা মানুষ নিজেকে অনুধাবন করতে পারে।

"তোমার আত্মা কি এখনো সেই শূন্যতা অনুভব করে যে ভালোবাসা পূরণের অনুরোধ তুমি আমাকে করেছিলে?" সামুরাতিকে জিজ্ঞেস করলো পণ্ডিত।

"সম্ভবত আপনিই প্রথম পুরুষ যে এতোদিন আমাকে নিজের আয়ত্তে রেখেও এভাবে রেখেছেন যেনো আমি আপনার কব্জায় থেকেও আপনার আয়ত্তের বাইরে।" বললো সামুরাতি। "আমার শরীরের প্রতি আপনার কোনো আকর্ষণ নেই। এতেই আমার আত্মা শান্তি পেয়েছে।... আচ্ছা, এখন কি দেবতার চরণে বলী হওয়ার যোগ্য আমি হতে পেরেছি?"

"না, এখনও সেই সময় আসেনি।" উদাস কণ্ঠে বললো পণ্ডিত।

পণ্ডিত গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামুরাতির দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে পণ্ডিতের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু পরতে শুরু করলো। সামুরাতি আগ বেড়ে পণ্ডিতের মাথা তার বুকে চেপে ধরলো। শাড়ির আঁচলে পণ্ডিতের চোখের পানি মুছে দিলো। তার ঝুঁকে থাকা মাথার এলোমেলো চুলগুলো পণ্ডিতের নাকে-মুখে ছড়িয়ে পড়লো। পণ্ডিতের একটি হাত কাঁপতে কাঁপতে উপরের দিকে উঠে এলো। সামুরাতির গাল পণ্ডিতের মাথা স্পর্শ করছিলো। কাঁপা কাঁপা হাতে পণ্ডিত সামুরাতির রেশমী কোমল চুল স্পর্শ করলো। কয়েকটি চুল নিজের চোখের উপর ছড়িয়ে দিলো পণ্ডিত।

হঠাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় পণ্ডিত। ঘটনার আকস্মিকতায় ভড়কে গেলো সামুরাতি। উঠে চোখ বড় বড় করে পণ্ডিত সামুরাতিকে দেখতে লাগলো। যেনো তার আত্ম-পরিচয়কে জাগিয়ে দিয়েছে কেউ। যেনো কোনো অশরীরী আত্মা এসে তার হাতকে নারীর চুলে স্পর্শ করিয়েছে।

মন্দিরের ঘণ্টা ধ্বনি বাজতে লাগলো। সমূর্তিতে ফিরে এলো পণ্ডিত। কোনো রাজা-মহারাজা মন্দিরে এলেই কেবল এই ঘণ্টা ধ্বনিত হয়। পণ্ডিত নিজে মন্দিরের সদর দরজায় গিয়ে আগন্তুক রাজা-মহারাজাকে অভ্যর্থনা জানায়। সামুরাতির দিকে গভীর মমতার দৃষ্টি মেলে পণ্ডিত বললো, "হয়তো কোনো মেহমান এসেছে, আমি আসছি।"

বিশেষ ঘণ্টা ধ্বনি অমূলক ছিলো না। রাজা আনন্দ পালের স্ত্রী এলো নগরকোট মন্দিরে। এই স্ত্রী হলো আনন্দ পালের অপর পুত্র ব্রাহ্মপালের মা। আনন্দ পাল সম্মিলিত বাহিনীর সাথে থাকলেও গোটা বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ড ছিলো ব্রাহ্মপালের হাতে। রাজা আনন্দ পাল তার এই স্ত্রীকে বলেছিলো, রাজমহলের সবচেয়ে সুন্দরী ও অভিজ্ঞ নর্তকীকে নগরকোটের পণ্ডিত বলীদানের জন্য রেখে দিয়েছে। রাজা আরো বলেছে, এবার ব্রাহ্মপালের নেতৃত্বে সম্মিলিত বাহিনী বিজয়ী হবেই হবে।

এর আগে আনন্দ পালের অপর স্ত্রী শুকপালের মা এই ভেবে ছেলেকে বিদ্রোহে উস্কানি দিয়েছিলো যে, শুকপাল বিদ্রোহ করে বেরায় সুলতান মাহমূদকে বন্দী করতে পারবে। আর শুকপাল হবে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। কিন্তু পরিণতিতে শুকপাল নিজেই বন্দী হলো আর সুলতান তাকে আজীবনের জন্য বন্দী করে জেলখানায় আটকে রাখলো।

এখন আনন্দ পালের দ্বিতীয় স্ত্রী ভাবলো, তার ছেলে পেশোয়ার জয় করে গজনী পদানত করবে এবং বাপের সিংহাসনের উত্তাধিকারী হবে। সে পুত্রের বিজয়ের জন্য উন্মুখ ছিলো। তাই নগরকোটে নর্তকীর বলীদান পর্ব সমাধান হয়েছে কিনা তা জানার জন্য রাণী এখানে এসেছে।

বড় পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ রাজা আনন্দ পালের স্ত্রীকে জানায়, মুসলমান ঘরের মেয়ে এবং নর্তকী হওয়ার কারণে মেয়েটিকে পবিত্র করে বলীদানের উপযোগী করতে অনেক সময় লেগে গেছে।

ব্রাহ্মপালের মা বললো, "এর আগেও এক কুমারী মেয়েকে বলী দেয়া হয়েছে। কিন্তু তাকে প্রস্তুত করতে এতো সময় লাগেনি!" সে পণ্ডিতকে তাকিদ করলো, শীঘ্রই যেনো বলীদান কাজ সেরে ফেলা হয়। কারণ, আমাদের সৈন্যরা রণাঙ্গনের একেবারে কাছে চলে গেছে অথচ সে জানতে পেরেছে, নর্তকীকে নাকি এখনো মা গঙ্গার জলে স্নানও করানো হয়নি।

পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণের মর্যাদা ছিলো রাজা-মহারাজাদের চেয়েও বেশি। হিন্দুস্তানে তাকে ভগবানের বিশেষ দূত মনে করা হতো। কিন্তু আনন্দ পালের

স্ত্রীর আশংকা ও উষ্মায় পণ্ডিতের আভিজাত্য ও অহংবোধে আঘাত হানে। রাণী আরো বললো, "নর্তকী সামুরাতি এতোটাই সুন্দরী যে ওকে কেউ দেখলে আর চোখ ফেরাতে পারে না। জানি না, ওর এই জাদুময়তা নগরকোট মন্দিরেও প্রভাব সৃষ্টি করেছে কিনা। আমার সন্দেহ হচ্ছে, নর্তকীর জাদু এখানেও প্রভাব বিস্তার করেছে। নর্তকীর বলীদান কর্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি মন্দিরেই অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।"

পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ এ কথার পরও আনন্দ পালের স্ত্রীকে কিছুই বললো না। কারণ, তার সন্দেহ অমূলক ছিলো না। পণ্ডিত আনন্দ পালের স্ত্রীকে জানালো, "এই একটি কাজই বাকি রয়েছে, এ কাজ আগামীকাল সকালেই সমাধা হবে। তার পরদিন নর্তকীর বলীদান কর্ম সেরে ফেলা হবে।"

রাজা আনন্দ পালের স্ত্রী এ কথার পর শাহী মেহমানখানায় চলে যায়। পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ আবার ফিরে আসে সামুরাতির কক্ষে। সামুরাতি স্মিত হেসে তাকে অভ্যর্থনা জানায়। পণ্ডিতের চেহারা ছিলো উদ্বিগ্ন। সে নিষ্পলক সামুরাতির দিকে তাকিয়ে রইলো। সামুরাতি তার উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ জিজ্ঞেস করলে পণ্ডিত জানালো, "সে আগামীকাল ভোরে আসবে এবং তাকে নিয়ে গঙ্গা তীরে যাবে।" এ কথা বলেই কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেলো পণ্ডিত।

* * *

এদিকে শুয়াইব আরমুগানীর কাফেলা সামুরাতির সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে। দু'টি উট ও তিনটি ঘোড়ার ছোট কাফেলা। একটি উটে এক যুবতী আর অপর উটে এক অর্ধবয়স্কা মহিলা আরোহী। আর তিনটি ঘোড়ায় তিনজন পুরুষ। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হবে এরা তীর্থযাত্রী, একটি কুকুরও এই কাফেলার সহযাত্রী। সেই যুগে দূর ভ্রমণযাত্রী কাফেলার সাথে প্রশিক্ষিত কুকুর নেয়া হতো নিরাপত্তার সহায়ক হিসেবে। লাহোর থেকে রওয়ানা হয়ে নগরকোটের দিকে যাচ্ছে কাফেলা। রাস্তায় তাদের কেউ জিজ্ঞেস করলে তারা জানিয়েছে, পূজাপাঠের জন্য তারা নগরকোট মন্দিরে যাচ্ছে। টানা তিন দিন চলার পর আরমুগানীর ছদ্মবেশী এই কাফেলা নগরকোট মন্দিরের কাছে চলে আসে। নগরকোট মন্দিরের নিকটবর্তী হয়ে তারা লোকজনকে বলে, তারা মহাঋষি রাধাকৃষ্ণের দর্শনের জন্য, তার পদধূলি নেয়ার জন্য নগরকোট এসেছে। কারণ, নগরকোটের আশপাশের লোকেরো পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণকে অবতার বলেই মনে করে।

নগরকোটের অনতিদূরে আরমুগানীর কাফেলা শেষ রাত যাপনের জন্য যাত্রাবিরতি করে। রাতের বেলা আগুন জ্বালিয়ে আগুনের চারপাশে বসে কাফেলার একজন বললো, "আমরা যদি মন্দিরে প্রবেশ করতে পারি আর আমাদের কেউ সন্দেহ না করে, তাহলে মন্দিরের কোথায় কি আছে তা জানা সম্ভব হবে। যদি জানতে পারি, সামুরাতিকে বলী দেয়া হয়ে গেছে, তাহলে আমি নগরকোটের সব পণ্ডিতকে হত্যা করে ক্ষ্যান্ত হবো।"

এই দৃঢ়তা ও প্রতিজ্ঞা আর কারো নয়, শুয়াইব আরমুগানীর। কারণ, মন্দিরের আচার অনুষ্ঠান সে জানতো। লাহোর থেকে আরো দু'জন সহকর্মীকেও সে সাথে করে নিয়ে আসে। যারকা আগেই সামুরাতির বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিলো। সামুরাতির পরিচারিকা তো পূর্ব থেকেই প্রস্তুত ছিলো। আরমুগানী ও তার দু'সহকর্মী মাথা ন্যাড়া করে হিন্দু পুরোহিতদের মতো মাথায় তিলক পরেছিলো। গোঁফ পরিষ্কার করে এমন কৃত্রিম গোঁফ মুখে লাগিয়ে নিয়েছিলো যে, তাদের ঠোঁট দেখাই যাচ্ছিলো না। পরিচারিকা ও যারকাকেও হিন্দু সন্ন্যাসীদের মতো পোশাকে সজ্জিত করা হয়েছিলো। মহিলা দু'জন শরীরে লম্বা দানাওয়ালা দস্তানা ঝুলিয়ে দিলো।

উট ও ঘোড়ার ব্যবস্থা শুয়াইব আরমুগানীর সহকর্মীরা করেছিলো। কুকুর সাথে নেয়ার বায়না ধরেছিলো পরিচারিকা। কারণ, ওখানে গেলে সামুরাতির অতি যত্নে পোষা কুকুরের দেখাশোনা করার কেউ ছিলো না। সামুরাতি এই কুকুরকে খুবই যত্ন করতো। অবসরে কুকুরের সাথে খেলা করতো সামুরাতি আর রাতের বেলা তার বাড়ি পাহারা দিতো এই দুর্ধর্ষ কুকুর। অবশ্য পথে এমন একটি কুকুর সাথে রাখার প্রয়োজনও ছিলো।

শেষ মঞ্জিলে রাত যাপনের অবসরে তারা সামুরাতিকে উদ্ধারের পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলছিলো। তারা এটাই ভাবলো, এ ধরনের অপারেশন শেষ করে জীবন নিয়ে ফিরে আসা খুবই কঠিন। যারকা ও বৃদ্ধা পরিচারিকা দায়িত্ব নিলো, সামুরাতি যদি জীবিত থেকে থাকে তবে তারা তাকে উদ্ধার করবেই করবে।

বিশাল মন্দিরে ছিলো প্রায় কুড়িটি বড় বড় কক্ষ। ছিলো ছোট ছোট আরো বহু খিলান। তা ছাড়াও রয়েছে বিশালাকার পাতাল সুড়ং। সুড়ঙের সিঁড়িগুলো অন্ধকার। সামুরাতিকে এসব অন্ধ গলি থেকে বের করে আনার ব্যাপারটি জীবন বাজি রাখারই নামান্তর। বৃদ্ধা পরিচারিকা মন্দিরের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে তাদের অবহিত করলো। তাছাড়া সবচেয়ে বেশি আশংকার কারণ ছিলো, মন্দিরের চারপাশ ঘিরে রাখা দুর্গসম সেনা ছাউনী।

আরমুগানী ও আরমুগানীর দু'সহযোগী খঞ্জর ও ছোট তরবারী তাদের পরিধেয় কাপড়ের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিলো। রাতের শেষ প্রহরে তাদের এই ছোট্ট কাফেলা মন্দিরের দিকে রওয়ানা হলো। বৃদ্ধা পরিচারিকা কাফেলাকে পথ দেখাচ্ছে। রাতের অন্ধকার থাকতেই তারা মন্দিরের প্রধান ফটকে পৌঁছে যেতে চায়।

এই রাতটিই ছিলো সেই রাত, যে রাতে পণ্ডিত রাধাকৃষ্ণ সামুরাতিকে বলেছিলো, খুব ভোরে এসে গঙ্গাস্নান করানোর জন্য তাকে গঙ্গাতীরে নিয়ে যাবে। খুব ভোরে পণ্ডিত যখন সামুরাতির কক্ষে উপস্থিত হলো, সামুরাতি তখনো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। পণ্ডিত তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুললো। বললো, 'তোমাকে আমার সাথে যেতে হবে।' সামুরাতি নীরবে পণ্ডিতের সাথে রওয়ানা হলো। মন্দির থেকে বের হলে তাদের জন্য দুর্গের প্রধান ফটক খুলে দেয়া হলো। দুর্গের বাইরে এসে তারা পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নীচে নামতে শুরু করলো। পাহাড়ের ঢালু বেয়ে ওঠানামা পণ্ডিতের জন্য কোনো মুশকিলের ব্যাপার ছিলো না। কারণ, তার এ পথ খুবই চেনা। কিন্তু সামুরাতির জন্য নীচে নামা ছিলো কঠিন। কারণ, ঘোড়াগাড়িতে যাতায়াত করে সে অভ্যস্ত। তার পক্ষে পায়ে হেঁটে পাহাড়ের নীচে নামার ঘটনা কখনো ঘটেনি। তাছাড়া তাকে যে চপ্পল দেয়া হয়েছিলো, তা পায়ে দিয়ে হাঁটা তার জন্য ছিলো আরো মুশকিল। পাহাড় থেকে নীচে নামার সময় বারবার সামুরাতির পা পিচলে যাচ্ছিলো। পণ্ডিত তাকে ধরে সহযোগিতা করছিলো, যার ফলে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পাচ্ছিলো সামুরাতি। পণ্ডিতকে এক হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে রেখেছিলো সামুরাতি। পণ্ডিতও নিজেকে সামলানোর জন্য একহাতে সামুরাতিকে ঝাপটে রাখলো। তারপরও যখন বারবার সামুরাতি হোঁচট খাচ্ছিলো, তখন পণ্ডিত অনেকটা সামুরাতিকে তার কাঁধেই আগলে নিয়ে নীচে নামতে শুরু করলো। মওসুম ছিলো শীতের। সামুরাতি ছোট হয়ে পণ্ডিতের শরীরের সাথে নিজেকে জড়িয়ে রাখে।

অনেক কষ্টে তারা পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নীচে নেমে নদী তীরের দিকে রওয়ানা হয়। মন্দির নদীতীর থেকে বেশ দূরে। উপরের পাহাড় চূড়ায় মন্দির আর নীচের নদী তীরবর্তী এলাকা জঙ্গলাকীর্ণ। পণ্ডিত সামুরাতিকে তার বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করেনি। পরস্পর জড়াজড়ি করেই তারা নদীর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। তখনো পূবাকাশে ভোরের লালিমা দেখা দিতে অনেক দেরী। ভোর হতেই লোকজন গঙ্গাতীরে আসতে শুরু করবে। এ জন্য পণ্ডিত অন্ধকার থাকতেই সামুরাতিকে নিয়ে গঙ্গাতীরের দিকে ছুটলো। যাতে অন্ধকারে মাসুরাতিকে সে লুকিয়ে রাখতে পারে।

“আপনি কি আমাকে শেষ গোসল দেয়ার জন্য নিয়ে যাচ্ছেন?” জানতে চাইলো সামুরাতি।

পণ্ডিত তার হাতের বন্ধনে সামুরাতিকে আরো বেশি করে নিজের শরীরের সাথে লেপ্টে নেয়ার চেষ্টা ছাড়া কোনো জবাব দেয় না। মনে হচ্ছিলো, পণ্ডিত বুঝি তাকে নিজের শরীরের সাথে পিষে ফেলবে।

“আপনি কথা বলছেন না কেন? আমাকে আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? আমাকে আজই যদি মরতে হয় তাহলে বলেই দিন না?”

“হ্যাঁ, সবই বলবো সামুরাতি।” দু'হাতে বুকের সাথে সামুরাতিকে চেপে ধরে বললো পণ্ডিত। “আমার মন বলছে শুধু তুমি একা নও, আমরা উভয়েই বলী হয়ে যাচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে, আমার হয়তো আজকের সূর্য আর দেখা হবে না।” আওয়াজ জড়িয়ে এলো পণ্ডিতের। জড়ানো কণ্ঠে বললো, “হয়তো এটাই জীবনের শেষ সময়। আমাকে পিপাসা নিয়ে মরতে দিও না। আমি ভেবেছিলাম, আমার হৃদয়ের আবেগ-ভালোবাসা মরে গেছে। কিন্তু না, আমার হৃদয়ের আবেগ মরেনি। আমি তোমার মধ্যে মমতাময়ী নারীর ছবি আঁকতে চেয়েছি– তোমাকে মেয়েরূপে, বোনরূপে, মায়ের অবয়বে চিত্রিত করতে চেয়েছি। দেবীর চরিত্রও তামার মধ্যে আমি চিত্রিত করতে চেয়েছি। কিন্তু কোনোটিই স্থিতি পায়নি। আমি তোমার মধ্যে দেবীর হাসিও দেখেছি কিন্তু তবুও আমার পাপীমনকে বোঝাতে পারিনি। আমি বুঝতে পারি না, এমন কেনো হলো। নারীর সঙ্গ থেকে আমি পালাতে বহু চেষ্টা করেছি কিন্তু... ।”

“আপনি পাথরের মূর্তির পূজা করেন। আমার আল্লাহর ইবাদত করুন, দেখবেন মন থেকে সব পাপ দূর হয়ে যাবে।” বললো সামুরাতি।

“আমাকে আর কথার প্যাঁচে জড়িও না নর্তকী। আমি তোমাকে হৃদয়ের প্রেম দিয়েছি। এর বিনিময়ে তুমি আমাকে দেহের উষ্ণতা দিয়ে তৃপ্ত করো। আজ হয়তো তোমার জীবনের শেষ দিন। এরপর তোমার দেহকে জ্বালিয়ে দেয়া হবে কিন্তু আমি তো বেঁচে থেকেও জ্বলন্ত আগুনে পুড়ে ভস্ম হচ্ছি।”

সামুরাতি হাসিতে ভেঙ্গে পড়লো এবং নিজেকে হঠাৎ করে পণ্ডিতের বাহুবন্ধন থেকে দূরে সরিয়ে নিলো। “শোনো! তোমার কৃষ্ণদেবী যদি সত্য হতো, তাহলে তোমার পঞ্চাশ বছরের প্রার্থনাকে এভাবে পাপে ভেসে যেতে দিতো না। আমি স্বাধীন। আমি জানতাম, তুমিও কোনো একদিন ওদের মতোই আমাকে চাইবে পাপীষ্ঠ পুরুষগুলো আমাকে যেভাবে পেতে চায়। আমি এ জন্যই তোমার মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা সেই পাশবিকতাকে উস্কে দিয়েছি, যেন তুমি যন্ত্রণায়

কাতর হয়ে আমার পায়ে এসে পড়ো। আমি তোমাকে ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো আমার পিছু পিছু মন্দিরের বাইরে নিয়ে আসবো এবং তোমার বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে যাবো।... হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি এখন স্বাধীন, আমি এখন মুক্ত।"

সামুরাতি হঠাৎ করে একদিকে দৌড়াতে লাগলো। কিন্তু অসমতল জমিনে সে বেশি দূর এগুতে পারলো না। পণ্ডিত দৌড়ে ওকে ধরে ফেললো এবং বললো, "পাগলামী করো না নর্তকী। আমার কাছ থেকে পালিয়ে তুমি কোথায় যাবে? আমি ঠিকই তোমাকে ধরিয়ে আনবো এবং বলী দিয়ে দেবো। আমি তো তোমার কাছে তেমন দামী জিনিস চাচ্ছি না।"

সামুরাতি গায়ের সব শক্তি দিয়ে পণ্ডিতের গালে থাপ্পর মেরে বললো, "আমি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরে যাবো কিন্তু তোমার মূর্তির জন্য মরতে পারবো না।"

"তোমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না নর্তকী। মূর্তির অপমান করো না।"

"আমার আল্লাহ্ আমাকে বাঁচাবে। আমার আল্লাহ্ যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তোমাদের একটা মূর্তিও অটুট থাকবে না।"

পণ্ডিতের ভেতরকার পৌরুষরূপী পশুটা ক্ষুধার্ত বাঘের মতো বেপরোয়া হয়ে উঠলো। যে প্রবৃত্তিকে হিমালয়ের পাদদেশে হত্যা করে এসেছিলো বলে মনে করেছিলো, পণ্ডিতকে তা আজ মাংসখেকো হিংস্র শৃগালে পরিণত করলো।

হঠাৎ অনতিদূরে একটা কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শোনা যায়। দেখতে দেখতে কুকুরের ডাক নিকটবর্তী হতে থাকে।

যে সময় উপরের পাহাড় থেকে নীচে নেমে পণ্ডিত সামুরাতিকে নিজের বুকে জড়িয়ে নিয়েছিলো, ঠিক সে সময় শুয়াইব আরমুগানীর ছোট কাফেলা মন্দিরে যাওয়ার জন্য পাহাড়ী পথের শুরুটায় এসে পৌছে। সামুরাতির পরিচারিকা এই পথ ভালোভাবেই চেনে। এখানেই উট ও ঘোড়া তাদের ছেড়ে দিতে হবে। সামুরাতির কুকুরটি ছিলো বন্ধনমুক্ত। কুকুর হঠাৎ জমিন শুঁকে দু'পায়ে মাটি আচড়াতে থাকে এবং ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে শুরু করে। সেই সাথে ওই পথেই কুকুরটি দৌড়াতে লাগলো যে পথে পণ্ডিত সামুরাতিকে নিয়ে গঙ্গাতীরের দিকে গিয়েছিলো। কাফেলার কেউ এদিকে তেমন খেয়াল করেনি। কারণ, কুকুর এমনটা করেই থাকে। কিন্তু কুকুর উচ্চ আওয়াজে ঘেউ ঘেউ করে সামনের দিকে দৌড়াতে থাকে। সামুরাতির সেবিকা বললো, মনে হয় কুকুর কোনো শিয়াল বা বনবিড়ালের গন্ধ পেয়েছে। তাদের কারো পক্ষে ঘুণাক্ষরেও ভাবার অবকাশ ছিলো না, কুকুর তার মালিকের গন্ধ পেয়ে দৌড়াচ্ছে। মাসাধিক সময় ধরে সামুরাতির সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন। কুকুরটি সামুরাতির এতোটাই প্রিয় ছিলো

যে, শিশুর মতো সে কুকুরের সাথে খেলা করতো। কুকুর বিছানায় ওঠে সামুরাতির সঙ্গ দিতো।

পণ্ডিত কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দের কোনো পরোয়া করলো না। সে সামুরাতিকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ঝাঁপটে ধরে। সামুরাতি পণ্ডিতের পাঞ্জা থেকে মুক্ত হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এ সময় কুকুরটি এসে সামুরাতির মুখের কাছে মুখ নিয়ে শুঁকে। সামুরাতি ভাবলো, এটি হয়তো কোনো নেকড়ে নয়তো মন্দিরের কোনো কুকুর হবে। কুকুরটি যে তারই পোষা তা সামুরাতির কল্পনার অতীত ছিলো। কুকুর ওর মুখে মুখ ঘষতে এবং ওর গা চাটতে শুরু করলো। সামুরাতির কেন যেনো সন্দেহ হলো, এটি তো তার শিরির মতোই মনে হচ্ছে। হঠাৎ মনের অজান্তেই সামুরাতির মুখ থেকে বেরিয়ে এলো– "শিরি, ছিঁড়ে ফেলো।"

সামুরাতির নির্দেশ মাত্রই কুকুর সামনের দু'টি পা ছড়িয়ে দিয়ে পণ্ডিতের উপর হামলে পড়লো এবং পণ্ডিতের এক কাঁধের গোশ্‌ত কামড়ে ছিঁড়ে ফেললো। কুকুর পণ্ডিতকে কামড়ে ধরে হেঁচড়াতে শুরু করলে পণ্ডিত বিকট শব্দে চিৎকার দিতে থাকে। এ সুযোগে সামুরাতি উঠে দাঁড়ায়। আর কুকুর পণ্ডিতের এক রান কামড়ে ধরে। পণ্ডিত মরণ চিৎকার দিয়ে পালাতে চেষ্টা করে। এবার কুকুর তার রানের গোশ্‌ত ছিঁড়ে নিয়ে এক পা কামড়ে ধরে। সামুরাতি তখন চিৎকার করে বললো, আমি তোকে বলেছিলাম না পণ্ডিত! আমার আল্লাহ্ আমাকে বাঁচাবে। এটি আমার পালিত কুকুর। লাহের থেকে আমার গন্ধ শুঁকে শুঁকে দৌড়ে আমাকে বাঁচাতে এসেছে।

সামুরাতি কুকুর শিরিকে ঝাঁপটে ধরলো। সে ভাবতেই পারছে না তার কুকুর কী করে এখানে আসলো। দীর্ঘদিন পর মালিককে পেয়ে সামুরাতির পায়ে লুটোপুটি খেতে শুরু করলো। এদিকে পণ্ডিত প্রচণ্ড আঘাত নিয়ে জীবন বাঁচানোর জন্য পালাতে লাগলো। এমন সময় সামুরাতির কানে ভেসে আসে কারো পায়ের আওয়াজ। ভয়ে কেঁপে উঠে সামুরাতি। ভাবে, পণ্ডিতের আর্তনাদ শুনে হয়তো মন্দিরের সেনারা সাহায্যের জন্য আসছে। সামুরাতি কোথাও লুকানোর চেষ্টা করে। ঠিক এমন সময় এক নারীকণ্ঠ শোনা যায়, শিরি শিরি। কুকুর শিরিকে সামুরাতির বৃদ্ধা সেবিকা ডাকছে। এদিকে পণ্ডিতের আর্তনাদ এতোটাই বিকট ছিলো যে, সামুরাতির মনে হলো পণ্ডিত মরণ আর্তনাদ করছে। আরমুগানী ও তার সঙ্গীরা পণ্ডিতের আর্তনাদের পাশাপাশি কুকুরের গোঙানীর আওয়াজও শুনতে পাচ্ছিলো। এ সময় আরমুগানীর মনে পড়লো, এই কুকুর তাকেও একদিন হামলা করে আহত করেছিলো।

তারা সবাই কুকুরকে ধরার জন্য এদিকে দৌড়ে এলে আলো-আঁধারীর মধ্যে সামুরাতি লুকাতে চেষ্টা করছিলো। কিন্তু লুকানোর মতো যুৎসই জায়গা পাচ্ছিলো না সামুরাতি। দৌড়-ঝাঁপের মধ্যে গলার আওয়াজ শুনে যখন আগন্তুকদের কণ্ঠ আরমুগানী ও তার সেবিকার কণ্ঠের মতো মনে হলো তখন ভাবনায় পড়লো, সে কোনো স্বপ্ন দেখছে না তো? না, আর লুকানোর চেষ্টা করলো না সামুরাতি। সামুরাতি তাদের মুখোমুখি হয়ে বললো, কিভাবে এখানে নীত হয়েছে। অতি সংক্ষেপে আরমুগানীও সামুরাতিকে জানালো তারা কি করে এ পর্যন্ত এসেছে। অকুস্থলে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা ঝুঁকিপূর্ণ ভেবে তারা সবাই যে জায়গায় উট ও ঘোড়া বেঁধে রেখেছিলো, সেখানে ফিরে এলো। যারকা ও সামুরাতিকে একটি উটের পিঠে, সেবিকাকে আরেকটি উটের উপর সওয়ার করিয়ে অন্যরা ঘোড়ায় চড়ে বসলো। খুব দ্রুতগতিতে স্থান ত্যাগ করে অগ্রসর হতে লাগলো আরমুগানীর কাফেলা। তাদের ফেরার গন্তব্য এখন লাহোর নয়, বেরা। লাহোর এখন আর তাদের কারো জন্যই নিরাপদ নয়।

পরিচিত পথ ছেড়ে বিজন জঙ্গল ও অচেনা পথ ধরে তারা অগ্রসর হতে লাগলো। তাদের পশ্চাদ্ধাবনের আশংকা ছিলো। আরমুগানী ভেবেছিলো, পণ্ডিত মন্দিরে গিয়ে বলবে, সামুরাতি পালিয়ে গেছে। সামুরাতির পালিয়ে যাওয়ার খবর শুনে পাহাড়ের সেনা ছাউনী থেকে সেনারা ঘোড়া নিয়ে নীচে অবতরণ করবে এবং সামুরাতির খোঁজে বের হবে। ইত্যবসরে তাদের অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে।

আরমুগানীর আশংকা সঠিক ছিলো না। কেউ তাদের খোঁজে পশ্চাদ্ধাবন করেনি। সামুরাতির কুকুর পণ্ডিতের কাঁধ ও রানের গোশত্ ছিঁড়ে নিয়ে পাজরের হাড় ভেঙ্গে দিয়েছিলো। ক্ষতস্থান থেকে অস্বাভাবিক রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিলো। পণ্ডিত অব্যাহত চিৎকার করলেও কেউ না কেউ তাকে বাঁচানোর জন্য অবশ্যই আসতো। কারণ, এই আঘাতে তাৎক্ষণিকভাবে পণ্ডিতের মৃত্যু হওয়ার আশংকা ছিলো না। কিন্তু তাৎক্ষণিক দু'চারটি আর্ত-চিৎকার দিয়ে পণ্ডিত আর কোনো শব্দ করেনি। সে কাউকে তার সাহায্যের জন্যও ডাকেনি। এছাড়া পরনের কাপড় ছিঁড়ে ক্ষতস্থানে বেঁধে রক্ত বন্ধ করার জন্যও সে কোনো চেষ্টা করেনি। পাহাড়ের উপরে যাওয়ার পরিবর্তে পণ্ডিত অনতিদূরের সমতল ভূমির লোকালয়ের দিকেও নিজেকে বাঁচানোর জন্য অগ্রসর হয়নি।

কোথাও গেলো না পণ্ডিত। বাঁচার কোনো চেষ্টাই করলো না। কাষ্ঠ হাসি হেসে মনে মনে বললো, হয়েছে, খুব হয়েছে। এমনটাই হওয়া উচিত ছিলো।

উচিত শিক্ষা হয়েছে...। পণ্ডিত নিজের নিস্তেজ ক্ষতবিক্ষত দেহটাকে টেনে-হেঁচড়ে গঙ্গার তীরের দিকে চললো এবং বলতে লাগলো, "গঙ্গা মাও আমার এই পাপরাশি ধুতে পারবে না, কোনো আগুনও হয়তো আমার পাপ জ্বালাতে পারবে না। মন যখন পাপী হয়ে যায়, তখন শরীর পাপে ডুবে যেতে বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না। আহ্! খুব তেষ্টা পেয়েছে ভগবান...!" পণ্ডিতের মাথা চক্কর দিতে শুরু করলো। কয়েকবার চক্কর খেয়ে পড়ে গেলো পণ্ডিত। শরীরের সব রক্ত ঝরে পড়েছে। এভাবে হোঁচট খেতে খেতে গঙ্গার পানির দিকে এগুতে থাকলো। এক পর্যায়ে পণ্ডিত ক্ষীণ আওয়াজে স্বগতোক্তি করলো, "আর একটু শক্তি দাও ভগবান, আমাকে গঙ্গা মা'র কোলে যেতে দাও!"

পণ্ডিতের প্রাণশক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছিলো। সে চক্কর খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলো। আবার কোনো মতে মাথা তুলে হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলো। এভাবে সামনে এগুচ্ছিলো। গঙ্গার পানির স্রোত ও ঢেউয়ের শব্দ তার কানে ভেসে আসছিলো। গঙ্গার শব্দ শুনে আরো তাড়াতাড়ি পৌঁছার জন্য অবশিষ্ট সব শক্তি দিয়ে গড়াতে লাগলো পণ্ডিত। এমন সময় তার স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠলো সামুরাতির কথা- "আমাকে আমার আল্লাহ্ বাঁচাবে, তোমাদের এসব মূর্তি সব ধ্বংস হয়ে যাবে।" তখন নিজের স্বগতোক্তিও মনে পড়লো তার- "নারী মা-বোন-স্ত্রী-কন্যা হতে পারে, এছাড়া নারীকে অন্য কোনো রূপে রূপায়িত করে কাছে টানলে জ্বলে যেতে হবে। পরিণতি খুবই খারাপ হবে।" গোটা মন্দিরে এই নীতিই প্রতিষ্ঠা করেছিলো পণ্ডিত। কিন্তু নিজের নীতিতেই সে অটল থাকতে পারেনি। নিজেই সেই পাপে জড়িয়ে পড়েছিলো। সামুরাতিকে সে সেই রূপই দিয়েছিলো, যা না ছিলো মা-বোন-কন্যা, না ছিলো স্ত্রী।

শরীরের রক্ত ঝরতে ঝরতে শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছিলো পণ্ডিতের। এদিকে পাপের অনুশোচনায় পণ্ডিতকে আরো নির্জীব করে ফেলেছিলো। এমতাবস্থায় গড়াতে গড়াতে সে গঙ্গা তীরে পৌঁছে যায়। এ জায়গাটা ছিলো ঈষৎ ঢালু। নদীর ঢেউ অনেক উপরে উঠে আসতো, আবার চলে যেতো অনেক নীচে। এমতাবস্থায় দু'চোখে অন্ধকার নেমে এলো পণ্ডিতের। কাদামাটিতে নিথর দেহ এলিয়ে দিলো পণ্ডিত। গঙ্গার ঢেউ এসে আছড়ে পড়লো তার গায়ে। পণ্ডিত শেষবারের মতো ক্ষীণকণ্ঠে বললো, "আমি পাপের পিয়াসী, আমি পাপী।" এ সময় বিশাল এক ঢেউ এসে পণ্ডিতের নিথর দেহটি গঙ্গা তার গভীর বুকে টেনে নিয়ে যায়।

এদিকে মন্দিরের অন্যরা নগরকোটের মূর্তিগুলোকে নর্তকীর রক্তে স্নাত করার জন্য অপেক্ষা করছিলো। মন্দিরের সকল পুরোহিত মহাঋষির পথ চেয়ে

অপেক্ষা করছে। ব্রাহ্মপালের মা পণ্ডিতের অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে প্রহর গুনছিলো। বেলা এক প্রহর পার হলেও যখন পণ্ডিতকে গঙ্গাতীর থেকে ফিরে আসতে দেখা গেলো না, তখন ঋষির খোঁজে বেরিয়ে পড়লো লোকজন। দিনের শেষভাগে অনুসন্ধানকারী লোকজনও ফিরে এলো। কোথাও পণ্ডিত ও সামুরাত্তির খোঁজ পাওয়া গেলো না। অনুসন্ধানকারীরা গঙ্গাতীরে যাওয়ার পথে দেখতে পেলো রক্তের ছোপ ছোপ দাগ। কিন্তু সেই রক্তের কোনো পরিচয় পাওয়া গেলো না। সেই রক্তের দাগ জন্ম দিলো বহু কাহিনী। অনেকেই অনেকভাবে রক্তের ব্যাখ্যায় গল্প তৈরি করলো। কিন্তু কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও নগরকোটের পণ্ডিত ও সামুরাত্তির অস্তিত্ব উদ্ধার করতে পারলো না। এমতাবস্থায় সম্মিলিত হিন্দু বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ব্রাহ্মণপালের মা দেবদেবীর অভিশাপের ও অসন্তুষ্টির ভাবনায় মানসিকভাবে মুষড়ে পড়লো। ভয় করতে লাগলো, না জানি দেব-দেবীর পক্ষ থেকে কোন গজব আপতিত হয় কিনা।

* * *

গজব আপতিত হচ্ছিলো সুলতান মাহমূদের উপর, তাদের উপর নয়। দৃশ্যত হিন্দুরা এতো বিপুল সেনা সমাবেশ ঘটাবে, তা সুলতান আগে আন্দাজ করতে পারেননি। বিপুল সেনা সমাবেশ থেকে কিভাবে সুলতান নিজের বাহিনীকে নিরাপত্তা দেবেন তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেছেন। সম্মিলিত হিন্দু বাহিনীর দুর্বলতাগুলো ইংরেজ ঐতিহাসিকের লেখায় পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। ইংরেজ ঐতিহাসিক স্যার ভিএ স্মিথ লিখেন–

'হিন্দু বাহিনীর সবচেয়ে বড় দুর্বলতা ছিলো বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত বিভিন্ন রাজ্যের সেনাদেরকে একই কমান্ডের অধীনে ন্যস্ত করা। অথচ এই কমান্ডার অন্যান্য বাহিনীর রণকৌশল ও যুদ্ধপারদর্শিতা সম্পর্কে কিছুই জানতো না। দ্বিতীয়ত, হাই কমান্ডের প্রতি অন্যান্য সেনাধ্যক্ষদের আস্থা ছিলো না। তাদের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচণ্ড অভাব ছিলো। তৃতীয়ত, হাজার হাজার বেসামরিক লোককেও এই বাহিনীতে তাদের আবেগ ও দৈহিক সামর্থের বিচারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো। অথচ এরা কোনো দিন যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত দেখেনি। রণকৌশল সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিলো না। চতুর্থত, হিন্দু বাহিনী ছিলো সংখ্যাধিক্যে ও সামরিক সরঞ্জামের প্রতি অতিশয় নির্ভরশীল।'

হিন্দু বাহিনীকে মানসিকভাবে শক্তি যোগাতো সেনাবাহিনীর সহগামী হিন্দু পুরোহিত ও তাদের সাথে নিয়ে আসা বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি। মুসলমান সেনারা দেখেছে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলে হিন্দু পুরোহিতরা সবার আগে এসব মূর্তি

ফেলে পালাতে শুরু করে। পক্ষান্তরে সুলতান মাহমূদ তার রণকৌশল ও জানবাজ যোদ্ধাদের পরিবর্তে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের ভরসা করতেন। প্রত্যেক লড়াইয়ের আগে তিনি দু'রাকাত নফল নামায আদায় করে আল্লাহর দরবারে সাহায্য প্রার্থনা করতেন। নিজের রণকৌশলের প্রতি তিনি ছিলেন আস্থাশীল। সেই সাথে এ বিষয়টিও তাকে শক্তি যোগাতো যে, নিজের ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থে তিনি যুদ্ধ করেন না, স্রেফ আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্যই তিনি রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হন। সম্মিলিত হিন্দুদের বিশাল বাহিনী দেখে তার সেনাদের সর্বশেষ নির্দেশনা দিতে গিয়ে তিনি বললেন–

'বন্ধুরা! বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর চেয়ে তিনগুণ বেশি বেঈমান বাহিনীকে নবীজী পরাজিত করেছিলেন। সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে হবে আমাদের। আমি আজ তোমাদের কয়েকটি কথা বলতে চাই।' নিজের অশ্বে আরোহণ করা অবস্থায় সেনাদের উদ্দেশ্যে সুলতান বলতে লাগলেন, 'আমি তোমাদের এই আত্মতুষ্টিতে ভুলিয়ে রাখতে চাই না যে, বিজয় তোমাদেরই হবে। তবে এ কথা অবশ্যই বলবো, তোমরা যদি আল্লাহর হয়ে যুদ্ধ করো, তাহলে আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের মদদ করবেন। মনের মধ্যে এই চেতনা রাখো, তোমরা আল্লাহর সত্য ধর্মের জন্য যুদ্ধ করছো। আল্লাহর কোনো শত্রুকেই তোমরা জীবিত থাকতে দেবে না। তোমাদের সামনে এখন পাহাড় দাঁড়ানো। এই পাহাড়কে অজেয় মনে করে যদি জীবনের প্রতি তোমরা বেশি দরদী হয়ে উঠো, তাহলে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। মনে রাখবে, পাহাড় যতো দুর্ভেদ্য ও দুর্গম হোক না কেন, আমরা একে টুকরো টুকরো করে ফেলবো। নিজেদের কম জনবল আর শত্রুদের সংখ্যাধিক্যের কথা ভুলে যাও। মনে রেখো, যুদ্ধ মনের জোরে হয়ে থাকে। আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন। আল্লাহ তাদেরই মদদ করেন যারা আল্লাহর নামকে উচ্চকিত করার জন্য বিজয়ের আশা নিয়ে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়।'

নিজ বাহিনীর ছোট্ট দু'টি ইউনিটকে নিজের প্রত্যক্ষ কমান্ডে নিয়ে সুলতান মাহমূদ সিন্ধু নদের পাঞ্জাব তীরে তাঁবু গাড়লেন। তার গোয়েন্দাদের চোখে যেমন হিন্দু বাহিনীর বর্ণনা তিনি শুনেছেন, নিজের চোখে দেখেও তিনি হিন্দু বাহিনীকে পরখ করেছেন। হিন্দু বাহিনী এবার বিজয়ের নেশায় উন্মত্ত। তাই তিনি সেনা কমান্ডারদের উদ্দেশ্যে বললেন– 'এবার হিন্দুরা বিজয়ের নেশায় উন্মত্ত, তাই আমাদেরকে খুবই ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে-চিন্তে অগ্রসর হতে হবে।' তিনি পূর্বের যুদ্ধ পরিকল্পনায় কিছুটা পরিবর্তন এনে সেনাবাহিনীকে কয়েকটি ঝটিকা বাহিনী ও

গেরিলা দলে বিভক্ত করেন এবং কিছুসংখ্যক সৈন্যকে নদীর তীরবর্তী এলাকায় ছড়িয়ে দিলেন। পেশোয়ার ও গজনীর নিরাপত্তার জন্য তিনি নদীকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর প্লান করলেন।

এছাড়া তার সেনা শিবিরের চতুর্দিকে তিনি পরিখা খনন করালেন। শিবিরের ভেতরে মরিচাবন্দী হয়ে প্রতিপক্ষকে প্রতিরোধ করাকে সমীচীন ভাবলেন। আরো কিছু নতুন কৌশলের কথা তিনি ভাবছিলেন কিন্তু যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করাও তার জন্য ছিলো ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, প্রতিদিনই নতুন নতুন লোক ও সেনা এসে হিন্দু বাহিনীর সাথে যোগ দিচ্ছিলো।

সুলতান দেখলেন, হিন্দু বাহিনী এখনো যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেনি। আল্লাহর উপর ভরসা করে একদিন ভোরবেলায় ফজর নামাযের পরক্ষণেই এক হাজার তীরন্দাজ ঝটিকা সৈন্যকে শত্রু সেনাদের উপর আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। বাহিনীর সবাই ছিলো ধাবমান অশ্বারোহণ ও লক্ষ্যভেদী তীরন্দাজে পারদর্শী।

৩৯৯ হিজরী মোতাবেক ২৯ রবিউস সানি ১০০৮ খৃস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর। বিখ্যাত ঐতিহাসিক গারদিজী স্বচক্ষে দেখা সেই যুদ্ধের বর্ণনায় বলেন, মাত্র এক হাজার তীরন্দাজকে আক্রমণে পাঠিয়ে সুলতান যেনো ভিমরুলের চাকে ঢিল দিলেন। শত্রু বাহিনী এদেরকে এভাবেই তুচ্ছজ্ঞান করলো, কোনো গুরুত্বহীন জিনিস লোকেরা যেমন অবজ্ঞাভরে আবর্জনায় ফেলে দেয়।

শত্রুবাহিনীর ৩০ হাজার অশ্বারোহী ১ হাজার মুসলিম তীরন্দাজের উপর হামলে পড়লো। গুরখা জাতি সেই সময় কোনো ধর্ম-কর্ম পালন করতো না। কিন্তু তাদের বিশ্বাস ছিলো, আদিতে তারাও হিন্দুদের অংশ ছিলো। এই বিশ্বাস থেকে হিন্দুদেরই সহযোগী ছিলো গুরখা সমাজ। এরা এতোটাই লড়াকু ও হিংস্র ছিলো যে, শীত-গ্রীষ্ম, পাহাড়-সমতল সবসময় সব জায়গায় খোলা মাথায় কোনো ঢাল ছাড়াই প্রতিপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। ঐতিহাসিক কাসিম ফারিশতা লিখেন-

গুরখা সৈন্যরা কয়েক মিনিটের মধ্যে সুলতানের অশ্বারোহী তীরন্দাজদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে পাঁচশ' মুসলিম সৈন্যকে শহীদ এবং বহু সেনাকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে। সুলতানের ক্যাম্পে গুরখারা ঢুকে পড়ে। কিন্তু সুলতানের পরিখা গুরখাদের পেছনে ফেরা অসম্ভব প্রমাণ করে। সুলতান আশংকা করছিলেন, প্রতিপক্ষের গোটা ফৌজ যদি একযোগে আক্রমণ করে, তাহলে অল্প সময়ের মধ্যেই যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে দেবে। সুলতান তার সৈন্যদের নিয়ে

ক্যাম্পে আটকা পড়ে। আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করতে বাধ্য হচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি তার বাহিনীকে যেভাবে সাজিয়ে রেখেছিলেন এর সুফল দেখা দিলো। ততোক্ষণ পর্যন্ত সুলতানের প্রধান সেনাপতি আবদুল্লাহ আলতাঈ যে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী রিজার্ভ সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন, এরা তখনো গুরখা বাহিনীর বিরুদ্ধে মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হয়নি।

ইঙ্গিত পেয়ে সেনাপতি আবদুল্লাহ আলতাঈ গুরখাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করলেন। শুরু হলো গুরখাদের কচুকাটা করা। ততোক্ষণে গুরখারা ক্ষান্ত হয়ে পড়েছে আর সংখ্যারও যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। গুরখারা জীবন বাঁচানোর জন্য যখন পরিখায় ঝাঁপিয়ে পড়ছিলো, তখন আলতাঈ'র রিজার্ভ সৈন্যরা তীর ও বল্লমের আঘাতে তাদের ধরাশায়ী করছিলো। যুদ্ধের এই অবস্থা দেখে মুসলমানদের সোজা হয়ে দাঁড়ানোর অবকাশ না দেয়ার লক্ষ্যে সকল সেনাকে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেয়া হলো। মুসলমান শিবিরের অভ্যন্তরীণ অবস্থা আনন্দ পালের জানা ছিলো না। সেখানে তখন গুরখারা কচুকাটা হচ্ছিলো। রাজা আনন্দ পাল বিজয় অবশ্যম্ভাবী ভেবে তার হস্তি বাহিনীসহ নিজে সামনে অগ্রসর হয় এবং তার ঝাণ্ডা আরো উঁচু করে তুলে ধরা হয়।

সুলতানের সেনাপতি আবদুল্লাহ আলতাঈ'র দু'হাজার রিজার্ভ সৈন্যের একটি অংশ রাজা আনন্দ পালের বাহিনীর একপ্রান্তে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ঐতিহাসিক ফারিশতা লিখেন, লক্ষাধিক শত্রুর মোকাবেলায় মাত্র ৬ হাজার সৈনিক মোটেও উল্লেখ করার মতো নয়। কিন্তু তদুপরি অলৌকিক ঘটনার মতোই বিস্ময়করভাবে মুসলিম বাহিনী রাজার বিশাল বাহিনীর উপর অল্পক্ষণের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করে ফেললো। রাজার বাহন হাতির মুখে বিদ্ধ হলো কয়েকটি তীর। হঠাৎ রাজার হাতির চোখে একটি তীর বিদ্ধ হলে সেটি বিকট চিৎকার দিয়ে পেছনে ফিরে নিজ বাহিনীর মধ্যে দৌড়ঝাঁপ শুরু করলো। রাজার ঝাণ্ডা মাটিতে পড়ে যায়। হিন্দু বাহিনীর ঝাণ্ডা আর উঁচুতে তুলে ধরা সম্ভব হলো না। রাজার হাতির বিকট চিৎকারে অন্যান্য হাতিও ভড়কে গিয়ে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি শুরু করে। ফলে নিজ হস্তি বাহিনীর পায়ের তলায় পিষ্ট হতে লাগলো হিন্দু বাহিনী। রাজার হাতি প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে সবকিছু মাড়িয়ে রাজাকে নিয়ে পিছু পালাতে দেখে অন্যান্য হিন্দু রাজ্যের সেনারা মনে করলো, হয়তো সামনে মুসলমানরা জোরদার হামলা করেছে। তাই রাজা পশ্চাদপসরণ করছে। কিছু না ভেবেই তারা পালাতে শুরু করলো। ভেঙ্গে গেলো সম্মিলিত বাহিনীর চেইন অব কমান্ড।

সম্মিলিত বাহিনী হয়ে পড়লো কাণ্ডারীহীন। তখন ছিলো শীতের মওসুম। ডিসেম্বরের শেষ দিন। পাশের পাহাড়গুলো বরফে ঢাকা। শীতের তীব্রতা ছিলো সমতলের হিন্দুদের জন্য অসহনীয়। এই সময়টার জন্যই সুলতান অপেক্ষা করছিলেন। সুলতান যখন দেখলেন, শত্রু বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে, তখন তিনি তার সকল সৈন্যকে সরাসরি আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন এবং শত্রু বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করার হুকুম করলেন। প্রধান সেনাপতির দু'হাজার রিজার্ভ ফোর্স আর ডেপুটি সেনাপতি আরসালানের অধীনস্ত দশ হাজার আফগান, তুর্কী ও খিলজী সৈন্য হিন্দু বাহিনীর উপর একই সাথে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ততোক্ষণে শত্রুবাহিনী আক্রমণ নয়– আত্মরক্ষা এবং পশ্চাদপসরণে লিপ্ত।

কাসিম ফারিশতা লিখেন– পালাতে গিয়ে হিন্দু বাহিনীর ২০ হাজার সৈন্য নিহত হয়। যারা অস্ত্র সমর্পণ করলো এদের বন্দী করা হলো। সুলতানের নদীর পাড়ের ঝটিকা বাহিনীও ততোক্ষণে এসে মূল বাহিনীর সাথে যোগ দিয়েছে। সুলতান ইতিপূর্বে কখনো পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দেননি, কিন্তু এবার শত্রুদের তাড়া করার নির্দেশ দিলেন। শত্রু সেনাদের তাড়া করতে গিয়ে মুসলিম বাহিনী নগরকোটে পৌছে গেলে তার গোয়েন্দারা জানালো, নগরকোটের এ মন্দিরকে হিন্দু রাজা-মহারাজারা অন্যতম একটি সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত করে রেখেছে। এটিকে রক্ষার জন্য হিন্দু সেনাক্যাম্প স্থাপন করেছে। সুলতান একথা শুনে আর অগ্রসর না হয়ে নগরকোট মন্দির অবরোধের নির্দেশ দিলেন।

রাজা আনন্দ পালের সেনা ও কালিঞ্জরের সৈন্যরা ইচ্ছা করলে নগরকোট মন্দিরকে বাঁচাতে পারতো কিন্তু ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওরা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। সুলতান মন্দির অবরোধ করে দূর থেকে এর ভেতরে পাথর নিক্ষেপের নির্দেশ দেন। মন্দির ও মন্দির রক্ষাকারী সেনাদের অবস্থান ছিলো পাহাড়ের উপর। এ জন্য সুলতানের পক্ষে ওদেরকে সরাসরি আঘাত হানা সম্ভব হচ্ছিলো না। দু'তিন দিন অবরোধ করে প্রধান ফটক ভাঙ্গার জন্য জোরদার আক্রমণ হানলে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মন্দিরের লোকজন ফটক খুলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করে।

সুলতান মাহমূদ মন্দিরে প্রবেশ করে প্রথমেই মূর্তিগুলোকে পাহাড়ের উপর থেকে নীচের দিকে ফেলে দিলেন। সেগুলো ভেঙ্গেচূড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়লো। নগরকোট মন্দিরে ছিলো সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার। মন্দির থেকে সাত কোটি স্বর্ণের চাকতি বের হলো। স্বর্ণের অলংকার ছিলো মণকে মণ। হীরা-মতি-পান্নাও মণ হিসেবে ওজন করতে হয়েছিল। সুলতান মাহমূদকে পরাজিত করার জন্য হিন্দু পণ্ডিত ও রাজা-মহারাজারা প্রজাদের কাছ থেকে এসব

ধন-সম্পদ সংগ্রহ করেছিলো। হাজরো থেকে নগরকোট পর্যন্ত গোটা অঞ্চল সুলতান ইসলামী শাসনের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। সেই যুদ্ধের শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি সইতে না পেরে রাজা আনন্দ পাল কয়েক দিন পর মৃত্যুবরণ করে।

সুলতান নতুন বিজিত এলাকায় থেকে তার প্রশাসনকে শক্তিশালী করার প্রতি মনোনিবেশ করলেন। ঠিক এ সময় তার কাছে সংবাদ এলো, গৌড় অঞ্চলে মুহাম্মদ নামের এক আফগান শাসক ১০ হাজার সৈন্য সমাবেশ করেছে এবং গৌড়ি সম্প্রদায়ের সব লোক তার সহযোগী হতে শুরু করেছে। সেটিও ছিলো এক গৃহযুদ্ধের খবর। কালবিলম্ব না করে ১০০৯ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ৪০০ হিজরী সনে সুলতান মাহমূদকে বাধ্য হয়েই গজনী ফিরে যেতে হলো এবং আরেকবার নামধারী মুসলিম বেঈমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হলো।

মানুষ ও শয়তানের লড়াই

নগরকোট মন্দিরের মূর্তি ও হিন্দু আখড়া জয় করে সেখানে ইসলামী শাসন প্রবর্তনের পর সুলতান মাহমূদ গৌড়দের বিদ্রোহ দমনে গজনী ফিরে যাচ্ছিলেন। কারণ, গৌড়ি সম্প্রদায় তার রাজধানী সুরক্ষার প্রশ্নে ঝুঁকি ও হুমকি সৃষ্টি করেছিলো। এটা ছিলো সুলতান মাহমূদের জন্য চরম দুর্ভাগ্যের বিষয়। তিনি যতোবার হিন্দুস্তানে এসে বিজয় নিশান উড়িয়ে এখানে ইসলামী শাসনের ভিত মজবুত করতে চেয়েছেন, ততোবারই সুলতানের অবর্তমানে কোনো না কোনো মুসলিম বেঈমান গজনী আক্রমণে প্রলুব্ধ হয়েছে। ফলে সংবাদ পেয়েই সুলতানকে রাজধানী রক্ষার জন্য গজনী ফিরে যেতে হচ্ছিলো। তিনি হিন্দুস্তানে তার প্রশাসনিক ভিত মজবুত করার অবকাশ পেলেন না।

হিংসাপরায়ণ অমুসলিম ঐতিহাসিকরা তার এই অগত্যা ফিরে যাওয়ার বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ ও প্রকৃত সত্য উদঘাটন না করে সুলতান মাহমূদের নামে কলংক লেপন করেছে। তারা বলেছে, সুলতান মাহমূদ ধন-সম্পদ লুটতরাজের জন্য মন্দিরে আক্রমণ করতো, মূর্তি ভেঙ্গে দিতো, মন্দিরে স্বর্ণ-মণিমুক্তা যা থাকতো তা সংগ্রহ করতো। তাই লুটতরাজ শেষ হলেই সে পুনরায় গজনী ফিরে যেতো। হিন্দুস্তানে ইসলামী শাসন প্রবর্তনে এবং মুসলমানদের শাসন প্রক্রিয়া শক্তিশালীকরণে সুলতান মাহমূদ আন্তরিক ছিলো না।

দু'হাজার হিন্দু বন্দীকে সাথে করে গজনী ফিরে যাচ্ছিলেন সুলতান। প্রকৃতপক্ষে এরা বন্দী ছিলো না, তখনকার রীতি অনুযায়ী এরা ছিলো দাস।

মহারাজা আনন্দ পাল যুদ্ধে পরাজয়ের পর উপঢৌকন হিসেবে দু'হাজার দাস দিয়েছিলো। তাছাড়া কিছু সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাতি সুলতান হিন্দু বাহিনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন আর কিছু হাতি হিন্দু রাজা-মহারাজারা পরাজয়ের পর বশ্যতা স্বীকার করে তাকে উপহার দিয়েছিলো।

যে পরিমাণ সৈন্য নিয়ে তিনি গজনী ত্যাগ করেছিলেন, ফেরার সময় সংখ্যা তার চেয়ে অনেক কম ছিলো। বিজিত এলাকার প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রয়োজনে কিছু সৈন্যকে ওখানে রেখে আসতে হলো। এছাড়া তার কোনো সৈন্য শত্রুর হাতে বন্দী না হলেও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ যুদ্ধে শাহাদাতাবরণ করেছিলো।

এই কঠিন সময়ে তার অন্যতম দু'কমান্ডারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না। এরা প্রতিপক্ষের হাতে মারাও যায়নি। আবার সুলতান মাহমূদ নগরকোটের প্রশাসনিক কাজেও এ দু'জনকে রেখে আসেননি।

এদের একজন কমান্ডার বুগরা খান আর অপরজন কমান্ডার উলস্তগীন। উভয়েই ছিলো আকর্ষণীয় দেহ-সৌষ্ঠবের অধিকারী টগবগে যুবক। বুগরাখান ছিলো পেশোয়ার অঞ্চলের অধিবাসী। সে গজনী থেকে মাঝে মধ্যে পেশোয়ার যাতায়াত করতো বলে হিন্দুস্তানের স্থানীয় ভাষা বুঝতো এবং অল্প বিস্তর বলতেও পারতো। সুলতান মাহমূদের সৈন্যরা যখন নগরকোট দুর্গ জয় করে, তখন বুগরা খান পার্শ্ববর্তী একটি পাহাড়ের চূড়ায় তার ইউনিট নিয়ে মোতায়েন ছিলো। বুগরা খানের সৈন্যরা যখন দেখলো মুসলমানরা দুর্গের প্রধান ফটক ভেঙ্গে ফেলেছে তখন তার ইউনিটের সৈন্যরা উর্ধ্বশ্বাসে দুর্গের দিকে ঘোড়া ছুটায়। বুগরা খান তার ঘোড়াকে সবার আগে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাড়া দেয়। হঠাৎ ঘোড়া এমনভাবে লম্ফ দিয়ে ছুটতে লাগলো যে বুগরা খান নিজে তাল সামলাতে না পেরে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলেন। তার ঘোড়াটিও বুগরা খানের এভাবে পড়ে যাওয়ায় ভয় পেয়ে তাকে ফেলে দৌড়ে চলে যায়। পাহাড়ের উপর থেকে পড়ে গিয়ে গড়াতে গড়াতে বুগরা খান নীচে চলে যায়। তার উভয় পা মচকে যায়। শরীরে কয়েক স্থানে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। তার পক্ষে সোজা হয়ে দাঁড়ানো সম্ভব হচ্ছিলো না। এমতাবস্থায় হিন্দু সৈন্যরা প্রাণ বাঁচানোর জন্য এদিক-ওদিক পালাচ্ছিলো। হিন্দুদের পালাতে দেখে বুগরা খান ঝোঁপ-ঝাড়ের আড়ালে নিজেকে লুকাতে চেষ্টা করছিলো। কারণ, হিন্দু সৈন্যদের সামনে পড়লে আর তাকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখতো না।

প্রচণ্ড আঘাত ও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে চেতনাবোধ প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলো বুগরা খান। অর্ধচেতন অবস্থায় প্রাণ বাঁচানোর জন্য সে কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে পালাতে শুরু করেছিলো কিছুই জানা ছিলো না। কখনো বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেতো আবার যখনই হুঁশ ফিরে পেতো উঠে একদিকে চলতে শুরু করতো। বারবার চেতনা হারিয়ে ফেলতো। অবচেতন দেহে পড়ে থাকা অবস্থায় কারো হুংকারে চেতনা ফিরে পেলো বুগরা খান। স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তরবারীর বাঁটে তার হাত চলে গেলো। কোষমুক্ত করে ফেললো তরবারী। তরবারী মুষ্টিবদ্ধ করে যেই না উঠে দাঁড়াতে চাইলো অমনি ব্যথায় মোচর দিয়ে উঠলো পা। প্রায় ভেঙ্গে গেছে তার একটি পা। তদুপরি ক্ষতস্থান থেকে অনবরত রক্তক্ষরণ ও টানা কয়েক দিনের অনাহার-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে গেছে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেও ক্ষণিকের মধ্যেই লুটিয়ে পড়ে বুগরা খান।

"আরে বুগরা খান! মাথা ঠিক করো। কি হয়েছে? আমি আলসতুগীন।" বুগরা খানের নিজের ভাষায় কথা বললো লোকটি। "তুমি এখানে কি করে এলে?"

বুগরা খান কথা বলার চেষ্টা করলো কিন্তু তার মুখে কোনো শব্দই উচ্চারিত হলো না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তার কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে। জিহ্বা লেপ্টে গেছে। বুগরা খানের মুখ দেখেই আলাসতুগীন বুঝে নিলো সে খুবই তৃষ্ণার্ত। আলাসতুগীন তার কোমরে বাঁধা পানির পাত্র খুলে তার মুখে ধরলো। কয়েক ঢোক পানি পান করলো বুগরা খান। কিছুক্ষণ পর পুরোপুরি চেতনা ফিরে পেলো। অবস্থার উন্নতি দেখে তার মুখে কিছু খাবার তুলে দিলো আলাসতুগীন।

আলাসতুগীনও বুগরা খানের মতোই একজন সেনা কমান্ডার। সেই সুবাদে বুগরা ও আলাসতুর মধ্যে ছিলো গভীর হৃদ্যতা। সুলতান যখন মন্দির ও দুর্গ অবরোধ করেন, তখন বুগরা খানের যেমন দায়িত্ব ছিলো ইউনিটসহ পার্শ্ববর্তী পাহাড়ের উপর থেকে যুদ্ধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজনে ভেতরে ও বাইরের আক্রমণ প্রতিরোধ করা। অনুরূপ আলাসতুগীনের দায়িত্বও ছিলো নগরকোট থেকে কিছুটা দূরে হিন্দু সৈন্যদের রসদ সামগ্রী আসার পথ রোধ করা এবং পথিমধ্যেই সাহায্যকারী দলকে আটকে রাখা। আলাসতুগীনের অধীনে ছিলো ছোট একটি তীরন্দাজ ইউনিট। এরা ধাবমান ঘোড়ায় চড়েও লক্ষ্যভেদী তীরন্দাজে পারদর্শী ছিলো এবং ছিলো কুশলী যোদ্ধা। একদিন আলাসতুগীন ইউনিটের চোখে পড়লো একটি হিন্দু বাহিনী। তবে এরা নগরকোটের দিকে যাচ্ছিলো না, যাচ্ছিলো নগরকোটের বিপরীত দিকে। আলাসতুগীনের তীরন্দাজ

ইউনিট হিন্দু সেনাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ শুরু করলে ইত্যবসরে এর পাশ দিয়েই অগ্রসরমান একটি পদাতিক সেনাদল দেখা গেলো। ওদের চোখে পড়লো, মুসলিম তীরন্দাজ ইউনিট হিন্দুদের তাড়া করছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পলায়নপর হিন্দু অশ্বারোহী আর পদাতিক সৈন্যরা একাকার হয়ে গেলো। অশ্বারোহী আশ্রয় নিলো পলায়নপর পদাতিক সৈন্যদের মাঝে আর পদাতিক সৈন্যরা অশ্বারোহীদের আশ্রয় ভেবে মুসলিম তীরন্দাজদের মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হলো। আলাসতুগীনের জনবল ছিলো হাতেগোনা কয়েকজন। অপরদিকে পলায়নপর হিন্দুরা সংখ্যায় ছিলো অনেক। এরা সবাই জীবন বাঁচানোর তাকিদেই মুসলিম তীরন্দাজদের ঘিরে ফেলে এবং কাবু করে ফেলে। মাত্র কয়েকজন তীরন্দাজ ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে চতুর্দিকের আঘাতে বেসামাল হয়ে পড়লো। অধিকাংশই মারা পড়লো আর অল্প ক'জন জীবন নিয়ে পালাতে সক্ষম হলো। এই পালিয়ে বাঁচাদের একজন ইউনিট কমান্ডার আলাসতুগীন। টানা কয়েক দিন সে সাথীদের খুঁজে ফিরছিলো। কিন্তু অচেনা হিন্দুস্তানের বিশাল জঙ্গলে কোন্ দিকে হারিয়ে গেছে কোনো কূল-কিনারা করতে পারলো না। সেই গহীন জঙ্গলে সে অবচেতন অবস্থায় দেখতে পেলো বুগরা খানকে। আর এই বুগরা খান তারই ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তার মতোই সেনা কমান্ডার।

পানি ও খাবার গ্রহণ করার পর স্বাভাবিক জীবনবোধ ফিরে পায় বুগরা খান। কিন্তু তার চলার শক্তি ছিলো না। ততোক্ষণে দিন পেরিয়ে রাত হয়ে গেছে।

রাত পোহালে কমান্ডার আলাসতুগীন বুগরা খানকে নেয়ার জন্য এবং নগরকোটের রাস্তা দেখিয়ে দেয়ার জন্য কোনো লোক পাওয়া যায় কিনা এ জন্য ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। রাতেই বুগরা খান তাকে জানিয়ে দিয়েছিলো নগরকোট দুর্গ মুসলমানরা জয় করে নিয়েছে। তাদের অবস্থান থেকে কিছুদূর অগ্রসর হলেই আলাসতুগীন একটি বসতি দেখতে পায়। তাকে লোকালয়ের দিকে অগ্রসর হতে দেখে কিছু লোক তার উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসে। ওরা ছিলো গ্রামীণ দরিদ্র হিন্দু। মুসলমান সেনা অফিসার দেখে গ্রামের লোকজন তাকে নমস্কার জানাতে থাকে। আলাসতুগীন ইশারা-ইঙ্গিতে ওদের সাথে কথা বলে চারজন যুবককে তার সাথে নিয়ে বুগরা খানের নিকট ফিরে আসে। ততোক্ষণে বুগরা খানের অবস্থার আরো অবনতি ঘটেছে। খানের অবস্থার অবনতি দেখে আলাসতুগীন দু'চারটা শব্দ ব্যবহার করে ওদের কাছে জানতে চাইলো, নগরকোট এখান থেকে কত দূর? হিন্দুরা ইশারা ইঙ্গিতে বুঝালো নগরকোট এখান থেকে বহুদূর এবং অসমতল পাহাড়ী পথ।

চার যুবকের একজন তাদের বললো, এমতাবস্থায় এই আহত ব্যক্তির পক্ষে নগরকোট যাওয়া সম্ভব নয় বরং একে গ্রামে নিয়ে যাই। কিছুটা সুস্থ হলে আমরা তাকে নগরকোট পৌঁছে দেবো। বুগরা খান লাহোরের লোক। সে ওদের কথা পুরোপুরিই বুঝতে পারলো এবং বন্ধু আলাসতুগীনকে ওদের প্রস্তাবের কথা তার ভাষায় বুঝিয়ে দিলো।

হিন্দু যুবকরা এ কথাও বললো, আমাদের গ্রামে এ ধরনের হাড়ভাঙ্গা ও ক্ষতের চিকিৎসা হয় এবং এখানে প্রচুর দুধ ও মধু পাওয়া যায়, যা আহত ও দুর্বল লোককে দ্রুত সারিয়ে তুলে।

মনের দিক থেকে আলাসতুগীন গ্রামে অবস্থানের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলো না। কারণ, এসব গ্রামের মানুষেরা তাদের বশ্যতা স্বীকার করলেও দুশমন সম্প্রদায়ের। এদের বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু বুগরা খানের অবস্থা ছিলো খুবই নাজুক। এ অবস্থায় তাকে নগরকোট পর্যন্ত নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। ফলে বাধ্য হয়েই সে বুগরা খানকে বললো, আপাতত এখানে থেকে যাই।

আলাসতুগীন ছিলো খুবই সতর্ক কমান্ডার। সে হিন্দুদের স্বভাব সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত ছিলো। বুগরা খান তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বন্ধুর জীবন-মরণ পরিস্থিতিতে অনেকটা আবেগপ্রবণ হয়ে গেলো আলাসতুগীন। পরিশেষে অগ্র-পশ্চাৎ এতো কিছু না ভেবে চার যুবককে নির্দেশ দিলে আহত বুগরা খানকে সবাই মিলে কাঁধে তুলে নিলো।

আলাসতুগীন যখন চার হিন্দু যুবককে গ্রাম থেকে নিয়ে গিয়েছিলো, তখন রাস্তার পাশে তিনজন লোক একটি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে উস্‌খুস্‌ করছিলো। এদের একজন ছিলো নগরকোট মন্দিরের পুরোহিত আর অপর দু'জন নগরকোট দুর্গের শীর্ষস্থানীয় আমলা। মন্দির পতনের ক'দিন আগেই পুরোহিত পাশের এক গ্রামে এসে আশ্রয় নেয়। আর সামরিক আমলা দু'জন এসেছে একদিন আগে। এদের তিনজনকেই গ্রামের হিন্দুরা লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করেছিলো। পুরোহিত ও দু'কর্মকর্তা সুলতানের বাহিনীর হাতে সম্মিলিত বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় আর মন্দির দখল করে মূর্তি ভাঙ্গার জন্য মুসলিম সেনাদের বিরুদ্ধে মনের প্রচণ্ড বিদ্বেষে অগ্নিশর্মা রূপ ধারণ করছিলো। এই গ্রামে মুসলিম সেনার উপস্থিতি দেখে এরা আশংকা করছিলো, এখান থেকেও হয়তো তাদের পালাতে হবে। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে মুসলিম সেনাকে ফিরে যেতে দেখে দু'কর্মকর্তার উদ্দেশে পুরোহিত বললো, 'আমি যদি তোমাদের মতো সৈনিক হতাম তাহলে কাপুরুষের মতো এখানে এসে লুকিয়ে থাকতাম না। মনে হয় না যে তোমাদের শরীরে

রাজপুত ধারার রক্ত আছে। তোমরা কি দেখেছিলে ম্লেচ্ছদের ঘোড়াগুলো আমদের মন্দিরের প্রধান ফটক ভেঙ্গে কিভাবে প্রবেশ করেছিলো? তোমরা কি দেখেছিলে, দুশমন সৈন্যরা আমাদের কৃষ্ণদেবীর মূর্তিগুলোকে কিভাবে পাহাড়ের উপর থেকে নীচে ফেলে ঘোড়ার পায়ে পিষে টুকরো টুকরো করেছে? আমি নিজ চোখে দেখেছি, ম্লেচ্ছ সৈন্যরা আমাদের সরস্বতী ও ভগবতী মূর্তিকে পায়ের নীচে পিষ্ট করেছে। এক মুসলমান সৈন্য আমাদের মন্দির চূড়ায় উঠে আযান দিয়েছিলো, তা কি তোমরা শুনেছিলে? হয়তো শুনে থাকবে। হয়তো পবিত্র গীতা ও মূর্তি মুসলমানদের পদপিষ্ট হতেও দেখে থাকবে। তোমরা রাজপুত হলে শত্রুদের হাতে জীবন বিসর্জন দিতে কিন্তু জীবন নিয়ে পালিয়ে আসতে না। আসলে তোমাদের কাছে ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার চেয়ে জীবনই বেশি প্রিয়।'

"না না মহারাজ!" এক কর্মকর্তা পণ্ডিতের পায়ের দিকে হাত প্রসারিত করে বললো। "আমরা কাপুরুষ নই পণ্ডিত মহারাজ।"

"হাত সরিয়ে নাও।" ঘৃণাভরে বললো পুরোহিত। "তোমরাও ম্লেচ্ছ। যে সৈনিক নিজ ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারে না, তার স্বজাতির কোনো পল্লীতে থাকার অধিকার নেই। তোমাদের উচিত জঙ্গলের জীব-জন্তুদের সাথে বসবাস করা। তোমরা কি ধারণা করতে পারো, আমি এই তিন কুমারীকে কিভাবে শত্রু বাহিনীর বেষ্টনীর মধ্য থেকে বের করে নিয়ে এসেছি? আমি ওদের চেহারায় কালি মাখিয়ে পুরুষের কাপড় পরিয়ে বের করে নিয়ে আসি। আর যারা মন্দিরে রয়ে গেছে তারা কী কঠিন অবস্থার শিকার হয়েছে, তা কি তোমরা জানো!"

"আমরা এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবো মহারাজ।" বললো অপর কর্মকর্তা।

"হু, তোমরা যদি সত্যিই আত্মমর্যাদা বোধসম্পন্ন হতে, তাহলে মন্দির থেকে তোমরা পালিয়ে আসতে না, মন্দির থেকে তোমাদের লাশ বের হতো। তোমাদের আত্মা থাকতো আকাশে। আসলে তোমরাও ম্লেচ্ছ, আত্মপরিচয় লুকিয়ে তোমরা হিন্দু সমাজে বসবাস করছো। দেখো, গজনীর এই সুলতান দেশের অন্য মন্দিরগুলোরও একই অবস্থা করবে। আজ নগরকোট ধ্বংস হয়েছে, আগামীকাল থানেশ্বরের পালা। তোমরা কি জানো, থানেশ্বর আমাদের কাছে এতোটাই পবিত্র মুসলমানদের কাছে মক্কা-মদীনা যেমন পবিত্র। হায়, আজ যদি আমার এই বৃদ্ধ শরীরে শক্তির সঞ্চার হতো, আমি যদি গজনীর মুসলতানকে নিজ হাতে হত্যা করতে পারতাম!"

"এ কাজটি করার জন্যই আমরা এখানে অবস্থান নিয়েছি মহারাজ।" বললো এক কর্মকর্তা। "আমরা পেছনে পড়িনি, ইচ্ছা করেই এখানে থেকে গেছি। আমি সৈনিক নই, আমলা। আমরা যা চিন্তা করি, সৈনিকদের দেমাগে তা কখনো আসবে না। আমরা যতোটুকু আত্মমর্যাদাবোধ লালন করি, তা কোনো রাজা-মহারাজও লালন করে না। জানো, রাজা-মহারাজাদের আত্মমর্যাদাবোধ কম কেন? কারণ, তারা ক্ষমতার পূজারী। মন্দিরের সাথে শাসকদের ভালোবাসা এতোটুকু গভীর নয় মহলের প্রতি তাদের আগ্রহ যতোটুকু তীব্র। রাজমহল যার কাছে বেশি প্রিয় হয়ে ওঠে, মন্দির তার কাছে গুরুত্বহীন হয়ে যায়। দেখো, সুলতান মাহমূদ কোনো অবতার নয়, একজন মানুষ মাত্র। অথচ নগণ্য একজন মানুষ হয়ে এতোগুলো হিন্দু রাজ্যকে সে পায়ের তলায় পিষ্ট করলো! আমি মনে করি, এই একটি মাত্র মানুষকে যদি শেষ করে দেয়া যায়, তাহলে গোটা গজনী বাহিনী আমাদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে প্রাণ ভিক্ষা চাইবে।'

"সুলতান মাহমূদ মানুষ হলেও তাকে হত্যা করা সহজ ব্যাপার নয়।" বললো একজন কর্মকর্তা। "আপনার হয়তো জানা নেই আমি দরবেশের বেশ ধারণ করে দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করেছিলাম, কিন্তু মধ্যে কয়েক জায়গায় আমার পথরোধ করা হয়েছে। আমাকে ঘাটে ঘাটে যাচাই করা হয়েছে। প্রত্যেকবার আমি ওদের বলেছি, ভাই! আমি একজন দরবেশ মানুষ, দুনিয়া ত্যাগী। সুলতানকে মোবারকবাদ জানাতে এসেছি। অনেক অনুরোধের পর সিপাহীরা আমাকে তাদের কমান্ডারের কাছে নিয়ে গেলো। কমান্ডার আমাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের পর আমার শরীর তল্লাশি করে চোগার ভেতর লুকিয়ে রাখা খঞ্জর বের করে এনে বললো, দরবেশের পরিচয় দিচ্ছো, তাহলে সাথে অস্ত্র কেন? আমি বললাম, যে ধর্মের একজন সুলতান দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে একের পর এক রাজ্য দখল করে এতোদূর পর্যন্ত মূর্তিপূজা বন্ধ করতে এসেছেন, সেই ধর্মের একজন অনুসারীর কাছে কি এই অস্ত্রটুকুও থাকবে না, তা কি করে হয়? আমি একজন খাঁটি মুসলমান। আর প্রত্যেক মুসলমানের কাছে আত্মরক্ষামূলক হাতিয়ার থাকা অলংকার। এতো কৌশলে কথা বলার পরও সে আমাকে এক দারোয়ানের হাতে তুলে দিলো। আমি তখন অনুভব করলাম, গজনীর সুলতানের কাছে পৌঁছা মোটেই সহজ কাজ নয়, তাকে হত্যা করা তো দূরের কথা। ব্যর্থ হয়ে অবশেষে আমাকে ফিরে আসতে হয়েছে।"

"আমরা এখন এখানেই থাকবো।" বললো অপর কর্মকর্তা। "এখানে থেকে আমরা অপেক্ষা করবো। সুলতান অবশ্যই বিজিত এলাকা দেখার জন্য বের হয়ে এখানে আসবেন। তখন হয় দূর থেকে তীর মেরে হত্যা করবো, নয়তো কাছে

গিয়ে খঞ্জর দিয়ে তাকে হত্যা করবো। আমরা নিজেদের জীবনের মায়া করি না মহারাজ। যদি আমাদের দু'জনের জীবনের বিনিময়েও হয়...।"

"এটা করতে পারলে তোমরা পরজনমে এদেশের মহারাজা হবে।" বললো পুরোহিত। "ব্রাহ্মণ ও রাজপুতরাও তোমাদের পায়ে মাথা ঠেকাবে।" পণ্ডিত একটু গম্ভীর হয়ে ভেদকথা বলার মতো করে বললো, "আমিও এ কথাই ভাবছিলাম, কিভাবে ওই একটি মাত্র লোককে হত্যা করা যায়। আমার সাথে যে তিন তরুণী এসেছে তোমরা কি তাদের সৌন্দর্য দেখেছো? আমি ভাবছি, কি করে ওদেরকে উপঢৌকন হিসেবে সুলতানের কাছে পৌঁছানো যায়। ওরা সেখানে পৌঁছতে পারলে তার খাবারে বিষ প্রয়োগ করতে পারতো।"

"অসম্ভব।" বললো এক কর্মকর্তা। "আমাদের বলা হয়েছে, এই সুলতান নাকি পাথরের মতো কঠিন। মদ ও নারীর প্রতি তার মোটেও আসক্তি নেই। এ জন্য তার সৈন্যরা কোনো অঞ্চল জয় করলেও সেখানকার কোনো নারীর ইজ্জতের উপর কোনো আঘাত হানে না। কোনো নারীর সম্ভ্রমহানির ঘটনা ঘটে না। সুলতান মাহমূদকে নারীর ফাঁদে ফেলা সম্ভব নয়। অন্য কোনো পথ ভাবতে পারেন।"

"অথচ নারী আর মদই আমাদের মহারাজাদের ডুবিয়েছে।" বললো পুরোহিত। "আর মুসলমানদের বিজয়ের মূল কারণ হলো তারা মদ ও পরনারী ভোগকে ঘৃণা করে। তদুপরি আমাদের কিছু একটা করতেই হবে। আমাদের আরো ভাবতে হবে। আমি রাতে ঘুমাতে পারি না। জীবনভর যে কৃষ্ণমূর্তির পূজা করে কাটিয়েছি, নিজের চোখের সামনে তাদের অমর্যাদা হতে দেখেছি। এ জন্য এদেশের উপর ভগবানের অভিশাপ পড়বে, আমার উপর পড়বে, তোমাদের উপরও পড়বে।"

নগরকোট মন্দির সুলতানের বাহিনী পদানত করেছে প্রায় ৮/১০ দিন হয়েছে। ক'দিন ধরে এই হিন্দু কর্মকর্তা ও পুরোহিত পাহাড়ের পাদদেশের এই পল্লীতে আত্মগোপন করে আছে। হিন্দু দু'কর্মকর্তা তাদের বেশ বদল করে দু'-দু'বার পাহাড়ের উপরে অবস্থিত দুর্গে গিয়েছিলো সুলতান মাহমূদকে হত্যা করার জন্য। কিন্তু সুলতানকে হত্যা করার কোনো সুযোগ তারা পায়নি। এরপরও তারা হতোদ্যম হয়নি। পণ্ডিতের কথাও তাদের হতাশাগ্রস্ত করেনি। সুলতান বিজিত এলাকা পর্যবেক্ষণে বের হলে দূর থেকে বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করার মানসে দু'কর্মকর্তা দু'টি ধনুক, প্রয়োজনীয় সংখ্যক তীর সংগ্রহ করেছে। এলাকাটি ছিলো জঙ্গলাকীর্ণ এবং উঁচু-নীচু অসংখ্য পাহাড়ে

বেষ্টিত। আড়াল থেকে তীর নিক্ষেপ করে লুকিয়ে পড়া কোনো কঠিন ব্যাপার নয়।

ইত্যবসরে আলাসতুগীন পল্লী থেকে চার যুবককে নিয়ে ফিরে আসে। দূর থেকে পুরোহিত ও দু'কর্মকর্তা ভেবেছিলো, গজনীর এই সেনা হয়তো চার যুবককে বেগার খাটানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর এই তিন হিন্দু দেখতে পেলো, পল্লীর চার যুবক এক ব্যক্তিকে কাঁধে করে নিয়ে আসছে। হিন্দু কর্মকর্তারা আলাসতুগীনকে এবার চিনে ফেলে। তাই নিরাপত্তার স্বার্থে তারা লুকিয়ে পড়লো। আলাসতুগীন যখন গ্রামে পৌঁছলো তখন গ্রামের অন্যান্য লোকজনও এসে জড়ো হলো। বুগরা খানকে একটি চৌকিতে শুইয়ে দেয়া হলো। গ্রামের দু'বৃদ্ধা তার আঘাত ও ক্ষতস্থান দেখতে লাগলো। একটু পরীক্ষা করে তারা ক্ষতস্থানের চিকিৎসা শুরু করে দিলো।

আলাসতুগীনের বলে দেয়া কথায় বুগরা খান দুই বৃদ্ধকে তাদের ভাষায় বললো, গ্রামের লোকজন যদি তাদের সাথে কোনো ধরনের দুরভিসন্ধিমূলক কিছু করে, তাহলে সারা গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হবে এবং গ্রামের ছেলে-বুড়ো সবাইকে পাইকারী হারে হত্যা করা হবে।

"আপনারা আমাদের শাসক-প্রভু। গোটা গ্রামের মানুষ আপনাদের সেবায় একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। উল্টো-সিধা করার দুঃসাহস কে করবে? আমরা এর চেয়েও বেশি আঘাতের সুচিকিৎসায় দক্ষ। কোনো চিন্তা করবেন না। ৪/৫ দিনের মধ্যে আপনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যাবেন।"

আলাসতুগীন ও বুগরা খানের জন্য একটি ঝুঁপড়ির মতো ঘর খালি করে সেটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হলো। গ্রামের লোকজনের কাছে সবচেয়ে উন্নত যে বিছানা ছিলো, তাই তাদের জন্য বিছিয়ে দেয়া হলো। রাতে শুয়ে শুয়ে আলাসতুগীন বুগরা খানকে বললো, প্রত্যুষে সে সেনা ক্যাম্পে গিয়ে বুগরা খানকে এখানে থেকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু বুগরা খান তাতে আপত্তি করে বললো, তাকে একাকী ফেলে যাওয়া ঠিক হবে না। একাকীত্বের সুযোগে গ্রামের লোকজন তাকে গায়েব করেও দিতে পারে, নয়তো ক্ষতস্থানে বিষ প্রয়োগ করে ক্ষতি করতে পারে।

দীর্ঘ ক্লান্তি, ক্ষুধা, পিপাসায় কাতরতার কারণে দু'কমান্ডার কিছুক্ষণ পরই গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়। কিন্তু তাদের ঘর থেকে কিছুটা দূরেই অপর একটি ঘরে হিন্দু পুরোহিত, কর্মকর্তা ও চিকিৎসক ক্ষীণ আওয়াজে সলাপরামর্শ করছিলো। পুরোহিত অন্যদের বললো, এই দু'সেনা অফিসারকে আমরা নিজেদের

কাজে ব্যবহার করতে পারি। সেই কৌশল আমাদের জানা আছে। যার দ্বারা কোনো কাপুরুষকেও বাহাদুর আর বাহাদুরকে কাপুরুষে পরিণত করা যায়। সুলতানকে যদি তার নিজের লোকজনের দ্বারা হত্যা করানোর ব্যবস্থা করা যায়, তবে সেটিই হবে সবচেয়ে উত্তম। বললো এক কর্মকর্তা। কারণ, আমরা অনেক চেষ্টা করে দেখেছি, সুলতানের কাছে যাওয়া অপরিচিতের জন্য খুবই কঠিন।

"তোমরা দু'জন শোন!" বৃদ্ধ দু'চিকিৎসককে বললো পুরোহিত। "এ দু'কমান্ডারকে তাড়াতাড়ি সুস্থ হতে দেয়া যাবে না। আমাকে একটি ঘোড়া দাও, আমাকে এখনই থানেশ্বর যেতে হবে। ঘোড়াটা এমন সামর্থবান হতে হবে, যেনো দ্রুত আমি সেখানে যেতে পারি এবং দ্রুত ফিরে আসতে পারি।" দু'কর্মকর্তাকে পুরোহিত বললো, "তিন কুমারীকে আমি তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি। এদের করণীয় সম্পর্কে আমি ওদের বুঝিয়ে বলে যাবো। তোমরা অন্যান্য দিকে খেয়াল রেখো।"

গ্রামের এক লোককে ইশারা করলে তিন তরুণীকে কমান্ডারদের ঘরে নিয়ে আসা হলো। পণ্ডিত তরুণীদের করণীয় কর্তব্য বুঝিয়ে দিলো। এরই মধ্যে ঘোড়া প্রস্তুত করে নিয়ে আসা হলো। পুরোহিত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে দ্রুত চলে গেলো।

ভোরবেলায় আলাসতুগীন ঘুম থেকে ওঠে দেখলো বুগরা খান ব্যথায় কোকরাচ্ছে। আলাসতুগীন বৃদ্ধ চিকিৎসকদের ডাকার জন্য ঘর থেকে বের হতে যাবে, তখনই দরজার পাশে দেখলো দু'তরুণী দাঁড়ানো। আলাসতুগীনকে দেখে ওরা সলজ্জ হাসলো। সুন্দরী তরুণীদের দেখে আলাসতুগীনের চোখ ছানাবড়া। এক তরুণী তার উদ্দেশে কিছু বললেও সে পূর্ববৎ দাঁড়িয়ে রইলো। তার চেহারা দেখেই মনে হলো সে কিছুই বুঝেনি। অপর তরুণী মাথা ঝুঁকিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলো এবং উভয়েই ভেতরে প্রবেশ করে বুগরা খানের পাশে গিয়ে বসলো।

এক তরুণী বুগরা খানের মাথা হাতে নিয়ে বললো, খুব কষ্ট হচ্ছে বুঝি? অপরজন তার হাত নিজের হাতে নিয়ে নিলো। বুগরা খান ঘটনার আকস্মিকতায় নির্বাক হয়ে গেলো। তার মুখ থেকে কোনো কথাই বের হলো না। ব্যথায় সে যে কুঁকাচ্ছিলো, তাও ভুলে গেলো।

"এদের কেউই আমাদের ভাষা বুঝে না।" তরুণী অপর সঙ্গীকে বললো।

"না না, আমি তোমাদের ভাষা বুঝি। কিন্তু আমি তামাদের মতো এমন সুন্দরী তরুণীদের দেখে ভেবে পাচ্ছিলাম না এই জঙ্গলে তোমাদের মতো রূপসী কোত্থেকে এলো? মনে হয় তোমরা এই গ্রামের বাসিন্দা নও।"

"এ জঙ্গলেই আমাদের জন্ম।" বললো এক তরুণী। "এই জঙ্গলে কেউ বিপদে পড়লে, কেউ কোনো আঘাতপ্রাপ্ত হলে আমরা তার সেবা-শুশ্রূষা করে থাকি। আচ্ছা, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম, আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে?"

"ব্যথা খুব বেশি।" জবাব দিলো বুগরা খান এবং তরুণীর হাত তার হাতে তালুবদ্ধ করে নিলো।

"খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠবেন। ঠিক আছে, আমরা আপনার খাবার নিয়ে আসছি।" এই বলে উভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

তরুণীরা যখন খাবার নিয়ে প্রবেশ করলো, তখন ওরা তিনজন। একজনের হাতে হাত-মুখ ধোয়ার পানি, অপর দু'জনের হাতে পানাহার সামগ্রী। খাবারের মধ্যে অন্যতম ছিলো মধু মেশানো দুধ।

এক তরুণী বুগরা খান ও আলাসতুগীনের হাত-মুখ ধুইয়ে দিলো। উভয়েই দুধপান করলো এবং খাবার ও ফলফলাদি আহার করলো। তরুণীরা খাবারের শূন্যপাত্র তুলে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরই বুগরা খানকে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠতে শোনা গেলো। আলাসতুগীন বুগরা খানের হাসি শুনে গভীরভাবে তার চেহারার দিকে তাকিয়ে নিজেও হেসে ফেললো। দীর্ঘদিন পর দু'বন্ধু এভাবে প্রাণখোলা হাসলো। কারণ, হাজারো রণাঙ্গনে তাদের পরাজয় যখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিলো তখন গজনী বাহিনীর কারো বেঁচে থাকার আশা ছিলো না। কিন্তু রাজা আনন্দপালের হাতির চোখে তীরবিদ্ধ হলে সেটি যখন বিকট আর্তচিৎকার দিয়ে ওদের বাহিনীকেই পদপিষ্ট করতে শুরু করলো আর রাজার ঝাণ্ডা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো; তখন হিন্দু বাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে পালাতে শুরু করে।

আলাসতুগীন ও বুগরা খানের প্রতি শত্রু বাহিনীকে তাড়া করার নির্দেশ হলে তারা নিজ নিজ ইউনিটকে নিয়ে শত্রু বাহিনীর পিছু ধাওয়া করে। সেই যুদ্ধে তাদের বহু সহযোদ্ধা শাহাদাতবরণ করেছে। ফলে তাদের হৃদয় থেকে হাসি উধাও হয়ে গিয়েছিলো। সেই যুদ্ধে কোনো বিরতি না দিয়ে সকলকে নগরকোটের দিকে অগ্রাভিযানের নির্দেশ হলো। সেখানে পৌঁছেও কঠিন যুদ্ধ করতে হলো। মৃত্যু যখন চোখের সামনে থাকে, তখন মানুষ কাঁদে। কিন্তু এই দু'কমান্ডার কাঁদার লোক ছিলো না। তারা গজনী থেকে পাহাড়, নদী, জঙ্গল, সমতল ভূমি এবং শত্রু বাহিনীর বাধা ডিঙ্গিয়ে বিজয়ের বেশে নগরকোট পর্যন্ত পৌঁছেছে। এখন বিজিত এলাকার এই ঝুপড়িতে বসে বুগরা খান যখন অট্টহাসিতে মেতে উঠলো, তখন বন্ধুর তাৎপর্যপূর্ণ হাসি দেখে আলাসতুগীনও হেসে ওঠে। আলাসতুগীন বুগরা খানের উচ্ছ্বাসিত হাসিতে আন্দাজ করে, দীর্ঘ ক্লান্তিকর যুদ্ধ

তাদের হৃদয় থেকে হাসি কেড়ে নিয়েছিলো, চাপা দিয়ে রেখেছিলো তাদের প্রাণোচ্ছল আবেগ। যুদ্ধ আর খুনাখুনিই নয়, এখন তাদের ইচ্ছে করে আনন্দ-উল্লাসে মেতে উঠতে, জীবনকে উপভোগ করতে।

বুগরা খান বন্ধু আলাসতুগীনকে জানালো, তার ব্যথা অনেকটাই কমেছে। আলাসতুগীন দরজার দিকে তাকিয়ে ছিলো। বুগরা খানের বুঝতে বাকি রইলো না বন্ধু কিসের জন্য দরজার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু তরুণীর বদলে ঘরে প্রবেশ করলো তাদের চিকিৎসক দুই বৃদ্ধ। এদের দু'জনকে গ্রাম্য অশিক্ষিত মনে হলেও হাবভাব দেখে মনে হলো পেশাগত কাজে তারা খুবই দক্ষ। তারা ঘরে প্রবেশ করে বুগরা খানের ক্ষতস্থান থেকে পট্টি খুললো, ভাঙ্গা পা দেখলো এবং শেষে দু'জন রায় দিলো, সম্পূর্ণ সেরে উঠতে আরো দিন দশেক লাগবে।

তাদের থেকে কিছুটা দূরে আরেকটি ঝুপড়ি ঘরে দু'হিন্দু কর্মকর্তার সামনে তিন তরুণী উপবিষ্ট। এক কর্মকর্তা তরুণীদের উদ্দেশে বললো, "তোমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে। দু'তিন দিন ওদের কাছে বেশিক্ষণ থাকবে না। তাহলে ওদের সন্দেহ হতে পারে। দুধ নিজেরা পান করে পরীক্ষা করে নিও। স্বাদে কোনো তারতম্য ঘটলে তাতে আরো দুধ দিয়ে বেশি করে মধু মিশিয়ে নিও।"

"নেশা ধরানোর ব্যাপারে তোমরাই তো যথেষ্ট। দুধে নেশা মেশানো ছাড়া তোমরাই ওদের নেশাগ্রস্ত করার জন্য যথেষ্ট।" বললো অপর কর্মকর্তা।

"খেয়াল রেখো, তোমরা যেনো আবার নেশায় আক্রান্ত না হয়ে যাও।" বললো অপর কর্মকর্তা। "কারণ উভয়েই কিন্তু তাগড়া যুবক।"

"হয়তো এর চেয়েও আরো কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে তোমাদের।" বললো এক কর্মকর্তা। "নিজের দেশ ও জাতির প্রয়োজনে তোমাদের এই ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। এখন তোমাদের কর্তব্য হলো, পণ্ডিত মহারাজের আসা পর্যন্ত ওদেরকে এখানে আটকে রাখা। পণ্ডিতজী একজন দক্ষ ঋষিকে সাথে নিয়ে আসবেন। তিনি এসে এদেরকে ভক্তে পরিণত করবেন। এরপর দেখো, এদের হাতেই আমরা সুলতানকে হত্যা করাবো।"

সুলতান মাহমূদের দুই খ্যাতিমান কমান্ডার হিন্দুদের চক্রান্তের ফাঁদে আটকে গেলো। দু'তিন দিনের মধ্যেই এরা তাদের কর্তব্য, দায়িত্ব ও অভিষ্ট লক্ষ্যের কথা বিস্মৃত হয়ে গেলো। তারা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি, দুধ ও মধুর সাথে মিশিয়ে তাদেরকে প্রতিদিন নেশাজাতীয় দ্রব্য পান করানো হচ্ছে। এরা যেহেতু শরাব পানে অভ্যস্ত ছিলো না, তাই দুধ ও মধুর সাথে মেশানো সামান্য শরাবেই ওরা

আবেগপ্রবণ হয়ে উঠতো। সেই সাথে রূপসী তিন তরুণীও ওদের মধ্যে সৃষ্টি করে প্রচণ্ড কামনার নেশা।

এভাবে যখন প্রায় সপ্তাহ চলে গেলো। একদিন এক তরুণী বুগরা খান এবং আরেক তরুণী আলাসতুগীনের গায়ে গা মিশিয়ে আবেগ ও বিনয়ী কণ্ঠে নিবেদন করলো, তাদেরকে যেনো সাথে করে গজনী নিয়ে যাওয়া হয়। দু'কমান্ডার এ কথাও ভাবতে পারেনি যে, এই এলাকার মানুষই তো সব কালো। এর মধ্যে সুন্দরী তরুণী আসলো কিভাবে। ওদের জন্মদাতাই বা কে?

দুই বৃদ্ধ বুগরা খানের সেবা-শুশ্রূষা করছিলো আর চিকিৎসা অব্যাহত রাখছিলো। এরই মধ্যে বুগরা খান অনেকটাই সুস্থ হয়ে ওঠে। সে এখন নিজে নিজে হাঁটা-চলাফেরা করতে পারে। তবুও এ গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার কথা একবারও ভাবনায় আসেনি। কমান্ডার আলাসতুগীনের মনও ঝুপড়ির বেড়াজালে বন্দী হয়ে গেছে। একদিন উভয় বন্ধু তরুণীদের বললো, রাতের বেলায় তারা যেনো এ ঘরে একবার আসে। তরুণীরা বললো, রাতের বেলায় এদিকে পা বাড়ালে মা-বাবা তাদের প্রাণে রাখবে না। তাদের পিতা-মাতা তাদেরকে শুধু সেবা-শুশ্রূষা করতেই দিনের বেলা আসতে দেয়।

আসলে প্রশিক্ষিত এই তরুণীরা গজনী বাহিনীর দুই কমান্ডারের সুপ্ত কামনাকে উস্কে দেয়ার চেষ্টা করছিলো। যুদ্ধক্লান্ত দুই কমান্ডারের জন্য তরুণীরা মরিচীকা হয়ে দেখা দিলো। তারা যেভাবে উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে দু'কমান্ডারের প্রতি ভালোভাসা ও মমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতো, তাতে কমান্ডারদের মধ্যে প্রেমের দুর্বিনীত আকর্ষণ সৃষ্টি করে। যৌবনে উদ্দীপ্ত দুই যুবক কমান্ডার যখন রূপসী-তরুণীদের নাঙ্গা কাঁধের উপর বিক্ষিপ্ত রেশমী চুলগুলো নিয়ে খেলা করতো, তখন ভেতরে ভেতরে তাদের মধ্যে কামনার দানব তর্জন-গর্জন শুরু করে দিতো। তারা আবেগে কাঁপতো। আন্দোলিত হতো তাদের দেহ-মন।

এদিকে এদের অবস্থান থেকে কিছুটা দূরে একটি বিশাল মন্দির মূর্তিশূন্য করে সেখানে আযান চালু করেছিলেন সুলতান মাহমূদ। আর এখানে তারই দুই কমান্ডার হিন্দুদের চক্রান্তে পড়ে জ্যান্ত-মূর্তির পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়েছে।

একদিন বুগরা খান তার সেবারত তরুণীকে বললো, "তোমরা আমাকে লাশের দুর্গন্ধ আর রক্তের হোলিখেলা থেকে তুলে এমন পরিবেশে নিয়ে এসেছো, এখানকার ঝুপড়িটাও আমার কাছে রাজমহলের মতো সুখ দিচ্ছে।"

"আপনি চাইলে আমরা আপনাকে সত্যিকার মহলেই নিয়ে যেতে পারবো।" তরুণী বললো। "কিন্তু আমরা যা-ই করি তাতে আপনি আপত্তি করবেন না।" এ

কথা বলেই তরুণী চলে যায়। পুনরায় একটি পেয়ালা হাতে নিয়ে এলো এবং বুগরা খানের সামনে রেখে বললো, "পান করুন। এটি এই মাটির বুনো ফলের রস। এই এলাকা ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না।"

বুগরা খান পেয়ালা হাতে নিয়ে কয়েক ঢোক পান করতেই তরুণী পেয়ালা ছিনিয়ে নিয়ে বললো, "এই রস এক সাথে বেশি পান করা ঠিক নয়।"

জীবনে এমন স্বাদের কোনো জিনিস বুগরা খান পান করেনি। কিছুক্ষণ পরই তার মধ্যে একটা ফুরফুরে আনন্দ দোল খেয়ে যায়। হঠাৎ সে তরুণীকে কাছে টেনে জড়িয়ে ধরে বলে, "এখন আমি চলাফেরা করতে পারি কিন্তু তোমাদের ছেড়ে যাবো না। সুলতান যদি আমাকে তোমাদের ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দেয়, তাও আমি মানবো না।"

"আপনি কি কখনো শরাব পান করেছেন? শুনেছি মুসলমানরা শরাব পান করে না।"

"হু, শরাবকে অভিশম্পাত করি আমি। তোমরা থাকতে আমার শরাবের কোনো প্রয়োজন নেই।" বললো বুগরা খান।

"আমি আপনাকে শরাবই তো পান করিয়েছি। বলুন তো এমন শরাবকে কেনো আপনারা হারাম মনে করেন?"

বুগরা খান শরাব পানের কথা শুনে গম্ভীর হয়ে যায় এবং ভাবনায় পড়ে গেলো। তরুণী বুগরা খানের আরো ঘনিষ্ঠ হতে থাকলো এবং বুগরা খানের চোখের সামনে নিজেকে মেলে ধরলো। খানের চোখে চোখ রাখতেই বুগরা খান ভুলে গেলো হালাল-হারামের বিধি-বিধান।

"আলাসতুগীন!" বন্ধুকে ডাকলো বুগরা খান।

আলাসতুগীন ছিলো ঝুঁপড়ির অপর কক্ষে। সে বন্ধুর ডাকে চলে এলো। বুগরা খান তাকে পেয়ালা দেখিয়ে বললো, "দেখো! সুন্দরীরা কী চমৎকার পানীয়কে শরাব বলছে। নাও, আমি পান করেছি, তুমিও পান করো। ভারী মজার জিনিস।"

আলাসতুগীন বন্ধুর কথায় পেয়ালা হাতে তুলে নিলো এবং পেয়ালার অবশিষ্টটুকু গলাধঃকরণ করলো। কিছুক্ষণ পর বুগরা খানের মতো সেও স্বপ্নীল জগতের বাসিন্দা হয়ে গেলো।

গজনী বাহিনীর দু'কমান্ডার নিজেদের জন্য শরাব হালাল করে নিলো। তারা

এটিকে শরাব বলতেই নারাজ। পরদিন দু'তরুণী তাদের ঘরে প্রবেশ করে দু'জনকে তাদের মুখোমুখি বসিয়ে বলতে লাগলো, "আমরা এ গ্রামের অধিবাসী নই। আমাদের অভিভাবকরা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। আপনাদের সৈন্যরা যখন নগরকোট মন্দির অবরোধ করে তখন আমরা মন্দিরে পূজা দিতে যাচ্ছিলাম। অবরোধের কথা শুনে আমাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে এবং নিজ বাড়িতে না গিয়ে এই পল্লীতে নিয়ে আসে। গ্রামের লোকজনকে বলে, গজনী বাহিনী নগরকোট দুর্গ অবরোধ করে এমতাবস্থায় তরুণী মেয়েদের নিয়ে যাতায়াত করা ঝুঁকিপূর্ণ। আপনারা আমাদের মেয়েদেরকে হেফাজত করুন। পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলে আমরা মেয়েদের নিয়ে যাবো। আমাদের সাথে অপর যে মেয়েটিকে দেখছেন, ও আমাদের প্রতিবেশী। আমাদের অভিভাবক আমাদের নিতে এসেছেন। আপনারা দু'জন আমাদের সাথে চলুন। আমরা বললে আপনাদেরকে নিতেও রাজি হয়ে যাবে।"

বুগরা খানকে তরুণীদ্বয় বললো, আপনি আপনার বন্ধুকেও ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলুন।

বুগরা খান তরুণীদের প্রস্তাবের কথা আলাসতুগীনকে নিজের ভাষায় জানালে সে বললো, "আমরা সেনাবাহিনীর লোক। ওদের সাথে আমাদের যেতে দেখা অবস্থায় আমরা ধরা পড়লে আমরা গাদ্দার ও পক্ষত্যাগী সৈনিক হিসেবে চিহ্নিত হবো। সেনা আইনে আমাদের মৃত্যুদণ্ড হবে। এই তরুণীরা যদি আমাদের সাথে থাকতে চায় তাহলে ওদের এখানেই থাকতে বলো। এদেরকে আমাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থার কথা চিন্তা করবো। ওদের উচিত আমাদের সাথে থাকা।"

তরুণীদ্বয় হতাশ হয়ে চলে গেলো। একটু পর তাদের ঝুঁপড়িতে প্রবেশ করলো দুই প্রবীণ। তারা বললো, "আমরা দু'জন এ মেয়েগুলোর অভিভাবক। ওরা হয়তো আমাদের পরিচয় দিয়েছে। এই যুবতী মেয়েদেরকে নিয়ে রাস্তায় বের হওয়া খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তাই আপনারা যদি আমাদের সাথে থাকেন তাহলে রাস্তায় মেয়েদের কেউ অপহরণ করার চিন্তাও করবে না। আপনারা এর বিনিময়ে যা চান তাই দেয়া হবে।"

"আমরা তোমাদের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি কিন্তু পুরস্কার হিসেবে এই মেয়ে দুটোকে চাই। এ প্রস্তাব যদি তোমাদের পছন্দ না হয় তাহলে একাই চলে যেতে পারো।" বললো বুগরা খান।

“এদের জন্যই তো আমরা এতটা ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি হয়েছি আর এতটা ঝুঁকি নিতে চাচ্ছি।” বললো একজন। “আমরা মেয়েদেরকে তোমাদের হাতে তুলে দেবো কোন্ যুক্তিতে!”

“রাখো তোমাদের যুক্তি। তোমরা মেয়েদেরকে এখান থেকে নিতেই পারবে না।” ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললো বুগরা খান।

* * *

সেদিন রাতের ঘটনা। উভয় তরুণী বুগরা খান ও আলাসতুগীনের পাশে বসে তাদেরকে শরাব পান করাচ্ছিলো। শরাবের নেশায় উভয়েই ছিলো নেশাগ্রস্ত। ঝুঁপড়ির দরজা ছিলো খোলা। রাতের প্রথম প্রহরের পর ঝুঁপড়িতে সন্ন্যাসীর মতো এক লোক প্রবেশ করে। লম্বা চুল ও চোয়াল ভরা দাড়ি। লোকটি চোগা পরিহিত। হাতে লম্বা লাঠি। লাঠির মাথায় কাঠের তৈরি সাপের প্রতিকৃতি। তরুণীদ্বয় সন্ন্যাসীকে দেখেই চকিতে ওঠে এসে তার পায়ে হাত রেখে প্রণাম করে এবং বুগরা খান ও আলাসতুগীনকে জানায়, “ইনি একজন সন্ন্যাসী। এপথে হঠাৎ করে আসেন। কেউ তার ঠিকানা জানে না এবং তার ধর্মের কথাও বলতে পারে না। এই সন্ন্যাসী ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন। জঙ্গলের সাপও তার কথা শুনে। রাজা-মহারাজা তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে কিন্তু তিনি দুনিয়ার কোনো সুখ-আহ্লাদ ভোগ করেন না। জঙ্গলেই থাকেন।”

“তোমার তো জীবিত থাকার কথা ছিলো না। এতোটাই উপর থেকে তুমি পড়েছিলে যে মৃত্যুর আশংকা এখনো পুরোপুরি কেটে যায়নি। এসো, আমার কাছে এসো।” বললো সন্ন্যাসীরূপী লোকটি।

সন্ন্যাসী বুগরা খানকে তার সামনে বসিয়ে প্রদীপটি কাছে টেনে নিলো। সে পকেট থেকে একটা হীরার মতো কিছু বের করে বুগরা খান ও তার মাঝখানে এমনভাবে ধরলো যে, প্রদীপের আলো পড়তেই সেটি থেকে বিভিন্ন রঙ বিচ্ছুরিত হতে থাকে। রঙের এই খেলা ছিলো খুবই মনোহরি।

সন্ন্যাসী বুগরা খানকে বললো, “এদিকে তাকাও এবং হীরাটি দেখতে থাকো। লক্ষ্য করো, এর মধ্যে তুমি জীবন-মৃত্যুকে নিজের চোখে দেখতে পাবে। আমি পরীক্ষা করে দেখবো, কোন্ ঘরে আছে তোমার আত্মা– মৃত্যুর ঘরে না জীবনের ঘরে।”

হীরের টুকরো থেকে বিচ্ছুরিত রঙ আর সন্ন্যাসীর কথার মধ্যে এমন জাদু ছিলো যে বুগরা খান আত্মহারা হয়ে যেতে লাগলো। অর্ধ অবচেতন তো সে শরাব পান করেই হয়েছিলো। এবার সন্ন্যাসীর কথা ও জাদুকরী হীরের ঝিলিকে

সে সম্পূর্ণ আত্মহারা হয়ে গেলো। সে মোটেও আন্দাজ করতে পারেনি যে, সন্ন্যাসী নিষ্পলক তার চোখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সন্ন্যাসী হীরের টুকরোটিকে উপরের দিকে তুলে তার চোখের সামনে রাখলো। বুগরা খান হীরার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো। একসময় সন্ন্যাসী হীরের টুকরোটিকে চোখের সামনে থেকে সরিয়ে ফেললো। কিন্তু বুগরা খান তা মোটেও টের পেলো না। এবার বুগরা খান এক পলকে সন্ন্যাসীর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো। সন্ন্যাসী এখন যা বলছে, চোখের দৃষ্টির মাধ্যমে তা বুগরা খানের ভেতরে প্রবেশ করছে। তার মধ্যে সৃষ্টি করছে স্বপ্নালুতা। সন্ন্যাসীর বলার ধরনও ছিলো মোহনীয়। সন্ন্যাসী এভাবে কথা বলছিলো যে, সে কোনো স্বপ্নিল জগতে বিচরণ করছে।

এক পর্যায়ে বুগরা খান বলতে শুরু করলো, "হ্যাঁ হ্যাঁ, এইতো আমি জান্নাত পেয়ে গেছি। আমার কাছ থেকে এ জান্নাত কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। হ্যাঁ, আমিই গজনীর বাদশাহ। আমি খুন করে ফেলবো। আমার তরবারী অনেক দিন কাউকে হত্যা করে না...।"

পাশে বসে আলাসতুগীন দেখছিলো সন্ন্যাসীর কর্মকাণ্ড। কিন্তু সে এসবের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিলো না। শুধুই অবাক হয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে ছিলো।

এবার বুগরা খানকে ছেড়ে দিয়ে আলাসতুগীনকেও অনুরূপ পরীক্ষার নামে জাদুকরী প্রভাবে স্বপ্নিল জগতে বিচরণ করালো সন্ন্যাসী। কিছুক্ষণ পর সেও বুগরা খানের মতোই স্বপ্নিল জগতে বিচরণ করতে লাগলো।

মানুষ যখন অপরাধ ও পাপের মাধ্যমে নিজের কর্তব্যকে চেপে রাখে তখন ভোগবাদিতার স্বপ্নিল জগতে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে মোটেও কুণ্ঠাবোধ করে না। পাপাচার ও মদের বিস্ময়কর কার্যকারিতা হলো এসব মানুষের আত্মশক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়। অমুসলিমরা শত শত বছর আগে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করতে যে স্বপ্নময় পাপাচারের দ্বারা আকৃষ্ট করতো, কৌশলের ধরন পরিবর্তন হলেও আজও সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

ইসলাম একটি আদর্শ, সৎ চরিত্রের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে ইসলামের ভিত্তি। কিন্তু ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের পদানত করার জন্য পাপাচারের মনোহরি দিকটাকেই ব্যবহার করে। পাপাচারের মধ্যে এমন দুর্বিনীত আকর্ষণ রয়েছে যে, তা মানুষের দুর্বলতাগুলো উস্কে দেয় এবং আত্মশক্তিকে দুর্বল করে ফেলে। মুসলমানদের দুর্বলতা ও মূল শক্তির উৎসকে অগ্নিপূজারী পৌত্তলিক ও ইহুদীবাদীরা চিহ্নিত করে এগুলো নিঃশেষ করার নব নব কৌশল উদ্ভাবন করছে।

ইহুদীরা মুসলিম মেধা ও শক্তিগুলোকে ধ্বংস করার জন্য তাদের সুন্দরী ললনাদের ব্যবহার করেছে। খৃষ্টানরা মুসলিম তরুণদের বিভ্রান্ত করতে আজও তাদের সুন্দরী কন্যা-জায়াদের ব্যবহার করে। মুসলিম তরুণদেরকে আজও চক্রান্তকারী ইহুদী-খৃষ্টান-পৌত্তলিকরা মদের নেশা, নারী আর ধন-সম্পদের টোপ দিয়ে আদর্শচ্যুত করছে। ওদের মনোলোভা ফাঁদে পড়ে মুসলিম মিল্লাতের বহু বাঘা বাঘা সমাজপতিও ধ্বংস হয়ে গেছে।

বুগরা খান ও আলাসতুগীনের দেমাগ দুই রূপসী শরাব খাইয়ে আগেই কব্জা করে নিয়েছিলো। ওরা আক্ষরিক অর্থেই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলো। উভয়েই আত্মশক্তি ও বোধ হারিয়ে ফেলেছিলো। যোগী সন্ন্যাসীদের জাদুকরী তৎপরতা আজও বহাল রয়েছে। জাদুকরী প্রভাব প্রয়োগ করে এরা লাঠিকেও সাপে পরিণত করতে পারে। সমবেত বহুজনকে জাদু করে এরা বিভ্রান্ত করতে পারে। এখন তো জাদু একটি শিল্প হিসেবে সারা দুনিয়া জুড়ে আদৃত।

এই জাদুকরদের নিয়ে আসার জন্য দু'আমলাকে এখানে রেখে তারা অজ্ঞাত স্থানে চলে গিয়েছিলো। শুরুতে পুরোহিত তরুণীদের অভিভাবক হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করে। তরুণী দু'জন বুগরা খান ও আলাসতুগীনকে তাদের সাথে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলে উভয়েই তা প্রত্যাখ্যান করলো। এরপরই এদেরকে জাদু করে অন্ধভক্তে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেয় পুরোহিত। মদ ও নারীর প্রভাব আগেই তাদেরকে আদর্শচ্যুত করে ফেলেছিল, বাকিটা যোগী এসে জাদু প্রয়োগ করে পূর্ণ করলো।

ভোরের আলো বিকশিত হওয়ার আগেই রওয়ানা হয়ে যাওয়া এই কাফেলা নগরকোট থেকে বহু দূরে চলে গিয়েছিলো। বুগরা খান ও আলাসতুগীন ঘোড়ার পিঠে আর অন্যরা উটের পিঠে আরোহণ করেছে। হিন্দু পুরোহিত ও তার দুই আমলা সঙ্গীসহ জাদুকরও কাফেলার সহযাত্রী। বুগরা খান ও আলাসতুগীন রাজপুত্রের মতো মাথা উঁচু করে রাজকীয় চালে অশ্বের উপর উপবিষ্ট। ওরা তো আনন্দে আত্মহারা আর যারা ওদেরকে জাদুকরী প্রভাবে গোলামে পরিণত করেছে, ওদের মুখে হাসি নেই; ওরা কার্য সিদ্ধি চূড়ান্ত করণের চিন্তায় মগ্ন।

কাফেলা চলতে চলতে মাঝে-মধ্যে পথে থামতো, আবার চলতো। আর বিশ্রামের সুযোগে বুগরা খান ও আলাসতুগীনকে পানীয় ও খাবারে নেশাদ্রব্য খাওয়ানো অব্যাহত রাখলো। ধীরে ধীরে এরা নিজেদের ধর্ম-দেশ ও আদর্শ ভুলে অন্ধকারে তলিয়ে যেতে লাগলো।

এক সময় কাফেলা থানেশ্বর পৌছলো। সেই যুগে থানেশ্বর মন্দির ছিলো ভারতের বিখ্যাত মন্দিরগুলোর শীর্ষ দু'টির একটি। হিন্দুরা থানেশ্বর মন্দিরকে মুসলমানদের কাবা'র মতোই সম্মান করতো। থানেশ্বর মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের জানা ছিলো, গজনী বাহিনীর দু'কমান্ডারকে নেশাগ্রস্ত করে থানেশ্বর নিয়ে আসা হচ্ছে। এদের হাতে মাহমূদ গযনবীকে হত্যা করানো হবে। কেননা, নিজ বাহিনীর উর্ধ্বতন ব্যক্তি ছাড়া কারো পক্ষে সুলতান মাহমূদের ধারে-কাছে যাওয়া সম্ভব নয়।

বুগরা খান ও আলাসতুগীনের জন্য মন্দিরের পাতালপুরীতে দু'টি কক্ষ সাজানো হলো। কক্ষ দু'টিকে রাজমহলের আদলে খুশবো ও বাহারী আসবাবপত্রে সাজানো হলো। তুলতুলে নরম বিছানার উপর গেলাফ বিছানো হলো। ছাদে ঝুলিয়ে দেয়া হলো রঙিন ফানুস। দুই কমান্ডার সেখানে পৌছলে তাদেরকে রাজকীয় অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হলো। অভ্যর্থনাকারীরা তাদের গমন পথে মাথা অবনত করে কুর্নিশ করলো। তাদের সাজানো কক্ষে পৌছে দেয়ার সাথে সাথেই কিছু মহিলা সেবার জন্য এসে উপস্থিত হলো। কিন্তু এরা তরুণী নয়, বয়স্ক মহিলা।

কাফেলা থানেশ্বর পৌছার পরই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হিন্দুদের আলাদা করে তাদের জানালো, সুলতান মাহমূদ গজনী চলে গেছে। সামান্য কিছু সংখ্যক সৈন্য নগরকোট রেখে গেছে। এটা জানা সম্ভব হয়নি, তাড়াতাড়ি সে ফিরে আসবে নাকি দীর্ঘ সময় সেখানে থাকবে। এমতাবস্থায় এদেরকে এখানে রাখার মধ্যে কোন লাভ আছে বলে মনে হয় না।

"সুলতান অবশ্যই আসবে পণ্ডিত মহারাজ!" বললো দুই আমলা। "এই দুই লোক আমাদের হাতে এসে গেছে। এদেরকে আমরা নিজেদের মতো করে তৈরি করতে পারবো। এরা আমাদের উপকারে আসবে। এদের দিয়েই আমরা মাহমূদকে খুন করাতে পারবো।"

দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর হিন্দু পুরোহিত ও সন্ন্যাসী জাদুকর ও আমলাদ্বয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, বুগরাখান ও আলাসতুগীনকে থানেশ্বর মন্দিরেই রাখা হবে এবং এদের দিয়ে সুলতান মাহমূদকে হত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

সুলতান মাহমূদ জরুরী খবর পেয়ে গজনী চলে এলেন। গজনীর পশ্চিমে গৌড় নামের একটি পাহাড়ী এলাকা শাসন করতো মুহাম্মদ বিন সূরী। মুহাম্মদ বিন সূরী সুলতান মাহমূদকে হিন্দুস্তানে ব্যস্ত দেখে দশ হাজার সদস্যের এক সৈন্য

বাহিনী নিয়ে গজনীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এসে তাঁবু গাড়লেন। তাঁবুর চারপাশে পরিখাও খনন করলেন তিনি। তাছাড়া তার তাঁবুর তিনদিকেই ছিলো উঁচু পাহাড়। শুধু একদিকে পরিখা ও পাহাড় ছিলো না। চতুর্দিকে প্রাকৃতিক পাহাড়ী প্রতিরক্ষার কারণে মুহাম্মদ সূরীর তাঁবুটি দুর্গের মতো সুরক্ষিত প্রমাণিত হলো। ফলে তাঁবু থেকে কিছু সংখ্যক সৈন্য বেরিয়ে গজনী বাহিনীর উপর ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে দ্রুতগতিতে তাঁবুতে ফিরে যেতো। এভাবে তারা গজনী বাহিনীর চৌকিগুলোতে একের পর এক আক্রমণ করে বিপর্যস্ত করে তুলে।

দু'দিন গজনী সেনাদের দু'টি দল আক্রমণকারীদের তাড়া করে তাঁবু পর্যন্ত নিয়ে গেল কিন্তু তাঁবুর চতুর্দিকে পরিখা থাকায় আর সামনে অগ্রসর হতে পারলো না। যে পথটা ছিলো সেদিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করতেই সেখানে থাকা তীরন্দাজরা তাদের উপর তীরবৃষ্টি বর্ষণ করলো। কিছুক্ষণ তীর নিক্ষেপের জবাবে তীর নিক্ষেপ করে ফিরে আসা ছাড়া কোন উপায় ছিলো না। গজনীর সৈন্যরা পেরেশান হয়ে গেলো সূরীদের আক্রমণে। সূরী বাহিনী গজনী বাহিনীর শক্তি ক্ষয় করে দুর্বল করার পর এক সময় আক্রমণ করে গজনী দখল করার চিন্তা করছিলো। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে গজনীর নিরাপত্তায় নিয়োজিত সেনাপতি সুলতানকে বিষয়টি অবহিত করা জরুরী মনে করলেন।

সূরীদের গজনী আক্রমণের সংবাদ সুলতান মাহমূদের কাছে যখন পৌঁছল, তখন তিনি নগরকোট মন্দির ও সেনা শিবির অবরোধ করেছেন মাত্র। গজনী আক্রান্তের খবর শুনে সুলতানের মাথায় বাজ পড়লো। তিনি নগরকোটে আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। প্রচণ্ড আক্রমণের কারণে নগরকোট দুর্গবাসীরা প্রতিরোধে টিকতে না পেরে হাতিয়ার ফেলে আত্মসমর্পণ করলো। দ্রুত মন্দির থেকে সব মূর্তি ফেলে দিয়ে দুর্গ দখল শেষে সেনাবাহিনীকে দু'ভাগে ভাগ করে একটি অংশ নিজের সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য আলাদা করলেন আর একটি অংশ নগরকোট দুর্গের প্রশাসন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নিয়োগ করলেন।

এমনিতেই সুলতান মাহমূদের যাত্রা হতো অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে। কিন্তু সে দিনের মতো আর কখনো সুলতান মাহমূদকে এতোটা ক্ষুব্ধ দেখা যায়নি। অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে অস্বাভাবিক দ্রুততার সাথে সুলতান মাহমূদ গজনীতে পৌঁছে গেলেন। রাস্তায় তিনি সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন, আমাদের সফর হবে খুবই দ্রুত। তাই তোমরা চলাবস্থায়ই সওয়ারীগুলোকে ফসলের ক্ষেতের মধ্যদিয়ে ছেড়ে দিও। উট, ঘোড়া, হাতিগুলো যাতে চলতে চলতে কিছুটা খেয়ে নিতে পারে। আর পদাতিক সৈন্যদেরকে তিনি বলে দিয়েছিলেন, তোমরা পথিমধ্যে কোন বসতি পেলে তাদেরকে খাবার দিতে নির্দেশ দিবে।

সুলতান মাহমূদ যুদ্ধ করতেন প্রতিপক্ষের সৈন্যদের সাথে। শাসকরাই হতো তার প্রতিপক্ষ। সাধারণ নাগরিকদের জন্য তিনি কখনো কষ্টের কারণ হননি। বরং তার সৈন্যরা বেসামরিক নাগরিকদের জান-মালের নিরাপত্তা দিয়েছে। কিন্তু এবার তিনি গজনী আক্রান্তের কথা শুনে স্বজাতি গাদ্দার ও পরাজিত আনন্দ পালের মৈত্রী চুক্তিবিরোধী তৎপরতায় চরম ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিলেন। দ্রুত গজনী পৌঁছানোর জন্য তার সৈন্য ও সওয়ারদের এর বিকল্প ছিলো না।

সূরীদের ধারণার চেয়ে অনেক আগে সুলতান মাহমূদ গজনী পৌঁছে গেলেন। গজনী পৌঁছেই তিনি মুহাম্মদ বিন সূরীকে দূতের মাধ্যমে এই বলে পয়গাম পাঠালেন যে, "জাতির গাদ্দারদের পরিণতি কখনো ভালো হয় না। ইসলামী সালতানাতকে টুকরো টুকরো করে শাসনকারী ক্ষমতালিপ্সুদের পায়ের তলা থেকে শুধু ক্ষমতার মসনদই দূরে সরে যায় না, মাটিও থাকে না। জাতিকে প্রতারিত করে স্বজাতির মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ে লিপ্তকারীদের শাস্তি দুনিয়াতেই ভোগ করতে হয়। সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে হাতে কুরআন নিয়ে অঙ্গীকারকারী শাসকদের রাজমহলই এক সময় জাহান্নামে পরিণত হয়।... নিজের আখেরাত ও জাগতিক মঙ্গল চাইলে শত্রুতা না করে আমাকে সহযোগিতা করো। চলো আমার সাথে হিন্দুস্তানে। সেখানে মুহাম্মদ বিন কাসিমের আযাদ করা মুসলিম বসতিগুলো এখন মূর্তি পূজারীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। চলো সেখানে গিয়ে পরিত্যক্ত বিরান মসজিদগুলোকে আবাদ করি এবং বিভ্রান্ত মুসলমান ও হিন্দুদেরকে সিরাতে মুস্তাকিমের পথ দেখাই।... আমি তোমাদের কাছে আবেদন করছি না। বেঈমানী ও ঈমানের সওদাগরী তোমাকে যেদিকে ঠেলে দিচ্ছে, আমি এর অশুভ পরিণতি দেখতে পেয়ে তোমাকে সতর্ক করছি। ক্ষমতার মোহ তোমাদের এমন আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবে যে, কেয়ামত পর্যন্ত মানুষ তোমাদের নামে অভিশাপ বর্ষণ করবে। আমি তোমাকে দু'দিনের অবকাশ দিচ্ছি। আমার সহযোগী হতে চাইলে এসো। নয়তো সৈন্যদের নিয়ে গজনী ছেড়ে চলে যাও।"

সুলতানের দূত যখন মুহাম্মদ বিন সূরীর কাছে পয়গাম নিয়ে গেলো, সূরী রাজকীয় ভঙ্গীতে দূতের কাছ থেকে পয়গাম নিয়ে বললেন, "মৈত্রী চুক্তির জন্য পয়গাম নিয়ে এসেছো?" সূরীর প্রশ্নে দূত নীরব রইলো।

এক নিঃশ্বাসে মুহাম্মদ বিন সূরী সুলতানের পয়গাম পড়ে অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়ে বললো, "তোমাদের সুলতান কি আমাকেও আনন্দপ াল আর বিজি রায় মনে করেছে! যাও, ওই ভূতটাকে বলো, মুহাম্মদ বিন সূরী তোমার কথায় রাজি

নয়। যদি সাহস থাকে তাহলে তুমি এসো। আমরা ফিরে যাওয়ার জন্য এখানে আসিনি।"

মুহাম্মদ বিন সূরী এক পর্যায়ে হুংকার দিয়ে দূতকে বললো, "যাও! ওই গোলামের পুত্র গোলামকে বলো, সে যেনো তাড়াতাড়ি এখানে এসে আমার সাথে দেখা করে এবং আসার সময় গজনী সালতানাতকেও যেন একটি পাত্রে করে নিয়ে আসে।"

সূরীদের কাছ থেকে সুলতান মাহমূদ এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করেননি। যুদ্ধ জয়ের চেয়ে এরা বেশি পারদর্শী ছিলো লুটতরাজে। সুলতান মাহমূদের পিতা সুলতান সুবক্তগীনের শাসনামলেও গোরীরা গজনীর আশপাশের এলাকায় লুটতরাজ করতো। এ পর্যায়ে সুলতান মাহমূদ এদেরকে চূড়ান্ত শিক্ষা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। এর আগে কোনদিন গোরীরা গজনীর আশপাশে এসে সৈন্য সমাবেশ করার সাহস করেনি। এবারই প্রথম মুহাম্মদ বিন সূরী দশ হাজার গোরী সৈন্য নিয়ে গজনীর পার্শ্ববর্তী ময়দানে তাঁবু গাড়লো। সুলতান মাহমূদ তার দুই সেনাপতি জেনারেল আলতুনতাস ও জেনারেল আরসালান জাযেবকে বললেন, আমি গোরী শাসকদেরকে চূড়ান্ত শিক্ষা দিতে চাই। আপনারা এ জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিন।

সুলতান মাহমূদ বেশভূষা বদল করে সূরীদের ক্যাম্প পর্যবেক্ষণ করার জন্য বেরিয়ে পড়লেন। তিনি সূরীদের ক্যাম্প নির্মাণের কৌশল ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেখে মনে মনে ওদের প্রশংসা করলেন। সেই সাথে ওদের শিবিরকে কবরস্তানে পরিণত করার বিষয়টিও ভাবতে লাগলেন। কিন্তু সূরীদের শিবির উজাড় করার বিষয়টি তার দৃষ্টিতে মোটেও সহজসাধ্য মনে হচ্ছিলো না।

অনুরূপ একটা শিবির সুলতান খিদরী নামক স্থানে স্থাপন করেছিলেন। সে সময় শত্রুবাহিনী তাদের উপর আক্রমণ করে বটে কিন্তু তাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারেনি বরং শত্রুবাহিনীই নাস্তানাবুদ হয়। সূরীদের প্রতিরক্ষা ব্যূহ এবং শিবির স্থাপন কৌশল দেখে সুলতান চিন্তান্বিত হলেন। তিনি পর্যবেক্ষণ শেষে শিবিরে পৌঁছে সেনাধ্যক্ষদের বললেন, শত্রুবাহিনী মজবুত প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করে শিবির স্থাপন করেছে, ওদেরকে শিবির থেকে বের করে আনা সহজ হবে না।

সারারাত চললো সামরিক কৌশল নিয়ে চিন্তা-ভাবনা। অবশেষে শেষরাতের মধ্যেই সৈন্যদের যাত্রা শুরুর নির্দেশ দিলেন তিনি। সৈন্যদেরকে শত্রু শিবির থেকে কিছুটা দূরে পূর্ণ রণপ্রস্তুতিতে থাকার নির্দেশ দিলেন। সকাল বেলা তিনিও

গিয়ে সৈন্যদের সাথে যোগ দিলেন। সেখানে পৌছার সাথে সাথেই আক্রমণের হুকুম দিলেন সুলতান। কিন্তু সূরী সৈন্যরা সুলতানের বাহিনীকে ওদের ক্যাম্পের ধারে কাছে যেতেও দিলো না। শেষ পর্যন্ত যে অংশে পরিখা নেই সেই অংশে একযোগে হামলে পড়ার নির্দেশ দিলেন। সূরীর সৈন্যরা ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। তারা সুলতান মাহমূদের সৈন্যদের নাজেহাল করতে লাগলো।

সূরীরা ছিলো সুবিধা মতো স্থানে। তারা শিবির থেকে বেরিয়ে এসে সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। কঠোর আক্রমণের মুখে পিছু চলে যেতো। মুখোমুখি ছাড়া আর কোন দিক থেকে তাদের উপর আক্রমণ করা সম্ভব ছিলো না। কারণ, তাদের শিবিরটি ছিলো তিনদিকে পাহাড় বেষ্টিত, সেই সাথে তাদের শিবিরগুলো পরিখা দিয়ে সুরক্ষিত।

দিনের প্রথম প্রহরে সহযোদ্ধা দুই জেনারেলকে নতুন একটি চালের কথা বললেন সুলতান। সেই কৌশল মতো যুদ্ধের কায়া বদলে ফেললেন। সুলতান নিজেও সেনাদলের মধ্যভাগে আক্রমণে শরীক হলেন। মুহাম্মদ বিন সূরী সুলতানকে এগিয়ে আসতে দেখে তার আক্রমণ প্রতিহত করতে আরো দু'টি ইউনিটকে শিবিরের বাইরে গিয়ে আক্রমণ করতে নির্দেশ দিলো। তখন পর্যন্ত সূরীরা প্রাধান্য বজায় রেখেছিলো আর সুলতানের বাহিনী ছিলো অনেকটা চাপের সম্মুখীন।

তুমুল সংঘর্ষ বেঁধে গেলো গজনী ও সূরী বাহিনীর মধ্যে। এক পর্যায়ে সুলতান ধীরে ধীরে পিছু হটতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি এমন নির্দেশ দিলেন যে, তার সৈন্যদেরকেও এ নির্দেশ হতবাক করলো। হঠাৎ তিনি নিজেই চিৎকার দিয়ে বললেন, "বন্ধুরা সবাই পালাও, সূরীরা নয়তো কাউকে জীবিত রাখবে না।" এ কথা বলে তিনি নিজেও ঘোড়া ঘুরিয়ে পিছু ছুটলেন। তার সারি থেকে আরো কয়েকজনের কণ্ঠে এ ধরনের আহ্বান শোনা গেলো।

সূরীদের কানেও গেলো এই আওয়াজ। মুহাম্মদ বিন সূরী সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছিলো। অবস্থাদৃষ্টে সে গজনী বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করার নির্দেশ দিলো। বললো, ওদের কাউকেই গজনী ফিরে যেতে দিও না। মাহমূদকে আমার সামনে জীবিত ধরে আনো, আর গজনীর প্রতিটি ইট খুলে ফেলো।

বিজয়ের আতিশয্যে সকল সূরী সৈন্য শিবির থেকে বেরিয়ে পড়লো। শিবির হয়ে পড়লো সৈন্যশূন্য। প্রায় মাইল তিনেক দূরে গিয়ে সুলতান মাহমূদ পিছুহটা মুলতবী করে পূর্ব নির্দেশ মতো পলায়নপর সৈন্যদেরকে পশ্চাদপসরণ না করে

ঘুরে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিলেন। সুলতানের সকল কমান্ডারের জানা ছিলো, এই পশ্চাদপসারণ সুলতানের একটা রণচাল। সুলতান ঘুরে দাঁড়িয়েই তাকে ধাওয়াকারী সূরী সৈন্যদের উপর বজ্র আক্রোশে হামলে পড়লেন। শুরু হলো তুমুল মোকাবেলা। এদিকে জেনারেল আরসালান এই সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিলেন। তিনি পেছন ঘুরে সূরীদের একপাশে আক্রমণ করলেন, আর অপরজন সূরীদের শিবিরে প্রবেশের পথ বন্ধ করে দিলেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেন, রণকৌশলে অনভিজ্ঞ সূরী বাহিনী সুলতানের দূরদর্শী ফাঁদে আটকে যায়। বস্তুত এবার গজনী বাহিনীর হাতে সূরী বাহিনী কচুকাটা হতে লাগলো।

সেদিনের সূর্য ডোবার আগেই সূরীদের সূর্য চিরদিনের জন্য ডুবে গেলো। মুহাম্মদ বিন সূরী পালানোর অবকাশ পেলো না। একটি খাদের আড়াল থেকে দু'জন অনুচরসহ মুহাম্মদ বিন সূরীকে পাকড়াও করে সুলতানের সামনে হাজির করা হলো।

মুহাম্মদ! মাত্র একদিন আগে আমি তোমাকে যা লিখেছিলাম, তা আজ বাস্তবে প্রতিফলিত হয়েছে। তোমাকে পরাজিত করে আমি মোটেও উৎফুল্ল নই। এই লড়াইয়ে যে রক্তক্ষয় হয়েছে সেই রক্ত অন্য কাজে ব্যবহার করা উচিত ছিলো। আল্লাহর এই বিষয়টা আমি বুঝতে পারি না, শাসকের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিরপরাধ নাগরিকদের কেন ভোগ করতে হয়!

সুলতান মাহমূদ বলছিলেন আর এদিকে মুহাম্মদ বিন সূরীর শরীর নীচের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলো। প্রথমে তার মাথা হাঁটুর ফাঁকে ঝুঁকে পড়লো। এরপর গড়িয়ে পড়লো মেঝেতে এবং একটা কাঁপুনী দিয়ে শরীরটা নিথর হয়ে গেলো। প্রহরীরা তাকে ধরে উঠাতে গেলো। দেখা গেলো, তার চোখ উল্টে গেছে এবং তার শরীর থেকে প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে।

মুহাম্মদ বিন সূরীর সাথে তার যে দু'জন অনুচর ছিলো তারা জানালো, সূরীর হাতের আংটিতে একটি বিষাক্ত হীরা ছিলো। পরাজয় ও পাকড়াও অনিবার্য হয়ে পড়ায় সে আংটির হীরাটি খুলে গিলে ফেলে। ঠিক সেই সময়ই সৈন্যরা আমাদের পাকড়াও করে এখানে নিয়ে আসে।

১০১০ খৃস্টাব্দ মোতাবেক ৮০১ হিজরী সনের গ্রীষ্মকালে সংঘটিত হয়েছিলো এই যুদ্ধ।

হিন্দুস্তান থেকে গজনী ফিরে আসার মধ্যে ছয়-সাত মাস কেটে গেছে। এর মধ্যে সুলতান মাহমূদের কাছে খবর আসতে লাগলো, দিল্লী থেকে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরে থানেশ্বরে একটি বিশাল মন্দির রয়েছে। সেখানে নানা ধরনের মূর্তি

রয়েছে। বিশেষ করে বিষ্ণু দেবতার মূর্তিকে মানুষ আদমের চেয়েও বেশি পুরনো মনে করে। সেটির বেদীতে পূজা দেয়ার জন্য বহু দূর থেকে পূজারীরা আসে এবং বিষ্ণুকে পূজা দিতে পারলে হিন্দুরা মুসলমানদের কাবা জিয়ারতের মতো পুণ্যলাভ করে বলে সুখানুভব করে।

পৌত্তলিকতা বিরোধী আকীদা ও বিশ্বাসের কারণেই সুলতান মাহমূদ সকল মূর্তি ধ্বংসের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেই সাথে তার গোয়েন্দারা তার কাছে রীতিমতো খবর পাঠাচ্ছিলো যে, নগরকোট ও খিদরোর যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর হিন্দুরা হতোদ্যম হয়ে পড়েছে। চোখের সামনে তাদের দেব-দেবীদের এহেন দুর্গতি ও ধ্বংসের পরও মুসলমানদের কোন ক্ষতি না হওয়ায় অনেকেই হতাশ। সেই সাথে মুসলিম সৈন্যরা তাদের সামনে অসংখ্য গরুকে জবাই করে খেয়ে ফেলে। যে গরুকে হিন্দুরা গো-মাতা বা গো-দেবতা হিসেবে পূজা করে এবং তারা গরুর গোশত খাওয়া হারাম মনে করে।

সুলতানের সৈন্যরা তাঁর কাছে খবর পাঠাতে লাগলো, গোটা হিন্দুস্তানের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। গোটা জাতিই ভীতসন্ত্রস্ত। অবস্থা এমনই ভয়াবহ যে, আকাশের গর্জন শুনেও এরা মূর্তির সামনে হাত জোড় করে কান্নাকাটি শুরু করে দেয় নিরাপত্তা কামনা করে। এই পরিস্থিতিটা সুলতান মাহমূদের সহায়ক ছিলো। সূরীকে চিরদিনের জন্য নিঃশেষ করে দীর্ঘ বিশ্রাম না নিয়েই তিনি পেশোয়ারের দিকে অভিযানের নির্দেশ দিলেন। পেশোয়ার পৌঁছেই তিনি বেরা ও নগরকোটে দু'জন পয়গাম বাহক আর দূতকে পাঠালেন। নগরকোটের সৈন্যদের বলা হলো সম্পূর্ণ রণপ্রস্তুতি নিয়ে রাখতে। কারণ, সুলতান থানেশ্বর অভিযান চালাতে আসছেন।

বিশেষ দূতকে রাজা আনন্দ পালের রাজধানী পাঞ্জাবে পাঠানো হলো এই সংবাদ দিয়ে যে, সুলতানের বাহিনী পাঞ্জাবের মধ্যদিয়ে অতিক্রম করবে। চুক্তি অনুযায়ী রাজা আনন্দ পালের কর্তব্য হলো, সুলতানের বাহিনীর নিরাপদে পথ অতিক্রম করার ব্যবস্থা করা। তাদের গমন পথে যেনো কেউ বাধা বিপত্তি সৃষ্টি না করে। সেই সাথে আনন্দ পাল অন্যান্য হিন্দুরাজ্যের সৈন্য একত্রিত করে যেনো মৈত্রী বাহিনী গঠনের চেষ্টা না করে। আনন্দ পাল এ ধরনের কিছু করলে বোঝা যাবে রাজা চুক্তি ভেঙ্গে দিয়েছেন। তাহলে সুলতানের কর্তব্য হয়ে পড়বে বাটাভা ও পাঞ্জাবে অভিযান চালিয়ে লাহোর ও পাঞ্জাবের দ্বিতীয় রাজধানী বাটান্ডার প্রতিটি ইট খুলে ফেলা।

রাজা আনন্দ পাল তার এক ভাইয়ের নেতৃত্বে দু'হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সজ্জিত একটি বাহিনীকে পাঠায় সুলতান মাহমূদকে অভ্যর্থনার জন্য। সেই সাথে

দলনেতার কাছে এই পয়গাম লিখে পাঠালো যে, এ আমার ভাই এবং দূত। একে আপনার কাছে এই অনুরোধসহ পাঠাচ্ছি যে, "থানেশ্বর আমাদের একটি পবিত্র মন্দির ও বড় পুণ্যস্থান। আপনার ধর্ম যদি আপনাকে অন্যদের ধর্মালয় ধ্বংসের নির্দেশ দিয়ে থাকে, তবে নগরকোট ধ্বংস করে আপনি সেই দায়িত্ব পালন করেছেন। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, থানেশ্বরের ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করুন। এর পরিবর্তে আপনাকে আমি প্রতি বছর খাজনা দেবো। তাছাড়া আপনার বাহিনীর থানেশ্বর আসা-যাওয়ায় যতো খরচ হতো সবই আমি অগ্রিম দিয়ে দেবো। এর বাইরেও আমি আপনাকে পঞ্চাশটি হাতি ও মূল্যবান মণিমুক্তা উপঢৌকন দেবো।"

ঐতিহাসিক ফারিশ্‌তা লিখেন, সুলতান মাহমূদ আনন্দ পালের প্রস্তাবে লিখেন– "আল্লাহ্‌ ও রাসূলের পক্ষ থেকে আমার প্রতি নির্দেশ হলো, যেখানেই মূর্তিপূজা হয় সেখানে যাও এবং মূর্তি ধ্বংস করে দাও। এক্ষেত্রে আমার রাসূলের দৃষ্টিভঙ্গী হলো, মূর্তি ভাঙ্গার প্রতিদান আখেরাতে আল্লাহ্‌ দেবেন। মূর্তি না ভাঙ্গার অঙ্গীকার করে আপনার কাছ থেকে আমার পক্ষে কোন উপঢৌকন নেয়া সম্ভব নয়। থানেশ্বর মন্দিরের মূর্তিগুলো ধ্বংস না করার পক্ষে আমার কাছে কোন যৌক্তিক কারণ নেই।"

রাজা আনন্দ পাল যখন মণি-মুক্তা ও খিরাজের লোভ দেখিয়েও থানেশ্বর আক্রমণ থেকে সুলতান মাহমূদকে নিবৃত করতে পারলো না, তখন দিল্লী, আজমীর, কনৌজেও রাজা-মহারাজাদের কাছে এই বলে দূত পাঠালো যে, গজনীর সুলতান বিনা উস্কানিতে থানেশ্বর মন্দির আক্রমণের জন্য ভারতের সীমানায় প্রবেশ করেছে। থানেশ্বরের বিষ্ণু মন্দির ধ্বংস করাই তার এবারের আক্রমণের উদ্দেশ্য।

* * *

এদিকে থানেশ্বরে সুলতান মাহমূদ গযনবীকে হত্যার সব ব্যবস্থা পাকাপোক্ত হয়ে গেছে। ১০১১ খৃস্টাব্দ মোতাবেক ৮০৬ হিজরী সন। সুলতান নগরকোট থেকে গজনী ফিরে যাওয়ার এখনও বছর পূর্ণ হয়নি। এতো দিনের মধ্যে তার দু'কমান্ডার বুগরা খান ও আলাসতুগীন রাজধানীতে ফিরে না আসায় তাদের পরিবারে সংবাদ দেয়া হলো, তাদের নিহত হওয়ার কোন প্রমাণ সেনাবাহিনীর হাতে নেই। সম্ভবত তারা হিন্দুদের হাতে বন্দী রয়েছে।

ওরা তো আসলে হিন্দুদের বন্দী ছিলো না– ছিলো শাহজাদা হিসেবে। জাদুটোনা ও নেশাগ্রস্ত করে এদেরকে থানেশ্বর মন্দিরে এনে দু'টি রাজকীয়

আসবাবপত্রে সাজানো কক্ষে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের সেবার জন্য দেয়া হয়েছে উদ্ভিন্ন যৌবনা সেবিকা।

বুগরা খানের পায়ের যখম ঠিক হয়ে গিয়েছিলো। সে এখন রীতিমতো হাঁটা-চলা ও সওয়ার হতে পারছে। বুগরা খান স্থানীয় হিন্দুদের ভাষা জানতো। এ জন্য সে-ই তাদের মেজবানের সাথে কথাবার্তা বলতো। দুই বন্ধু মিলে আড্ডা দিয়ে গল্পগুজব করে আর মদ ও নারীর মদির নেশায় সময় কাটিয়ে দিতো।

যে দুই তরুণী ওদের দু'জনকে পথ ভুলিয়ে প্রেমের ছলনা ও নেশাদ্রব্য খাইয়ে থানেশ্বর মন্দিরে নিয়ে আসে, ওদের থানেশ্বর পৌঁছে দিয়ে এই তরুণীদ্বয় ওদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো। কয়েকদিন ওদের জায়গায় নতুন তরুণীদের দেখে অবশেষে বুগরা খানকে তার বন্ধু আলাসতুগীন বললো, ওদের জিজ্ঞেস করো, আগের সেই তরুণীরা কোথায়। ওদের না পেলে আমি এখানে থাকবো না, আমাদের সেনাবাহিনীতে ফিরে যাবো।

যে জাদুকর দরবেশের বেশ ধারণ করে বুগরা খান ও আলাসতুগীনকে বিভ্রান্ত করে থানেশ্বর নিয়ে এসেছিলো, একদিন বুগরা খান তাকে জিজ্ঞেস করলো, আমাদেরকে যে দু'টি মেয়ে আগে সেবাযত্ন করতো তারা কোথায়?

"তোমরা কি দেবীদেরকে তোমাদের মনোরঞ্জনের জন্য পেতে চাও। তারা তো মানুষ ছিলো না। তোমরা যেহেতু নগরকোট মন্দিরের মূর্তি ভাঙ্গায় শরীক ছিলে না, এ জন্য দেবীরা তোমাদের অসহায়ত্বের সময় মানুষের রূপ ধারণ করে তোমাদের সেবা করেছেন।

মানুষের মতোই তোমাদের সাথে ব্যবহার করেছেন।... তোমরা যখন তাদের ভালোবাসা চেয়েছো, তারা তোমাদেরকে প্রেম দিয়েছেন। কিন্তু তোমাদেরকে অসৎ উদ্দেশ্য থেকে বিরত রেখেছেন। তোমরা যখন তাদের কাছে অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার কথা বলেছো, তখন তারা হাসি-তামাশা করে তা এড়িয়ে গেছেন। তারাই আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, তোমাদেরকে যেনো সেনাবাহিনী থেকে বের করে এনে হত্যা, খুনাখুনি ও যুদ্ধবিগ্রহ থেকে আলাদা করে রাজকীয়ভাবে সেবাযত্ন করা হয়।"

"আরে না, তোমার কথা ঠিক নয়। ওরা ঠিকই মানুষ ছিলো" দৃঢ়তার সাথে বললো বুগরা খান।

বুগরা খানের চোখে চোখ রেখে জাদুকর সন্ন্যাসী বললো, "না, তারা মানুষ ছিলেন না। তোমরা তাদের ভক্ত। তোমাদের হৃদয় তাদের প্রেমে পাগল।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তাদের ভক্ত। তাদের পূজারী।... আমার হৃদয় তাদের হৃদয়ের পিঞ্জিরায় আটকানো।" উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলতে লাগলো বুগরা খান।

ততদিনে বুগরা খানের দেমাগ সন্ন্যাসী জাদুকর সম্পূর্ণই বদলে দিয়েছে। বুগরা খানের স্বাভাবিক বিবেকবোধ চাপা পড়ে গিয়েছিলো। এখন জাদুকর যা বলতো এবং যা ভাবতো, বুগরা খান তাই সত্য ভাবতো। শুধু বুগরা খান নয়, আলাসতুগীনও বুগরা খানের মতোই জাদুকরী প্রভাব ও মদের ক্রিয়ায় সম্পূর্ণ অন্য মানুষে রূপান্তরিত হয়েছিলো।

বুগরা খান ও আলাসতুগীনকে মন্দিরে রাজার হালে প্রতিপালন করা হচ্ছিলো। তারা যখন বাইরে বের হতো, তখন সাধারণ হিন্দুরা তাদের দেখে মাথা নীচু করে তাদের কুর্নিশ করতো। এতে এরা নিজেদেরকে রাজা রাজা ভাবতো। টানা দু'তিন মাস এদের উপর চললো জাদুকর ও সন্ন্যাসীদের কারসাজি। এক পর্যায়ে যখন সন্ন্যাসীরা বুঝলো যে, এদের নিজস্ব বিবেক বোধ আর অবশিষ্ট নেই, নিজেদের মতো করে কোনকিছু ভাবার মতো বুদ্ধি এদের লোপ পেয়েছে, তখন তাদেরকে একদিন বলা হলো, দেবীরা তাদেরকে ডেকেছে। দেবীর ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য এদেরকে থানেশ্বর মন্দির সংলগ্ন বাগানে নিয়ে গেলো পুরোহিতরা। রাতের অন্ধকারে বাগানের দৃশ্য ছিলো মনোরম। তাদেরকে একটি রাজকীয় মসনদে বসানো হলো। তাদের আসনের চারপাশে জ্বালানো হলো রঙ-বেরঙের ঝাড় বাতি। তাদের বসার জায়গা থেকে পনের-বিশ হাত দূরে দু'টি কাপড়ের গালিচা বিছিয়ে দেয়া হলো। রঙিন বাতির আলোয় গালিচাগুলো তারার মতো ঝলমল করছিলো।

এদিকে ধীরে ধীরে সেতারের বাজনা শুরু হলো। সেই সাথে ভেসে এলো বাঁশির সুর। বাঁশি ও সেতারের মিলিত আওয়াজে রাতের পরিবেশটা হয়ে উঠলো স্বপ্নিল। স্বপ্নিল সুরের মূর্ছনার মধ্যে হঠাৎ সামনে চলে এলো সেই দুই তরুণী। কেউ বলতেই পারলো না এরা কী ফুলেল কাপড়ের আড়াল থেকে বের হয়েছে, না ফুলের ভেতর থেকেই প্রকাশ পেয়েছে। এদের পরনে এমন পাতলা সূক্ষ্ম কাপড় যে ওদের দেহবল্লরী উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিলো। তাদের মাথায় কোন ধরনের নিকাব ছিলো না। তাদের রেশমী চুলগুলো আলুথালুভাবে ঘাড়ের উপর ও বুকের উপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে ছিলো। রাতের স্নিগ্ধ সমীরণে উড়ন্ত রেমশী চুলগুলো ওদের রূপ-সৌন্দর্যকে আরো শতগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিলো।

এরা দৃষ্টিগোচর হতেই সমবেত সকল হিন্দু দু'হাত জোড় করে প্রণাম করলো। বুগরা খান ও আলাসতুগীন হাত প্রসারিতও করেনি, প্রণামও করেনি। তারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো ওদের দিকে তাকিয়ে আত্মহারা হয়ে গেলো। তরুণীদ্বয় ধীরে ধীরে পায়চারি করতে লাগলো, তাদের পা যেনো মাটি থেকে উপরেই উঠছিলো না। সব মানুষ ওদের প্রণাম শেষে মাথা সোজা করে ওদের দিকে হাত প্রসারিত করে করজোড় নিবেদনের ভঙ্গিতে বসে রইলো। তরুণীরা ধীরে ধীরে রঙিন কাপড়ের আসন দু'টিতে বসতেই তাদের অর্ধেক কাপড়ের আড়ালে চলে গেলো। দেখতে দেখতে তরুণীদ্বয় সেই আসনের মধ্যেই গায়েব হয়ে গেলো।

মন্দিরের প্রধান পুরোহিত তাদের উদ্দেশ্যে বললো, "যাও, কাপড়ের আসনে তাদের দেখো।"

বুগরা খান ও আলাসতুগীন আসনের দিকে অগ্রসর হয়ে চার-পাঁচ কদম থাকতেই দু'টি কবুতর সেখান থেকে উড়ে চলে গেলো। তারা কাছে গিয়ে শূন্য গালিচা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলো না।

"এরা তো দেবী। শুধু তোমাদের জন্যই মানুষের রূপ ধারণ করে এসেছিলো।" বললো এক পুরোহিত। "তারা তোমাদের আশীর্বাদ দিয়েছে। আজ থেকে তোমরা আমাদের রাজা আর আমরা তোমাদের দাস মাত্র। তোমাদের আগের জীবনের কথা স্মরণ করো, কোথায় ছিলে তোমরা, কি ছিলো তোমাদের মর্যাদা ও সম্মান! আর আজ কোথায় এসেছো তোমরা। দেবীরা বলে গেছেন, তোমাদের সেবার জন্য তাদের মতোই দুই রূপসী সুন্দরী মানুষ তোমাদের কাছে পাঠাবেন।"

"এরা কি আমাদের সামনে দেখা দেবে?" জানতে চাইলো বুগরা খান।

"দেব-দেবীরা তো আর আমাদের ইচ্ছাধীন নন।" বললো প্রধান পুরোহিত। "তোমরা নগরকোট মন্দিরের মূর্তি ভাঙ্গনে শরীক ছিলে না বলেই দেবীরা তোমাদের উপর খুশি। মূর্তির অবমাননাকারী সুলতান থেকে তোমরা দূরে ছিলে।... এই দেবীরাও মূর্তির মতোই সুন্দরী। এদেরকেই পাথরের মতো মনে হবে। আমি তোমাদেরকে তাদের আসল রূপও দেখাবো।"

দেবীর প্রদর্শনী দেখে বুগরা খান ও আলাসতুগীন যখন তাদের কক্ষে এলো, তখন আলাসতুগীন বুগরা খানের উদ্দেশ্যে বললো, "আমরা জানতাম হিন্দুরা ভূত পূজা করে, ওদের ধর্ম বাতিল ধর্ম। কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে এরা ইলমে গায়েব জানে।... আচ্ছা আমরা কিসের ইবাদত করি?"

যোগী-সন্ন্যাসী ও জাদুর প্রভাবে ইসলামের তাওহীদ সম্পর্কেই ওদের মনে সংশয় সৃষ্টি হয়। এরা হিন্দুদের দেব-দেবীকেই সত্য বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে। মানুষ তখনই পথভ্রষ্ট হয় যখন মনোদৈহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে শুধুই দৈহিক তৃপ্তির মধ্যে ডুবে যায়। তখন শারীরিক প্রয়োজন পূরণের জিনিসকেই মানুষ মহা সত্য বলে বিশ্বাস করতে থাকে। এমন পর্যায়ে মানুষ জাদুটোনাকেই মুজিযা ভাবতে থাকে এবং ধোঁকা, প্রতারণা ও ফাঁকিবাজিকেই সত্যের মাপকাঠি বলে বিশ্বাস করে। মানুষ যে পরিমাণ প্রবৃত্তিপূজারী হয়, সেই পরিমাণে তার জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেতে থাকে এবং ভ্রান্তির মধ্যেই আত্মতৃপ্তি লাভ করে।

* * *

"অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, ওদের দেশে জাদুটোনা নেই।" সঙ্গীদের বললো থানেশ্বর মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। "নয়তো এরা এই কাজ দেখে এতোটা বিস্মিত হতো না। আমাদের দেশে কাউকে এভাবে গায়েব করে ফেলা খুবই সাধারণ ঘটনা।... এদেরকে আরো কিছু বিস্ময় দেখাও। আমার মনে হচ্ছে, এদেরকে এখন আমরা নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে পারবো। এদের হাতে সুলতান মাহমূদকে খুন করাতে না পারলেও নগরকোটে অবস্থানকারী সেনাপতি ও অন্যান্যদের ঠিকই হত্যা করানো সম্ভব হবে।"

"জাদুর সাথে আমাদের ওষুধপত্রও কার্যকর ভূমিকা রাখবে"– বললো নেশাদ্রব্যের অভিজ্ঞ কবিরাজ। "ওদের এখন মেয়েদেরকে প্রেতাত্মারূপে দেখাবো।"

মন্দিরের বেদীতে দু'টি চৌবাচ্চা ছিলো। এগুলোতে ফুলের নকশা করা কাপড় বিছিয়ে দেয়া হলো। চৌবাচ্চার পাশে লোবানের বাতি জ্বলছে। জ্বলন্ত লোবানের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে একেবেঁকে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে আর মূর্তিগুলোকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। বাতিগুলো রাখা ছিলো মূর্তির নীচে ও পেছনে। তাতে মূর্তিগুলো আরো ঝকমকে মনোহরী দেখাচ্ছিলো।

সেই দুই তরুণী সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় চৌবাচ্চার মধ্যে দাঁড়ানো ছিলো। ওদের চোখ বন্ধ। কোন নড়াচড়া নেই। ঠিক মূর্তির মতোই ঠাঁয় স্থির হয়ে দাঁড়ানো। লোবানের ধোঁয়ার কুণ্ডলী অপসারিত হয়ে ওদের চেহারা পরিষ্কার হয়ে উঠলে পুরোহিত সবাইকে মাথা নিচু করে মূর্তিকে সিজদা করার নির্দেশ দিলো। অন্যদের সাথে বুগরা খান ও আলাসতুগীনও সিজদায় লুটিয়ে পড়লো।

সেই মূর্তি দর্শনের পর বুগরা খান ও আলাসতুগীনের ঈমানের শেষ চিহ্নটিও বিলীন হয়ে গেলো। তাদেরকে মদ-নারী ও নেশায় ডুবিয়ে রাখার সকল ব্যবস্থা

করা হয়েছিলো। জাদুটোনা আর শারীরিক আমোদ-ফূর্তির মধ্যে ওদের মাতিয়ে রাখা হলো। সন্ন্যাসী ও জাদুকররা যখন নিশ্চিত হলো, হিন্দুদের এসব ছলচাতুরীর রহস্য ভেদ করে ওদের পক্ষে তাওহীদের বিশ্বাসে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, তখন মন্দিরের পুরোহিতরা তাদের মনে সুলতান মাহমূদ সম্পর্কে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াতে লাগলো।

"সুলতান মাহমূদ একটা ডাকাত, খুনী, সন্ত্রাসী। সে হিন্দুস্থানে সুন্দরী নারী আর ধন-রত্ন লুট করতে আসে।" বলতে শুরু করলো পুরোহিত। বুগরা খান ও আলাসতুগীনের উদ্দেশ্যে বললো, "তোমরাই বলো, যে দেবীদের তোমরা দেখেছো, তোমরা কি তাদের অসম্মান করতে পারবে? যে দেবীরা তোমাদেরকে খুনাখুনি ও কঠিন জীবন থেকে উদ্ধার করে এমন শাহী জীবন দান করেছে, তাদের মূর্তিকে কি তোমরা নিজ হাতে ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিতে পারবে? এখন তোমাদের জন্য এ আনন্দময় জীবনের সবচেয়ে বড় বাধা হলো সেই পাষণ্ড ডাকাত। সে যদি এখানে এসে মূর্তি ভাংতে শুরু করে, তাহলে তোমাদের শরীরে আগুন ধরে যাবে। যদি দেবদেবীর একটি অঙ্গ ভেঙ্গে যায়, তাহলে তোমাদের শরীরেরও অঙ্গ ভেঙ্গে যাবে। দেবদেবীদের কোন মৃত্যু নেই, তাই তোমাদেরও মরণ হবে না। কিন্তু তোমরা সারা জীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে যাবে। আর সেই দিনের মতো জঙ্গলে পড়ে পড়ে যন্ত্রণায় ধুঁকতে থাকবে, যেখান থেকে এ দেবীরা তোমাদের তুলে এনে সেবা-শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুলেছিলো।"

"এখানেও কি সুলতান মাহমূদ আসবে?" অবাক হয়ে জানতে চাইলো বুগরা খান।

"যদি এসেই পড়ে!" বললো পুরোহিত।

"ওকে আসতে দাও। এখানে এলে সে জীবন নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না।" বললো বুগরা খান।

টানা চার-পাঁচ মাসে ওদের মধ্যে এমন পরিবর্তন ঘটলো যে, এরা নেশার ঘোরে কিংবা জাদুর প্রভাবে অবচেতন মনে হিন্দুদের অনুসারী হয়ে গেছে এমন ছিলো না। ওরা এখন স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের মতোই মন্দিরের বাইরেও ঘুরে বেড়াতো। তাদের মধ্যে কোন নেশাগ্রস্তের বাতিক ছিলো না। স্বাভাবিক সুস্থ মানুষের মতোই ওরা হিন্দুত্ববাদে দীক্ষিত হয়ে গেলো।

একদিন বিকেল বেলায় একটি বাগানে পাঁয়চারি করছিলো দু'জন। এমন সময় দূর থেকে আওয়াজ ভেসে এলো, "আলাসতুগীন...!"

নাম ধরে ডাক শোনার কারণে উভয়েই চারপাশ তাকিয়ে দেখলো। এক সন্ন্যাসীরূপী লোককে তাদের দিকে এগিয়ে আসতে দেখলো। তার কপালে সিঁদুর দিয়ে 'ওঁম' লেখা। সন্ন্যাসীর মাথায় হিন্দু সন্ন্যাসীদের মতোই জটা আর সিঁদুরের আল্পনা আঁকা। সন্ন্যাসী কাছে এসে বললো, "আরে, তোমাদের ব্যাপারে তো আমাদের কিছুই বলা হয়নি। তোমরা এখানে কখন এলে, কোথায় থাকছো?"

"ওহ!" কিছুটা বিস্ময়মাখা কণ্ঠে বললো আলাসতুগীন। "তুমি উবায়দ না?"

এক সময় উবায়দ ও আলাসতুগীন একই সেনা ইউনিটে কর্মরত ছিলো। সেই সুবাদে একজন অপরজনকে চিনতো। উবায়দ ছিলো অভিজ্ঞ গেরিলা যোদ্ধা। সেই সাথে খুবই মেধাবী ও দুঃসাহসী। উবায়দ বুগরা খানকে চিনতো না। আলাসতুগীন বুগরা খানকে উবায়েদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো। কিন্তু একথা বললো না, তারা এখানে কিভাবে এসেছে, কি করছে এবং কোথায় আছে? উবায়দকে পরবর্তীতে গোয়েন্দা বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়। এদের দেখেও উবায়দ মনে করলো এদেরকেও হয়তো গোয়েন্দা কাজে পাঠানো হয়েছে।

"সুলতান কাছেই এসে গেছেন।" বললো উবায়দ। "তোমরা কি তার কাছে কোনো সংবাদ পাঠিয়েছো?"

"তুমি কি খবর পাঠিয়েছো?" জবাব এড়িয়ে গিয়ে পাল্টা উবায়দকে জিজ্ঞেস করলো আলাসতুগীন।

"আমাদের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ হলো, আগের মতো এই মন্দির রক্ষার জন্যও হিন্দুস্তানের অন্যান্য রাজা-মহারাজারা এখানে সৈন্য সমাবেশ ঘটাবে। কিন্তু যতোটুকু দেখতে পাচ্ছি এখনো অন্য জায়গা থেকে এখানে কোনো সৈন্য আসেনি। এখানে আগে থেকে যে সেনাবাহিনী ছিলো তাই রয়েছে।" বললো উবায়দ।

আলাসতুগীন আর উবায়দ গজনীর স্থানীয় ভাষায় কথা বলছিলো। সে উবায়দকে জানালো, বুগরা খানের সাথে সে মন্দিরের ভেতর পর্যন্ত ঢুকে গেছে এবং আপাদত মন্দিরের ভেতরেই অবস্থান করছে। ওরা যে সম্পূর্ণ বদলে গেছে এ ব্যাপারটি উবায়দকে মোটেও টের পেতে দিলো না। উবায়দকে তাদের ব্যাপারে অন্ধকারে রেখেই তারা জায়গা ত্যাগ করে মন্দিরের দিকে রওয়ানা হলো। আলাসতুগীন আরো জানালো, তারা উভয়েই হিন্দু সেজে মন্দিরের পুরোহিতদেরও ভক্ত বানিয়ে ফেলেছে।

উবায়দ যখন বাগান থেকে বেরিয়ে ফিরে যেতে লাগলো, তখন এক লোক তার মুখোমুখি হয়ে জানতে চাইলে, তুমি কে? কোত্থেকে এসেছো? উবায়দ

লোকটিকে একটি হিন্দুয়ানা নাম বলে দিলো এবং জানালো, আমরা কয়েকজন সন্ন্যাসী লাহোর থেকে এসেছি। জঙ্গলের মধ্যে আমরা তাঁবু টেনেছি, ওখানেই থাকি।

কিন্তু লোকটি উবায়দের কথা বিশ্বাস করতে পারলো না। তাকে সন্দেহ করতে লাগলো। সে ছিলো হিন্দুদের গোয়েন্দা বিভাগের লোক। বুগরাখান ও আলাসতুগীনকে দূর থেকে পাহারা দিতো এই গোয়েন্দা। গোয়েন্দা যখন দূর থেকে উবায়দকে আলাসতুগীনের সাথে কথা বলতে দেখলো, তখনই তার সন্দেহ হলো। তাই ওকে জানার জন্য তারা বাগান ছেড়ে যেতেই উবায়দের দিকে এগিয়ে এলো গোয়েন্দা।

উবায়দ যখন বললো, আমরা জঙ্গলে তাঁবু ফেলেছি, তখন লোকটি নিশ্চিত হওয়ার জন্য তাদের তাঁবু দেখার জন্য প্রস্তাব করলো। উবায়দ তাকে সাথে নিয়ে জঙ্গলে প্রবেশ করলো। জঙ্গলের ভেতরে ঠিকই চার-পাঁচজন যোগী-সন্ন্যাসীরূপী লোক একটা তাঁবুতে অবস্থান করছিলো। কিন্তু উবায়দ এই গোয়েন্দাকে দেখাতে নিয়ে গিয়ে আর ফিরে আসতে দিলো না। তাঁবুতে পৌঁছা মাত্রই অন্যান্য সন্ন্যাসীরূপী লোকেরা উবায়দের ইঙ্গিতে লোকটিতে হাত-পা বেঁধে ফেললো। এরপর খঞ্জর বুকে ধরে উবায়দ জিজ্ঞেস করলো, কি কারণে আমার প্রতি তোর সন্দেহ হয়েছিলো, বল?

হিন্দু গোয়েন্দা কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানালো। এরপর ওর পায়ে দড়ি বেঁধে একটি গাছের সাথে ঝুলিয়ে নীচে আগুন ধরিয়ে দিলো। আগুনের তাপ গায়ে লাগতেই চিৎকার শুরু করলো হিন্দু গোয়েন্দা। সবকিছু বলবে বলে স্বীকার করলো। দড়ি খুলে নীচে নামালো ওকে। ধীরে ধীরে ওর সন্দেহ, গোয়েন্দাবৃত্তি এবং বুগরা খান ও আলাসতুগীন সম্পর্কেও সব কাহিনী বলে দিলো। গোয়েন্দা আরো জানালো, যেহেতু ওরা দু'জন গজনী বাহিনীর কমান্ডার এ জন্য তাদের পক্ষে সহজেই সুলতানের ধারে-কাছে যাওয়া সম্ভব। তারা হঠাৎ একদিন সুলতানের কাছে গিয়ে বলবে, তারা হিন্দুদের বন্দিদশা থেকে পালিয়ে এসেছে, তাই সুলতানের সাথে তাদের একান্ত জরুরী কথা আছে। এভাবে সুলতানের একান্ত সান্নিধ্যে গিয়ে তাকে হত্যা করবে।

হিন্দু গোয়েন্দার কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উদ্ধারের পর ওকে বেঁধে রাখলো উবায়দের গোয়েন্দা দল। তারা জঙ্গলের আরো ভেতরের দিকে চলে গেলো।

* * *

এদিকে বাগানে উরায়দের সাথে কথা বলে বুগরা খান ও আলাসতুগীন যখন মন্দিরে ফিরে গেলো, তখন দেখতে গেলো মন্দিরের লোকজন ব্যস্ত ও ভীতিকর পরিস্থিতি। জিজ্ঞেস করলে তাদের জানানো হলো, গজনীর সৈন্যরা থানেশ্বর মন্দির আক্রমণের জন্য আসছে। মন্দিরের পুরোহিত ও অন্যান্য লোকেরা মহারাজা আনন্দ পাল ও অন্যান্য হিন্দু রাজাদের সেনা দলের আগমনের অপেক্ষায় প্রহর গুনছিলো। কিন্তু কোন হিন্দুরাজের সৈন্যদের এদিকে আসতে দেখা যাচ্ছে না।

থানেশ্বর মন্দিরের পুরোহিতদের জানা ছিলো না যে, সব রাজাদের কাছেই খবর পৌঁছে গেছে, সুলতান মাহমূদ থানেশ্বর মন্দির আক্রমণের জন্য আসছে। মুসলিম বাহিনী এ জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু সুলতানের অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে পৌঁছে যাওয়ার কথা তারা ভাবতেই পারেনি।

সুলতান ঝড়ের গতিতে সফর করছিলেন। থানেশ্বর মন্দির সাধারণ কোন পূজাশ্রম ছিলো না। এটি বেষ্টিত ছিলো বিশাল দুর্গ ও সেনা ছাউনী দ্বারা। সেনা শিবিরটিতে পরিপূর্ণ একটি সুসজ্জিত বাহিনী অবস্থান ছিলো। সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ করতো মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। থানেশ্বর মন্দিরের পৃথক গোয়েন্দা বিভাগ ছিলো। গোয়েন্দারা প্রধান পুরোহিতকে খবর দিলো, সুলতান মাহমূদ চলমান গতিতে অগ্রসর হলে আগামী একদিন এক রাতের মধ্যে থানেশ্বর পৌঁছে যাবে।

বুগরা খান ও আলাসতুগীন মন্দিরে গিয়ে জানালো, সুলতান মাহমূদের এক গোয়েন্দার সাথে তাদের সাক্ষাৎ হয়েছে। ওর সাথে আরো কয়েকজন রয়েছে। আগামীকাল আবার এদের একজন তাদের সাথে বাগানে দেখা করতে আসবে।

মন্দিরের সেনাপতি তাদেরকে বললো, তোমরা আগামীকাল সেই গোয়েন্দার সাথে দেখা করবে এবং ওদের সাথে গিয়ে ঠিকানা দেখে আসবে। যাতে ওদের ধরে শেষ করে দেয়া যায়। বুগরা খান ও আলাসতুগীনকে এ কথাও বলা হলো যে, তোমরা গোয়েন্দাদের ঠিকানা জেনে মুসলিম বাহিনীর দিকে চলে যাবে এবং নিজেদেরকে গোয়েন্দা পরিচয় দিয়ে বলবে, আমরা হিন্দুদের কয়েদখানা থেকে পালিয়ে এসেছি, সুলতানের সাথে একান্ত সাক্ষাতে আমাদের কথা আছে।

প্রায় এক বছর সময়কালে বুগরা খান ও আলাসতুগীন মুসলিম সালতানাতের সুরক্ষায় জিহাদী চেতনা লালনকারীর অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুৎ হয়ে গিয়েছিলো। এই বিচ্যুতি ছিলো হিন্দুয়ানী চেতনার উপযোগী। এরা প্রশিক্ষিত জন্তুর মতোই অনুগত হয়ে গিয়েছিলো। হিন্দু পুরোহিতদের পাশবিক ভোগবাদিতা, মদ, নেশা, জাদুর প্রভাবে এরা মানবিকতার মর্যাদা থেকেও বিচ্যুৎ

হয়েছিলো। তাদেরকে সেই দু'সুন্দরী তরুণীর মূর্তি দেখিয়ে ওদেরকে দেবীতে রূপান্তরিত করে মূর্তিপূজারীতে পরিণত করেছিলো। এরা কল্পনাও করতে পারেনি যে, সেই দু'তরুণীকেই চৌবাচ্চার মধ্যে মূর্তিরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। চৌবাচ্চার চারপাশে ধূপ লোবান ও আগরবাতি এমনভাবে জ্বালানো হয়েছিলো যে, এসবের ধোঁয়ার কুণ্ডলীর কারণে তারা বুঝতেই পারেনি যে এরা ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে।

এ পর্যায়ে তাদেরকে যখন বলা হলো, সুলতান মাহমূদ থানেশ্বর মন্দির লুট করতে ও ভাঙ্গতে আসছে। তখন বুগরা খান ও আলাসতুগীন ক্ষোভে অগ্নিরূপ ধারণ করলো।

এদিকে থানেশ্বর মন্দির সংলগ্ন সেনা শিবিরে হৈচৈ পড়ে যায়। তারা বিভিন্ন প্রতিরক্ষা মোর্চা ঠিক করতে শুরু করে। মন্দিরের ভেতরে-বাইরে সেনাদের দৌড়-ঝাঁপ শুরু হয়ে গেছে। শহরের মানুষের মধ্যে ভীতি আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং শহরের সাধারণ লোকজনও তরবারী ও বর্শা নিয়ে মন্দির রক্ষার জন্য মন্দিরের প্রধান ফটকে জমায়েত হতে থাকে। সেনাবাহিনীর লোকেরা তাদের করণীয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দিচ্ছে এবং তাদেরকে বিভিন্ন দলে ভাগ করে দেয়।

এ দুর্যোগ মুহূর্তেও পরদিন বুগরা খান ও আলাসতুগীন উবায়দের সাথে সাক্ষাৎ করতে বাগানে চলে গেলো। তারা উভয়েই উবায়দকে মিথ্যা কাহিনী এবং অসত্য কার্যক্রমের গল্প শোনালো এবং প্রস্তাব করলো, আমাদেরকে তোমাদের আস্তানায় নিয়ে চলো। অবশ্য উবায়দ আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো যে, ওদেরকে ফুসলিয়ে হলেও আস্তানায় নিয়ে আসবে। কিন্তু এখন তারা নিজেরাই উবায়দের ইচ্ছা পূরণে আগ্রহী হয়ে উঠলো। তাতে উবায়দের লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়ে গেলো। সে তাদের নিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেলো।

উবায়দ আগেই সহকর্মীদের দিক-নির্দেশনা দিয়ে রেখেছিলো, বুগরা খান ও আলাসতুগীনকে এখানে নিয়ে এলে তাদের আটকে ফেলতে হবে। পূর্ব সিদ্ধান্ত মতো উবায়দ তাদের নিয়ে আস্তানায় পৌছা মাত্রই কয়েকজন তাদের ঝাঁপটে ধরে রশি দিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেললো।

উবায়দ আশংকা করছিলো, গতকালের মতো আজও হয়তো ওদের অনুসরণকারী থাকতে পারে। তাই দ্রুত তারা সেই আস্তানা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়াটাকেই নিরাপদ মনে করলো। স্থান ছেড়ে আসার জন্য উবায়দের দল কমান্ডার বুগরা খান ও আলাসতুগীনের হাত বেঁধে পা খুলে দিলো এবং উভয়কে

একই রশিতে বেঁধে একজন ধরে রাখলো যাতে পালাতে না পারে। আর হিন্দু গোয়েন্দাকে জঙ্গলের মধ্যে মেরে ফেললো।

খুব বেশি দূরে তাদের যেতে হয়নি। কয়েক মাইল পথ অগ্রসর হলেই গজনী বাহিনীর অগ্রবর্তী দলের দেখা পেলো। উবায়দ অগ্রবর্তী দলের কমান্ডারকে তাদের অপারেশনের কথা এবং সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করলে কমান্ডার উবায়দকে জানালো, তোমাদের আর অগ্রসর হওয়ার দরকার নেই। সুলতান কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানে পৌঁছে যাবেন। উবায়দ আর অগ্রসর না হয়ে সেই স্থানেই অপেক্ষা করলো।

সুলতান মাহমূদ তার একান্ত নিরাপত্তা রক্ষীদের নিয়ে ঝড়ের বেগে থানেশ্বরের দিকে আসছিলেন। সুলতানের নিরাপত্তা রক্ষী দলের কমান্ডার পথিমধ্যে কয়েকজন সন্ন্যাসীরূপী লোককে দাঁড়ানো দেখে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তারা কেন পথিমধ্যে দাঁড়িয়ে আছে? কাছে এসে কমান্ডার দেখতে পেলো, এই সন্ন্যাসীরা আর কেউ নয়, তাদেরই গোয়েন্দা কমান্ডার উবায়দের দল। ইতিমধ্যে সুলতান সেই জায়গায় পৌঁছে গেলেন।

উবায়দ প্রথমেই সুলতানকে জানালো, থানেশ্বরে বাইরে থেকে কোন সেনাবাহিনী আসেনি এবং থানেশ্বর সেনা শিবিরের সৈন্যরা ছাড়াও শহরের বসিন্দারাও তাদের সাথে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। সেই সাথে জানালো, আমাদের সাবেক এই দুই কমান্ডারকে সুলতানকে হত্যার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিলো। সুলতানকে এদের আদিঅন্ত পুরো কাহিনী শোনালো উবায়দ।

"এদেরকে যেভাবে রেখেছো সেভাবেই রাখো। তবে কোন অবস্থাতেই ওদের কোন কিছু পানাহার করতে দিও না।" ক্ষুধায় চেতনা হারালেও খেতে দিও না। তাহলে ওদের নেশা দূর হয়ে যাবে। তারপর ওদেরকে আমি সঠিক বাস্তবতা দেখাবো।" বললেন সুলতান।

সাবেক কমান্ডার দু'জন চোখ বড় বড় করে হতবাক হয়ে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইলো। সুলতান উবায়দের কাছ থেকে সার্বিক পরিস্থিতির রিপোর্ট নিয়ে সৈন্যদের নিয়ে এগিয়ে চললেন।

গতির প্রতিযোগিতায় সুলতান বিজয়ী হলেন। থানেশ্বর মন্দিরের সেনা কমান্ডাররা দেখলো রাজা-মহারাজাদের বাহিনী পৌঁছার আগেই সুলতান তার সৈন্যদের নিয়ে থানেশ্বর পৌঁছে গেছেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সুলতান মাহমূদের ক্ষিপ্র গতিময়তায় থানেশ্বরের সকল হিন্দু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। আসলে গতিময়তা ছিলো সুলতান মাহমূদের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। এ ক্ষেত্রেও

তিনি হিন্দু সৈন্যদের আগে পৌঁছার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সুলতান থানেশ্বর পৌঁছে আগে হিন্দুদের প্রতিরোধ কৌশল পর্যবেক্ষণ করে অবরোধ না করে সরাসরি আঘাত হানার নির্দেশ দিলেন। সুলতানের নির্দেশে গজনী বাহিনীর তীরন্দাজ ইউনিট শহর প্রাচীরের উপর এমন তীব্র তীরবৃষ্টি বর্ষণ করলো যে, প্রতিরোধকারী সৈন্যরা আর মাথা তোলার সুযোগ পেলো না। শহর প্রাচীরের প্রধান ফটক ভেঙ্গে ফেললো গজনী বাহিনীর দুঃসাহসী বীর সৈন্যরা। হিন্দু বাহিনীর মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সুলতান শহরে ত্রাস সৃষ্টির নির্দেশ দিলেন। মুসলিম সৈন্যরা শহরে প্রবেশ করেই ব্যাপক ভাংচুর করে ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করলো। হিন্দু নাগরিক তো দূরের কথা, সৈন্যরা জীবন বাঁচানোর জন্য দিকবিদিক ছুটাছুটি করতে শুরু করলো।

সুলতান মাহমূদ মন্দিরের সকল মূর্তি বাইরে বের করে প্রকাশ্য রাস্তার উপর ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু থানেশ্বর মন্দিরের সবচেয়ে বড় মূর্তি ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বিষ্ণু মূর্তিকে না ভেঙ্গে অক্ষত রাখার নির্দেশ দিলেন সুলতান। এই বিষ্ণু মূর্তির জন্যই সারা হিন্দুস্তানে থানেশ্বর মন্দির বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলো। সুলতান বিষ্ণু মূর্তিকে অক্ষত অবস্থায় গজনী নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। থানেশ্বর বিজয়ের পর গজনী ফেরার সময় বিষ্ণু মূর্তিকে গজনীর সৈন্যরা বহন করে নিয়ে গেলো। সমকালীন একজন ঐতিহাসিকের বর্ণনা থেকে জামা যায়, গজনীর রেসকোর্স ময়দানে থানেশ্বর মন্দিরের অহংকার বিষ্ণু মূর্তিকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়। আর ঘোড়ার পায়ের আঘাতে আঘাতে তা গজনীর ধূলো-বালির সাথে মিশে যায়।

থানেশ্বর মন্দির ও শহরের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নেয়ার পর সুলতান গোয়েন্দা কমান্ডার উবায়দকে নির্দেশ দিলেন ধৃত বুগরা খান ও আলাসতুগীনকে তার কাছে নিয়ে আসতে।

বুগরা খান ও আলাসতুগীনসহ সকল যুদ্ধবন্দীকে সুলতানের সামনে এনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হলো। বন্দীদের প্রথম সারিতে ছিলো ধৃত দুই সাবেক কমান্ডার, মন্দিরের পুরোহিত দল ও সন্ন্যাসী-জাদুকরদের শীর্ষ ব্যক্তিসহ সেই তরুণীদ্বয় এবং মন্দিরের নর্তকী-সেবিকারা।

সুলতান বন্দী বুগরা খান ও আলাসতুগীনকে নির্দেশ দিলেন, তোমাদের পূজনীয় এই দুই তরুণীকে দেখো। আর ওদের থেকে তোমাদের দেবীদের আলাদা করে ফেলো। উভয়েই হতবাক হয়ে দেখলো। তারা যে দুই তরুণীর প্রেমে পড়ে ওদেরকে স্বর্গের অপ্সরা ভেবে পূজা করতে শুরু করছিলো, এরা দিব্যি

সশরীরে তাদের সামনে বন্দী অবস্থায় দণ্ডায়মান। সুলতান জাদুকরকে নির্দেশ দিলেন, এই তরুণীদ্বয়কে তোমার জাদু দিয়ে চৌবাচ্চার মধ্যে গায়েব করে দাও। এরপর গায়েব থেকে এদেরকে আবার বাস্তবে হাজির করো।

দু'টি চৌবাচ্চা নিয়ে আসা হলো। এক জাদুকর এগিয়ে এসে তরুণীদ্বয়কে ধরে এনে চৌবাচ্চার মধ্যে বসিয়ে দিলো এবং একটু পর সবাই দেখলো চৌবাচ্চা সম্পূর্ণ খালি, সেখানে কিছু নেই। একটু পর সেই জাদুকর খালি চৌবাচ্চা থেকেই আবার তরুণীদ্বয়কে বের করে আনলো।

"এটা হিন্দুস্তানের হাজারো জাদুর মধ্যে খুবই সাধারণ একটা জাদু।" বললেন সুলতান। "হিন্দুদের ধর্ম টিকেই আছে জাদু ও রহস্যময়তার অন্ধকারে। আসলে এই পৌত্তলিক ধর্মটার মূল জিনিসই শরীর কেন্দ্রিক। আত্মার সাথে পৌত্তলিকতার কোন সম্পর্ক নেই। ভোগবাদিতা ও রমণলীলা হিন্দু ধর্মের প্রধান উৎস।"

সন্ন্যাসী, জাদুকর ও পুরোহিতদের উদ্দেশ্যে সুলতান বললেন, "আমি তোমাদের দেবদেবীদের মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেছি। ওদেরকে বলো না, আমার উপর তাদের অভিশাপের মুসীবত চাপিয়ে দিতে।"

বিস্ময় ও হতবাক হয়ে বুগরা খান ও আলাসতুগীন সবকিছু দেখছিলো। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় তখন তাদের দেমাগ থেকে নেশার প্রভাব অনেকটাই বিলীন হয়ে গেছে। সুলতান আবেগময় সম্মোহনী ভাষায় বক্তৃতা করছিলেন। ঠিকই সেই সময়ে মন্দির চূড়া থেকে ভেসে এলো আযানের সুমধুর মনোমুগ্ধকর ধ্বনি 'আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার'। সুলতান থেমে গেলেন। বুগরা খান ও আলাসতুগীনের শরীর ততোক্ষণে পাপের অনুভূতিতে নির্ঝরে কাঁপতে শুরু করেছে, আর তাদের দু'চোখে গড়িয়ে পড়ছে অনুশোচনার পাপানল।

আযান শেষ হলে সুলতান সাবেক দুই সেনা কমান্ডারকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "তোমাদের আজ আমি কোন শাস্তি দেবো না। তোমরা জীবন নিয়ে স্বাধীনভাবেই বেঁচে থাকো। সকল মুসলমানকে জানিয়ে দাও যে, আমাদের শত্রুরা তোমাদের মতো তুখোড় যোদ্ধাদেরকে শুধু তলোয়ার দিয়েই আঘাত করে না, ওদের হাতে এমন ধারালো অস্ত্র রয়েছে যা দিয়ে তারা কোন মুসলিম সেনাপতির অন্তর কেটে দিতে পারে, ঈমান নষ্ট করে দিতে পারে, ইসলাম-মুসলিম জাতীয়তা ও ঐতিহ্য ভুলিয়ে দিয়ে বাতিলের সেবাদাসে পরিণত করতে পারে।"

* * *

সাপ স্বর্ণ ও মানুষ

ঐতিহাসিক ফারিশতা লিখেন, ৮০২ হিজরী মোতাবেক ১০১১ খৃষ্টাব্দে সুলতান মাহমূদ থানেশ্বর মন্দির জয় করে যখন গজনী ফিরে এলেন, তখন গজনীকে দেখে হিন্দুস্তানের কোন শহর মনে হতো। কারণ, গজনীর অধিবাসী ও সৈন্য সংখ্যা খুব বেশি ছিলো না। কিন্তু প্রতিবারই অভিযান শেষে হিন্দু যুদ্ধবন্দীদের গজনী নিয়ে আসতেন সুলতান। কিন্তু থানেশ্বর যুদ্ধে হিন্দু যুদ্ধবন্দির সংখ্যা দাঁড়ায় দুই লাখের উপরে। সে সময় যুদ্ধবন্দিদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করা হতো এবং সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের (গনীমতের) মতোই পদ অনুযায়ী তাদের বণ্টন করে দেয়া হতো।

গজনী ফিরে সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধলব্ধ মালে গনীমত বণ্টনসহ যুদ্ধবন্দিদের বণ্টন করে দেয়ার পর সুলতান সকল সেনা সদস্যের উদ্দেশ্যে বললেন, যুদ্ধবন্দি গোলামদের সাথে কেউ এমন ব্যবহার করো না যে, এরা বাকি জীবন নিজেদেরকে জন্তু-জানোয়ারের মতোই কাটাতে বাধ্য হয়। ওদেরকে ইসলামী রীতি-নীতি সম্পর্কে অবহিত করো। ওদের ভাগ্যকে তোমরা সদোত্তর দিয়ে এভাবে বদলে দাও যাতে তারা শুধু আপনজন ও জাতি-ধর্মকেই ভুলে যায় না, সাগ্রহে ইসলামে দীক্ষা নেয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। সব মিলিয়ে তখন যুদ্ধবন্দির সংখ্যা দু'লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। ফলে এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে গোলামে পরিণত করে না রেখে ওদেরকে মুসলিম সমাজের মূল ধারায় লীন করে দেয়ার জন্য কঠোর নির্দেশ জারি করলেন। এর ফলে অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, অল্প দিনের মধ্যেই বিপুলসংখ্যক হিন্দু গোলাম ইসলাম গ্রহণ করে স্বাধীনতা লাভ করলো।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সুলতানের দূরদর্শী এই সিদ্ধান্তের ফলে গোলামী থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দুদেরকে নওমুসলিম হিসেবে সমাজের মূল ধারায় মিশে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হলো। এক পর্যায়ে সুলতান নওমুসলিমদের সমন্বয়ে সেনাবাহিনীর আলাদা একটি রেজিমেন্ট গঠন করেন। তাছাড়া সুলতানের অধীনে একটি হিন্দু রেজিমেন্টও ছিলো। যার কমান্ডারও ছিলো হিন্দু। সুলতান মাহমূদের প্রশাসনিক কাজেও হিন্দুদেরকে অফিসার পদে নিযুক্ত করেছিলেন এবং মুসলমানদের তুলনায় হিন্দু আমলাদের বেশি সুযোগ-সুবিধা দিতেন। হিন্দু সেনাদেরকে তিনি কখনো ভারত অভিযানে ব্যবহার করতেন না। পার্শ্ববর্তী মুসলিম শাসকদের মোকাবেলায় হিন্দু রেজিমেন্টকে ব্যবহার করতেন সুলতান।

থানেশ্বর বিজয়ের পর বিপুল সংখ্যক বন্দী নিয়ে রাজধানীতে ফিরে আসার পর সেই রাতে গজনীতে প্রথম রাতের বেলায় সৈন্য ও সাধারণ নাগরিকরা

আনন্দে মেতে উঠলো। রাতে গজনীর রেসকোর্স ময়দানে সমবেত সৈন্য ও শহরবাসী আতশবাজি পোড়ালো। মানুষ পরম বিজয় উৎসবে মেতে নাচতে লাগলো। শহরের অলিগলি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো আনন্দের বন্যা। অবস্থা এমন হলো যে, গজনীতে যেনো রাত নামেনি। চতুর্দিকে আলোকসজ্জা ও আতশবাজিতে রাতের গজনী কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠলো।

থানেশ্বর মন্দিরের সবচেয়ে বড় বিষ্ণু মূর্তিকে ঘোড়ার টানা গাড়িতে তুলে শহরময় প্রদর্শনী করা হলো। লোকজন মূর্তিতে থু থু ছিটিয়ে দিলো আর খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মূর্তির সুন্দর গায়ে ক্ষত সৃষ্টি করছিলো। এরপর বিশালাকার বিষ্ণু মূর্তিকে রেসকোর্স ময়দানে নিয়ে আসা হলো। সেখানে সমবেত হাজার হাজার সৈনিক-জনতার সামনে সেটিকে ভেঙ্গে ফেলা হলো। সে সময় সকল হিন্দু বন্দিকেও ময়দানে নিয়ে আসা হলো, যাতে দর্শকদের সাথে তারাও তাদের দেবতার করুণ পরিণতি স্বচোখে দেখতে পারে। বন্দিদের উদ্দেশ্যে এক ঘোষক বললো, দেখো, এটা নিছক একটা পাথরের তৈরি বিগ্রহ মাত্র। এটা কোন মতেই দেবতা হতে পারে না। এটা তোমাদের ধর্মের পুরোহিতদের তৈরি প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। এসব মূর্তির মধ্যে যদি কোন দেবতার শক্তি থাকতো তাহলে এতোক্ষণে আমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিতো।

'আল্লাহু আকবার, ইসলাম জিন্দাবাদ, পৌত্তলিকতা মুরদাবাদ' শ্লোগানে শ্লোগানে রাতের আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো আর হিন্দু কয়েদীরা মর্মজ্বালা নিয়ে নীরবে তাদের দেবতার করুণ পরিণতি প্রত্যক্ষ করলো। সেই রাতে গজনী শহরে যে আনন্দ-উল্লাস ও হৈ-হুল্লোড়ে বিজয় উৎসব অনুষ্ঠিত হলো, গজনী শহরে এমনটি আর কখনো ঘটেনি। মুসলমানদের বাড়িঘরও ছিলো উল্লাসমুখর। কিন্তু এতোসব আনন্দ উৎসব সত্ত্বেও একটি মহল ছিলো সম্পূর্ণ নিস্তরঙ্গ। সেই মহলে যিনি অবস্থান করছিলেন, এতো আনন্দ-উৎসবেও তিনি ছিলেন চিন্তান্বিত। আনন্দ-উৎসবে যোগ না দিয়ে তিনি নিজের একান্ত কক্ষে একাকী বসে ছিলেন। দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তায় তার চেহারা ছিলো মলিন। এমন সময় তার কক্ষে উপস্থিত হলো দুই লোক। তারা তাকে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করে পাশে উপবেশন করলো। এরা ছিলো গজনী বাহিনীর দুই গোয়েন্দা প্রধান আর মহলে অবস্থানকারী ব্যক্তিটি ছিলেন বিজয়ের প্রধান নায়ক সুলতান মাহমূদ। তিনি বিজয় উৎসবে যোগ না দিয়ে তার দুই গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে ডেকে গজনীর প্রতিবেশী মুসলিম শাসকদের কর্মতৎপরতার খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

এদারায়ে কুরআন
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা।

VAROT OVIJAN : 2
ISBN 984-70109-0000-3 SET